বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি
কলিকাতা - ১২

॥ প্রথম ওরিয়েণ্ট সংস্করণ : ১লা শ্রাবণ, ১৩৬৫ ॥
॥ দ্বিতীয় ওরিয়েণ্ট সংস্করণ : ১লা আশ্বিন, ১৩৬৫ ॥
॥ দাম : পাঠ্য সংস্করণ : ৩'২৫ : পাঠাগার সংস্করণ : ৪'০০ ॥

প্রকাশক : শ্রীধনঞ্জয় প্রামাণিক, ৪-ই, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২
মুদ্রক : শ্রীকালীচরণ পাল, নবজীবন প্রেস, ৬৬ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

লেখকের কথা

১৯৪০ সালে আমি বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা নামে একখানি বই লিখি। ১৯৫৮ সালের এই বই ঐ একই নামে প্রকাশিত হলেও, একই বই নয়। হয়ত এর নূতন নাম দেওয়া সঙ্গত হত। মোহবশেই তা করিনি।

১৯৩৬-'৩৮ সালে যখন আমি বিশ্বভারতীর অধ্যাপক, কবি সে সময় লোক-শিক্ষা সংসদের পাঠ্যতালিকার উপযোগী করে, প্রাচীন ও আধুনিক বাংলা সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি বোঝানর জন্মে ছোট একখানি বই লিখতে হুকুম করেন আমাকে।

লোক মারফৎ একটি চিরকুটে তিনি লিখে পাঠান, সাহিত্যের ইতিহাস হলো মানুষের মনের ইতিহাস। মাটির ইতিহাসের সঙ্গে তার আগাগোড়া তফাৎ। প্রত্নবিদ্যার চলতি মাপকাঠি এখানে অচল। এজন্মে চাই নতুন দৃষ্টি। * * * সাহিত্যের ইতিহাসকে সাহিত্য হয়ে উঠতে হবে।

তাঁর ইচ্ছাক্রমে প্রাচীন বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে পাঁচ-ছ-টি অধ্যায় এবং আধুনিক বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে আরো পাঁচ-ছ-টি অধ্যায় একত্র হয়ে প্রকাশিত হল 'বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা'।

১৯৩৯-'৪০-এ প্রকাশিত সেই বই-ই প্রাচীন ও আধুনিক বাংলা সাহিত্যের পরিচয়সূচক প্রথম বই। হয়ত সে জন্মেই, অথবা প্রত্নতাত্ত্বিক ইতিহাস না লিখে, সাহিত্যবিচারে আমি সমাজ, সংস্কৃতি ও মানুষের প্রাত্যহিক জীবন-চর্যার ওপর বেশী গুরুত্ব দিয়েছি বলেই, বইটি আশাতীত সমাদর লাভ করে।

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ একটি পত্র-প্রবন্ধে তাকে স্বাগত জানান। প্রমথ চৌধুরী, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, দীনেশচন্দ্র সেন, রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বিনয়কুমার সরকার, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, সুরেন্দ্রনাথ সেন, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ পণ্ডিত জনও হয় চিঠিতে, নয় সাময়িক পত্রে এর সম্বন্ধে সদয় অভিমত ব্যক্ত করেন।

এছাড়া শিক্ষক, সাহিত্যিক, ছাত্র ও সাধারণ পাঠক, বহু জনই নানা ভাবে বইটি সম্বন্ধে তাঁদের প্রীতি ও পক্ষপাত ব্যক্ত করেন। কতকগুলি অধ্যায়

এর হিন্দীতে এবং একটি সংক্ষিপ্ত-সার মারাঠীতে প্রকাশিত হয়েও বইটির জনপ্রিয়তা প্রমাণিত হয়।

ব্যক্তিগত ভাবে আমি কিন্তু অনুরাগ হারিয়ে ফেলি বইটি সম্বন্ধে ঢের আগেই। ত্রিশের পূর্বে লেখা বই চল্লিশের পরেও সহ্য করতে পাবেন, এমন নির্বিচাব লেখক কে বা ক-জন আছেন? মানুষেব চোখ বদলায়, মন এবং মেজাজও বদলায় সেই সঙ্গে। কাজেই বইটিব সংস্কবণ শেষ হয়েছে, বাব বার মুদ্রণেব তাগিদও এসেছে। আমিই সাড়া দিই নি। কেননা আগাগোড়া নূতন কবে লেখাব উৎসাহ বোধ করি নি। আমাব স্বভাবগত নিস্পৃহতা ও আলস্যই এজন্যে দায়ী অবশ্য।

অবশেষে প্রীতিভাজন বন্ধু ও ভ্রাতা প্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক এবং বধূমাতা কল্যাণী দেবী প্রায় ধরে-বেঁধে আমাকে আর একবার বাংলা সাহিত্য-পবিক্রমায় নিয়োজিত করেন। তাব ফলেই পুবানো নামে তৈবি হল নূতন কবে লেখা এই বই। তাঁদেব এই আগ্রহ ও সহযোগিতাব দাম বলে শেষ কবতে পাবি না। এ ভিন্ন আমাব মতো উদাসীন লেখক হযত কবেই কলম গুটিযে সাহিত্যিক বানপ্রস্থ গ্রহণ করত।

প্রথম বই বেবিয়েছিল ১৯৪০-এব ডিসেম্বর মাসে। দ্বিতীয বই প্রকাশিত হচ্ছে ১৯৫৮-ব জুলাই মাসে। মাঝের আঠাবো বছরে অনেক পরিবর্তন হয়েছে দেশের। পরাধীন দেশ স্বাধীন হয়েছে, এক বাংলা দেশ ভেঙে দুই হয়েছে এবং পশ্চিমবঙ্গেব বিশ লক্ষ বেকার ও পূর্ববঙ্গের পঞ্চাশ লক্ষ উদ্বাস্তুর ভারে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি ধ্বসে পড়ার মতো হয়েছে।

এই পরিবর্তিত পটভূমিতে সাহিত্য ও শিল্পের মূল্যায়ন অনিবার্য ভাবেই বদলাবে। সেই বদলেব দিকে চোখ বেখেই বর্তমান বইয়ে পুরানো বিষয়কে নূতন ভাবে বিশ্লেষণ করেছি আমি। যাতে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালযের ছাত্র-ছাত্রী থেকে সাহিত্য-জিজ্ঞাসু সাধাবণ পাঠক পর্যন্ত, সবাই বইটি পড়তে এবং পড়ে উপভোগ করতে পাবেন, সেই জন্যে এতে সাল তারিখ ও তথ্যের কচকচি নিয়ে অত্যধিক মাথা ঘামাই নি। আমি প্রধান বিবেচনা করেছি সাহিত্যবস্তুকেই, যা করেন না বড-একটা সাহিত্যের ইতিহাসকারর।

সাহিত্যের ইতিহাসও সাহিত্য হবে, কবির এই আদেশ শিরোধার্য করে প্রথম বইটি বাজারে আত্মপ্রকাশ করেছিল। সে আদেশ লঙ্ঘন করি নি এই বইয়েও। আগেকার বই যখন বেরয়, তখন বাংলার বরণীয় ব্যক্তিরা তাকে

সাদর সম্ভাষণ জানিয়েছিলেন। আজ তাঁরা অনেকেই লোকান্তরিত। তাঁদের সকলকে সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতায় স্মরণ করছি। আর স্মরণ করছি বন্দনীয় কবিকে, যাঁর অভিমত বইয়ের পরবর্তী মুদ্রণে শিরোভূষণ রূপে ব্যবহারের অনুমতি আমার চাওয়া ছিল দীর্ঘ কাল আগে।

এই সঙ্গে ধন্যবাদ জানাচ্ছি সেই সমস্ত সাহিত্যিক ও সাংবাদিক বন্ধুকে, যাঁরা এই বইয়ের রচনা ও প্রকাশে আমাকে নানা ভাবে সাহায্য করেছেন।

জুলাই ২৩, ১৯৫৮ **নন্দগোপাল সেনগুপ্ত**

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

মাত্র চার মাসের মধ্যে আগের সংস্করণটি নিঃশেষিত হয়েছে। দেশের অধ্যাপক, শিক্ষক ও সাহিত্যানুরাগী পাঠক-পাঠিকার কাছে এই সানুগ্রহ পৃষ্ঠপোষকতার জন্যে আমরা কৃতজ্ঞ।

যতখানি সংশোধন ও সংস্কার করে নূতন সংস্করণটি বের করার ইচ্ছা ছিল, সময়ের স্বল্পতায় তা করা সম্ভব হল না। তবু কিছুটা কাটাকুটি ও ঘষামাজা করে দিলাম। সেই সঙ্গে কিছু নূতন পাঠ্যবস্তু এবং একটি নির্ঘণ্টও সংযোজিত হল। আশা করি এই নূতন সংস্করণও আগেরটির মতো গুণিজনের সমাদর-লাভে ধন্য হবে।

সেপ্টেম্বর ১৮, ১৯৫৮ **নন্দগোপাল সেনগুপ্ত**

ভূমিকা

কল্যাণীয়েষু,

নন্দগোপাল, তোমার বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা বইখানি পড়ে খুশি হলুম। এর মধ্যে তোমার সূক্ষ্মদৃষ্টির এবং ভাষার সুতীক্ষ্ণতাব প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু সূক্ষ্মদৃষ্টি জিনিসটা যে রস আহবণ কবে সেটা সকল সময সার্বজনিক হয় না। সাহিত্যের এটাই হোলো অপরিহার্য দৈন্য। তাকে পুরস্কাবেব জন্য নির্ভব করতে হয় ব্যক্তিগত বিচার-বুদ্ধিব উপবে। তার নিম্ন আদালতেব বিচাব সেও যেমন বৈজ্ঞানিক বিধি-নির্দিষ্ট নয, তার আপিল আদালতের রায়ও তথৈবচ। এস্থলে আমাদেব প্রধান নির্ভবেব বিষয় বহুসংখ্যক শিক্ষিত রুচির অনুমোদনে। কিন্তু কে না জানে যে শিক্ষিত লোকেব রুচিব পবিধি তৎকালীন বেষ্টনীব দ্বারা সীমাবদ্ধ, সময়ান্তবে তার দশান্তব ঘটে। সাহিত্যবিচারেব মাপকাঠি একটা সজীব পদার্থ। কালক্রমে সেটা বাড়ে এবং কমে, কৃশ হয় এবং স্থূল হয়েও থাকে। তার সেই নিত্য পরিবর্তমান পরিমাণবৈচিত্র্য দিয়েই সে সাহিত্যকে বিচার করতে বাধ্য, আব কোনো উপায় নেই। কিন্তু বিচারকেরা সেই হ্রাস-বৃদ্ধিকে অনিত্য বলে স্বীকার করেন না—তাঁবা বৈজ্ঞানিক ভঙ্গী নিয়ে নির্বিকার অবিচলতার ভাণ করে থাকেন। কিন্তু এ বিজ্ঞান মেকি বিজ্ঞান, খাঁটি নয়, ঘরগড়া বিজ্ঞান, শাশ্বত নয়। উপস্থিত মতো যখন একজন বা এক সম্প্রদায়ের লোক সাহিত্যিকের উপরে কোনো মত জাহিব করেন, তখন সেই ক্ষণিক চলমান আদর্শেব অনুসারে সাহিত্যিকের দণ্ড-পুবস্কারের ভাগ-বাঁটোযারা হয়ে থাকে। তার বড় আদালত নেই। তার ফাঁসিব দণ্ড হোলেও সে একান্ত মনে আশা করে যে বেঁচে থাকতে থাকতে হয়ত ফাঁস যাবে ছিঁড়ে, গ্রহের গতিকে কখনো যায়, কখনো যায় না। সমালোচনার এই অধ্রুব অনিশ্চয়তা থেকে স্বয়ং সেক্সপিয়ারও নিষ্কৃতি লাভ করেননি। পণ্যের মূল্য নির্ধারণকালে ঝগড়া ক'রে তর্ক ক'রে কিংবা আর পাঁচজনের নজির তুলে' তার সমর্থন করা জলের উপর ভিত গাড়া। জল তো স্থির নয়, মানুষের রুচি স্থির নয়, কাল স্থির নয়। এস্থলে ধ্রুব আদর্শের ভাণ না ক'রে সাহিত্যের পরিমাপ যদি

সাহিত্য দিয়েই করা যায় তাহলে শান্তি রক্ষা হয়। অর্থাৎ জজের রায় স্বয়ং যদি শিল্প-নিপুণ হয় তাহলে মানদণ্ডই সাহিত্য-ভাণ্ডারে সসম্মানে রক্ষিত হবার যোগ্য হতে পারে।

সাহিত্য-বিচার-মূলক গ্রন্থ পড়বার সময় প্রায়ই কমবেশি পরিমাণে যে জিনিসটি চোখে পড়ে, সে হচ্ছে বিচারকের বিশেষ সংস্কার। এই সংস্কারের প্রবর্তনা ঘটে তাঁর দলের সংস্রবে, তাঁর শ্রেণীর টানে, তাঁর শিক্ষার বিশেষত্ব নিয়ে। কেউ এ প্রভাব সম্পূর্ণ এড়াতে পারেন না। বলা বাহুল্য এ সংস্কার জিনিসটা সর্বকালের আদর্শের নির্বিশেষ অনুবর্তী নয়। জজের মনে ব্যক্তিগত সংস্কার থাকেই, কিন্তু তিনি আইনের দণ্ডের সাহায্যে নিজেকে খাড়া রাখেন। দুর্ভাগ্যক্রমে সাহিত্যে এই আইন তৈরি হোতে থাকে বিশেষ কালের বা বিশেষ দলের, বিশেষ শিক্ষার বা বিশেষ ব্যক্তির তাড়নায়। এ আইন সর্বজনীন এবং সর্বকালের হোতে পারে না। সেই জন্যেই পাঠকসমাজে বিশেষ বিশেষ কালে এক একটা বিশেষ মরসুম দেখা দেয়, যথা টেনিসনের মরসুম, কিপ্‌লিঙের মরসুম। এমন নয় যে ক্ষুদ্র একটা দলের মনেই সেটা ধাক্কা মারে, বৃহৎ জনসঙ্ঘ এই মরসুমের দ্বারা চালিত হোতে থাকে, অবশেষে কখন এক সময় ঋতু পরিবর্তন হয়ে যায়। বৈজ্ঞানিক সত্য-বিচারে এ রকম ব্যক্তিগত পক্ষ-পাতিত্ব কেউ প্রশ্রয় দেয় না। এই বিচারে আপন বিশেষ সংস্কারের দোহাই দেওয়াকে বিজ্ঞানে মূঢ়তা বলে। অথচ সাহিত্যে এই ব্যক্তিগত ছোঁয়াচ লাগাকে কেউ তেমন নিন্দা করে না। সাহিত্যে কোন্‌টা ভালো কোন্‌টা মন্দ সেটা অধিকাংশ স্থলেই যোগ্য বা অযোগ্য বিচারকের বা তার সম্প্রদায়ের আশ্রয় নিয়ে আপনাকে ঘোষণা করে। বর্তমানকালে বিত্তাল্পতার মমত্ব বা অহঙ্কার সর্বজনীন আদর্শের ভাণ ক'রে দণ্ডনীতি প্রবর্তন করতে চেষ্টা করছে। এও যে অনেকটা বিদেশী নকলের ছোঁয়াচ লাগা মরসুম হোতে পাবে, পক্ষপাতী লোকে এটা স্বীকার করতে পারেন না। সাহিত্যে এইরকম বিচারকের অহঙ্কার ছাপার অক্ষরের বত্রিশ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। অবশ্য যারা শ্রেণীগত বা দলগত বা বিশেষকালগত মমত্বের দ্বারা সম্পূর্ণ অভিভূত নয়, তাদের বুদ্ধি অপেক্ষাকৃত নিরাসক্ত। কিন্তু তারা যে কে তা কে স্থির করবে, যে সরষে দিয়ে ভূত ঝাড়ায় সেই সরষেকেই ভূতে পায়। আমরা বিচারকের শ্রেষ্ঠতা নিরূপণ করি নিজের মতের শ্রেষ্ঠতার অভিমানে। মোটের উপর নিরাপদ হচ্ছে ভাণ না করা, সাহিত্যের সমালোচনাকেই সাহিত্য করে তোলা।

সে রকম সাহিত্য মতের একান্ত সত্যতা নিয়ে চরম মূল্য পায় না। তার মূল্য তার সাহিত্যরসেই।

সমালোচকদের লেখায় কটাক্ষে এমন আভাস পেয়ে থাকি যেন আমি অন্তত কোথাও কোথাও আধুনিকের পদক্ষেপের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলবার কাঁচা চেষ্টা করছি এবং সেটা আমার কাব্যের স্বভাবের সঙ্গে মিশ খাচ্ছে না। এই উপলক্ষে এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্যটা বলে নিই।

আমার মনে আছে যখন আমি ক্ষণিকা লিখেছিলেম, তখন একদল পাঠকের ধাঁধা লেগেছিল। তখন যদি আধুনিকের রেওয়াজ থাকত তাহলে কারো বলতে বাধত না যে ঐ সব লেখায় আমি আধুনিকের সাজ পরতে শুরু করেছি। মানুষের বিচারবুদ্ধির ঘাড়ে তার ভূতগত সংস্কার চেপে বসে। মনে আছে কিছুকাল পূর্বে কোনো সমালোচক লিখেছিলেন, হাস্যরস আমার রচনা-মহলের বাইরের জিনিস। তাঁর মতে সেটা হতে বাধ্য কেননা লিরিক কবিদের মধ্যে স্বভাবতই হাস্যরসের অভাব থাকে। তৎসত্ত্বেও আমার চিরকুমারসভা ও অন্যান্য প্রহসনের উল্লেখ তাঁকে করতে হয়েছে, কিন্তু তাঁর মতে তার হাস্যরসটা অগভীর, কারণ—কারণ আর কিছু বলতে হবে না, কারণ তাঁর সংস্কার, যে সংস্কার যুক্তি-তর্কের অতীত।

তুমি মনে কোরো না তোমার লেখায় আমার প্রতি কোনো অবিচার করেছ বলে আমি তোমার উপর কটাক্ষপাত করেছি, ঠিক তার উল্টো। তুমি আমাকে যা নগদ বিদায় দিয়েছ শেষ পর্যন্ত তার বোঝা বইতে পারলে আমি বেঁচে যাব। কিন্তু দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতায় সাহিত্যিক যশ সম্বন্ধে আমার মনের মধ্যে একটা সুগভীর বৈরাগ্য এসেছে। এতদিনে কালের খাজাঞ্চিখানা থেকে আমি যা কিছু লাভ করেছি সেটা খাঁটি কিংবা খাঁটি নয় যখন তার প্রমাণ হবে, তখন আমি উপস্থিত থাকব না।

আমার এই লেখাটা তোমার গ্রন্থের সমালোচনা নয়, তার কারণ সমালোচনায় আমার রুচি বা কৃতিত্ব কোনোকালেই ছিল না এবং এখনো নেই। ইতিপূর্বে আমি কখনো কখনো এমন সব লেখা লিখেছি যা পাঠকেরা সমালোচনা বলে গণ্য করে নিয়েছেন। কিন্তু তা বস্তুত শিল্পকর্ম—বিশ্লেষণের সামগ্রী নয়। সংক্ষেপে আমি বলতে পারি তোমার রচনার বরাবর আমি প্রশংসা করে এসেছি তার ভাষা ও মননশক্তির উজ্জ্বলতা গুণে, এ গ্রন্থেও তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এর তন্ন তন্ন বিচার তাঁরাই করবেন যাঁদের শক্তি আছে

এবং অভ্যাস আছে—আমি অক্ষম। আমার নিজের সম্বন্ধে বিচারকের জরিমানা ও বকশিশ নিঃশব্দে মেনে নিই, অন্যের সম্বন্ধে আমার অভিমত প্রক্ষেপ করতে যথেষ্ট সংকোচ বোধ করি, কারণ এই অভিমত সম্বন্ধে আমার অহঙ্কার কালক্রমে ক্ষীণ হয়ে গেছে।

আমি অনেক সময় খুঁজি সাহিত্যে কার হাতে কর্ণধারের কাজ দেওয়া যেতে পারে, অর্থাৎ কার হাল ডাইনে বাঁয়ের ঢেউয়ে দোলাদুলি করে না। একজনের নাম খুব বড়ো করে আমাব মনে পড়ে তিনি হচ্ছেন প্রমথ চৌধুরী। প্রমথব নাম আমাব বিশেষ করে মনে আসবার কারণ এই যে, আমি তাঁর কাছে ঋণী। সাহিত্যে ঋণ গ্রহণ করবার ক্ষমতাকে গৌরবের সঙ্গে স্বীকার কবা যেতে পাবে। অনেককাল পর্যন্ত যারা গ্রহণ করতে এবং স্বীকার করতে পাবেনি তাদেব আমি অশ্রদ্ধা করে এসেছি। তাঁর যেটা আমার মনকে আকৃষ্ট করেছে, সে হচ্ছে তাঁর চিত্তবৃত্তির বাহুল্যবর্জিত আভিজাত্য, সেটা উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পায তাঁর বুদ্ধিপ্রবণ মননশীলতায়—এই মননধর্ম মনের সে তুঙ্গ শিখরেই অনাবৃত থাকে যেটা ভাবালুতার বাষ্পস্পর্শহীন। তাঁর মনের সচেতনতা আমাব কাছে আশ্চর্যেব বিষয়। তাই অনেকবার ভেবেছি তিনি যদি বঙ্গসাহিত্যের চালকপদ গ্রহণ কবতেন তাহলে এ সাহিত্য অনেক আবর্জনা হ'তে বক্ষা পেত। এত বেশি নির্বিকার তাঁব মন যে বাঙালী পাঠক অনেক দিন পর্যন্ত তাঁকে স্বীকার কবতেই পারেনি, মুশকিল এই যে বাঙালী কাউকে কোনো একটা দলে না টানলে তাকে বুঝতেই পাবে না। আমাব নিজের কথা যদি বল, সত্য আলোচনা সভায় আমাব উক্তি অলঙ্কারের ঝঙ্কারে মুখরিত হয়ে ওঠে। এ কথাটা অত্যন্ত বেশি জানা হয়ে গেছে সেজন্য আমি লজ্জিত এবং নিরুত্তর। অতএব সমালোচনার আসরে আমাব আসন থাকতেই পারে না। কিন্তু রসের অসংযম প্রমথ চৌধুরীর লেখায় একেবারেই নেই। এই সকল গুণেই মনে মনে তাঁকে জজেব পদে বসিয়েছিলুম। কিন্তু বুঝতে পারছি বিলম্ব হয়ে গেছে। তার বিপদ এই যে সাহিত্যে অরক্ষিত আসনে যে খুশি সেই চড়ে বসে। তার ছত্রদণ্ড ধরবার লোক পিছনে পিছনে জুটে যায়।

এখানেই আমার শেষ কথাটা বলে নিই। আমার রচনায় যাঁরা মধ্যবিত্ততার সন্ধান ক'রে পাননি ব'লে নালিশ করেন, তাঁদের কাছে আমার একটা কৈফিয়ৎ দেবার সময় এল। পলিমাটি কোনো স্থায়ী কীর্তির ভিত বহন

করতে পারে না। বাংলার গাঙ্গেয় প্রদেশে এমন কোনো সৌধ পাওয়া যায় না যা প্রাচীনতার স্পর্ধা করতে পারে। এ দেশের আভিজাত্য সেই শ্রেণীর। আমরা যাদের বনেদি বংশীয় বলে আখ্যা দিই তাদের বনেদ বেশি নিচে পর্যন্ত পৌঁছয়নি। এরা অল্পকালের পরিসরের মধ্যে মাথা তুলে ওঠে তারপরে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যেতে বিলম্ব করে না। এই আভিজাত্য সেইজন্য একটা আপেক্ষিক শব্দ মাত্র। তার সেই ক্ষণভঙ্গুর ঐশ্বর্যকে বেশি উচ্চে স্থাপন কবা বিডম্বনা, কেননা সেই কৃত্রিম উচ্চতা কালেব বিদ্রূপের লক্ষ্য হয় মাত্র। এই কারণে আমাদের দেশেব অভিজাত বংশ তার মনোবৃত্তিতে সাধারণের সঙ্গে অত্যন্ত স্বতন্ত্র হতে পারে না। একথা সত্য এই স্বল্পকালীন ধন-সম্পদের আত্ম-সচেতনতা অনেক সময়েই দুঃসহ অহঙ্কারের সঙ্গে আপনাকে জনসম্প্রদায় থেকে পৃথক বাখবার আডম্বব করে। এই হাস্যকর বক্ষস্ফীতি আমাদের বংশে অন্তত আমাদের কালে একেবারেই ছিল না। কাজেই আমরা কোনোদিন বড়লোকের প্রহসন অভিনয় করিনি। অতএব আমাব মনে যদি কোনো স্বভাবগত বিশেষত্বেব ছাপ পডে থাকে তা বিত্তপ্রাচুর্য কেন বিত্ত-সচ্ছলতারও নয়। তাকে বিশেষ পরিবারের পূর্বাপর সংস্কৃতিব মধ্যে ফেলা যেতে পারে এবং এ রকম স্বাতন্ত্র্য হয়তো অন্য পরিবারেও কোনো বংশগত অভ্যাসবশত আত্মপ্রকাশ করে থাকে। বস্তুত এটা আকস্মিক। আশ্চর্য এই যে সাহিত্যে এই মধ্যবিত্ততার অভিমান সহসা অত্যন্ত মেতে উঠেছে। কিছুকাল পূর্বে "তরুণ" শব্দটা এই রকম ফণা তুলে ধবেছিল। আমাদের দেশে সাহিত্যে এই রকম জাতে ঠেলাঠেলি আরম্ভ হযেছে হালে। আমি যখন মস্কো গিয়েছিলুম, চেকভের রচনা সম্বন্ধে আমাব অনুকূল অভিরুচি ব্যক্ত করতে গিয়ে হঠাৎ ঠোক্কর খেয়ে দেখলুম, চেকভের লেখায় সাহিত্যের মেল বন্ধনে জাতিচ্যুতি দোষ ঘটেছে, সুতরাং তাঁর নাটক স্টেজের মঞ্চে পংক্তি পেল না। সাহিত্যে এই মনোভাব এত বেশি কৃত্রিম যে শুনতে পাই এখন আবার হাওয়া বদল হয়েছে। এক সময়ে মাসের পর মাস আমি পল্লীজীবনের গল্প রচনা করে এসেছি। আমার বিশ্বাস এর পূর্বে বাংলা সাহিত্যে পল্লীজীবনের চিত্র এমন ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ হয়নি। তখন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লেখকের অভাব ছিল না, তাঁরা প্রায় সকলেই প্রতাপ সিংহ বা প্রতাপাদিত্যের ধ্যানে নিবিষ্ট ছিলেন। আমার আশঙ্কা হয় এক সময়ে গল্পগুচ্ছ বুর্জোয়া লেখকের সংসর্গদোষে অসাহিত্য ব'লে অস্পৃশ্য হবে। এখনি যখন আমার লেখার শ্রেণী নির্ণয় করা হয়

তখন এই লেখাগুলির উল্লেখমাত্র হয় না, যেন ওগুলির অস্তিত্বই নেই। জাতে ঠেলাঠেলি আমাদের রক্তের মধ্যে আছে তাই ভয় হয় এই আগাছাটাকে উপড়ে ফেলা শক্ত হবে।

কিছুকাল থেকে আমি দুঃসহ রোগ-দুঃখ ভোগ করে আসছি সেইজন্য যদি ব'লে বসি যাঁরা আমার শুশ্রূষায় নিযুক্ত তাঁরাও মুখে কালো রঙ মেখে অস্বাস্থ্যের বিকৃত চেহারা ধারণ করে এলে তবেই সেটা আমার পক্ষে আরামের হোতে পারে তাহলে মনোবিকারের আশঙ্কা কল্পনা করতে হবে। প্রকৃতির মধ্যে একটা নির্মল প্রসন্নতা আছে। ব্যক্তিগত জীবনে অবস্থাব বিপ্লব ঘটে কিন্তু তাতে এই বিশ্বজনীন দানের মধ্যে বিকৃতি ঘটে না; সেই আমাদেব সৌভাগ্য। তাতে যদি আপত্তি করাব একটা দল পাকাই তাহলে বলতে হয় যাঁরা নিঃস্ব তাঁদের জন্যে মরুভূমিতে উপনিবেশ স্থাপন করা উচিত নইলে তাঁদের মনেব তুষ্টি অসম্ভব। নিঃস্ব শ্রেণীর পাঠকদের জন্য সাহিত্যেও কি মরু-উপনিবেশ স্থাপন করতে হবে?

তোমাব লেখা উপলক্ষ্য মাত্র করে আমি সাহিত্যবিচার সম্বন্ধে আমাব মত ব্যক্ত করেছি, বোগজীর্ণ ক্লান্ত মনের অসংলগ্ন উক্তি। একথাও বলে রাখা দবকাব এর অধিকাংশই আমি শ্রীমান সুধাকান্তকে মুখে মুখে বলে গিয়েছি। সুতবাং এ বকম ভাষণেব দুর্বলতা ক্ষমাব যোগ্য। ১০ আষাঢ়, ১৩৪৮।

রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ লোকান্তরিত হন এই বছরেরই ২২শে শ্রাবণ। অর্থাৎ এই চিঠি লেখার এক মাস তেরো দিন পরে।

আলেখ্য, স্বাক্ষর ও হস্তলিপি

আলেখ্য

স্বাক্ষরের প্রতিলিপি

হস্তলিপির প্রতিলিপি

বিষয়-সূচী

প্রথম ভাগ ঃ প্রাচীন কাল

দ্বিতীয় ভাগ : আধুনিক কাল



পশুপতি শিব : বীরভূম (১০ম শতাব্দী)

[আশুতোষ মিউজিয়াম]



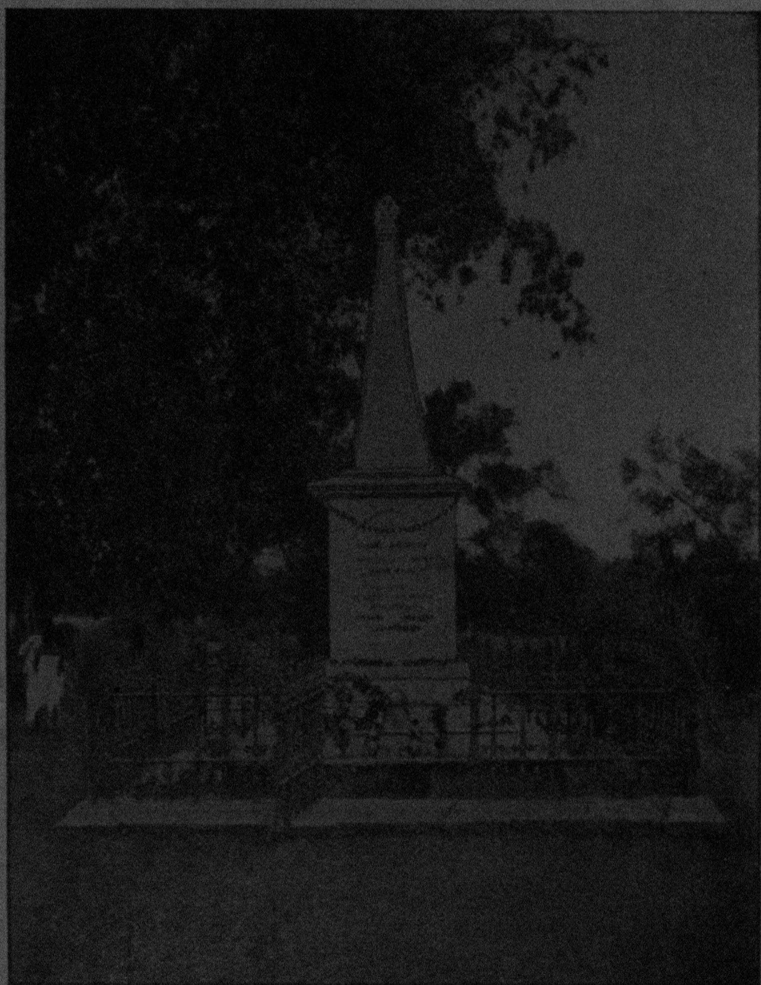
মনসামূর্তি : কোটালীপাড়া (১২শ শতাব্দী)

[আশুতোষ মিউজিয়াম]

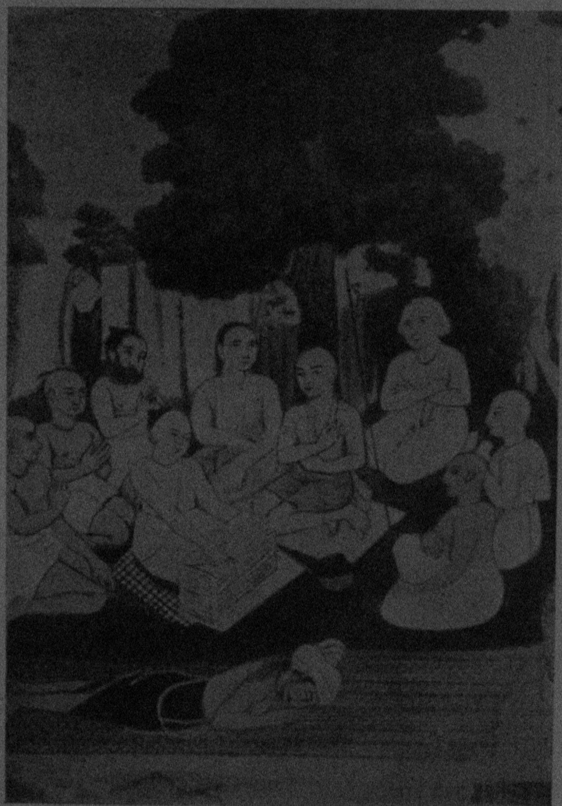


রাধাকৃষ্ণ মূর্তি : পাহাড়পুর (১৩শ শতাব্দী)

[আশুতোষ মিউজিয়াম]



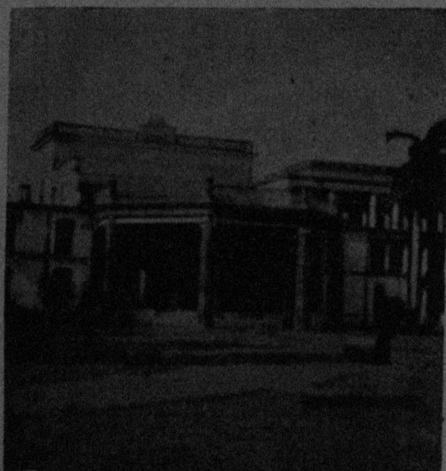
কৃত্তিবাস স্মৃতিস্তম্ভ : ফুলিয়া



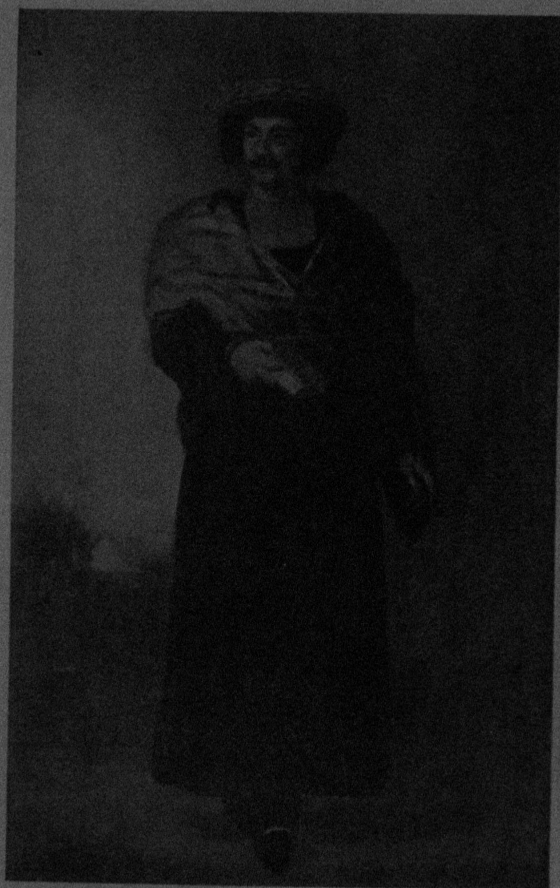
সপারিষদ শ্রীচৈতন্য

[কুঞ্জঘাটা রাজবাড়ীর তৈলচিত্র]

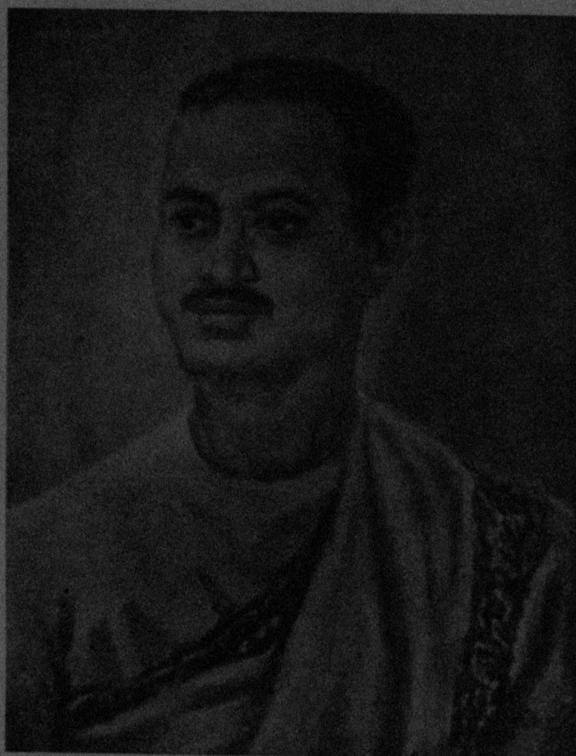
রামপ্রসাদের পঞ্চবটী : হালিসহর



কৃষ্ণচন্দ্রের সভাগৃহ
[কৃষ্ণনগর রাজবাড়ী : বিষ্ণুমহল]

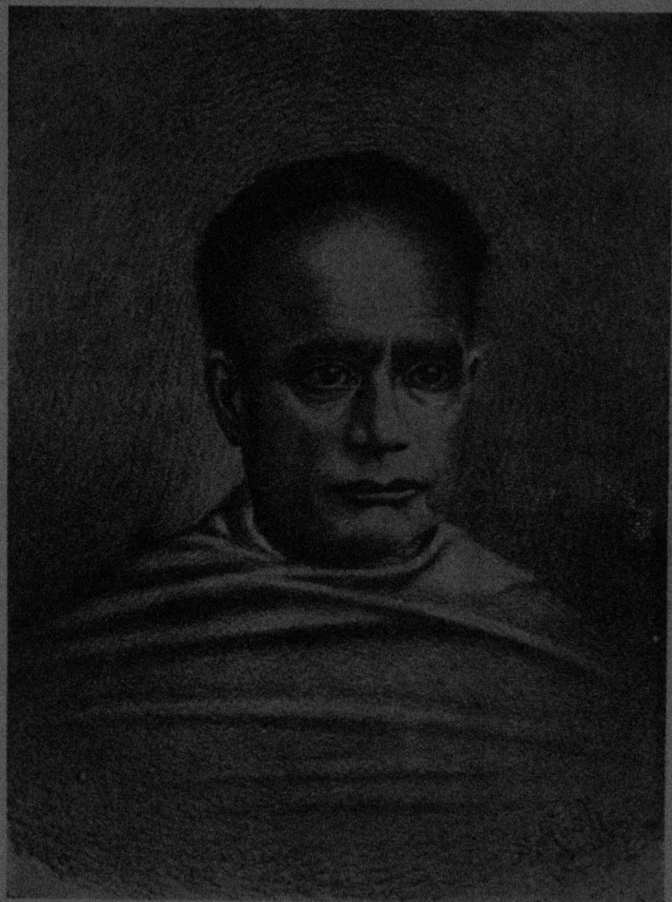


রামমোহন রায়

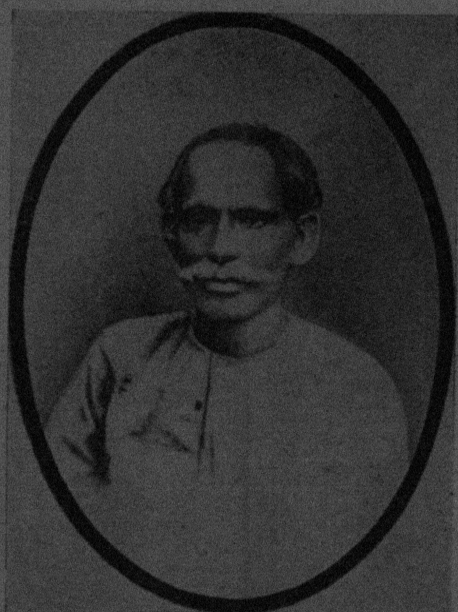


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

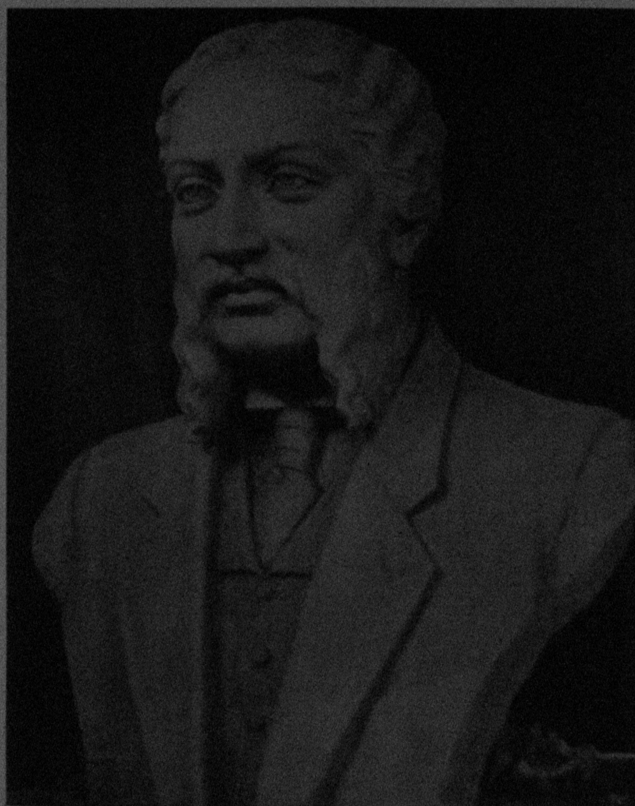
[ঈশ্বর গুপ্ত স্মৃতিরক্ষা সমিতির সৌজন্যে]



ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

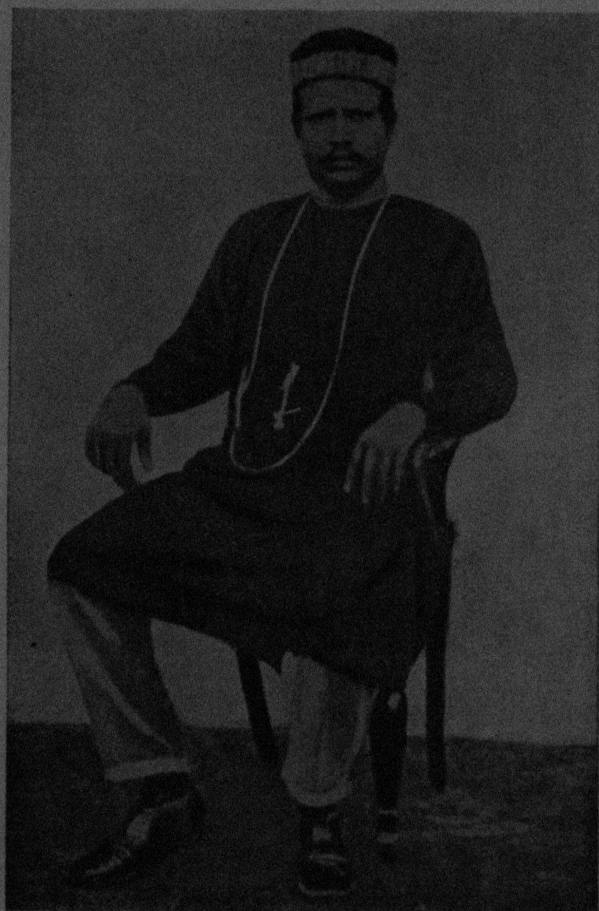


অক্ষয়কুমার দত্ত

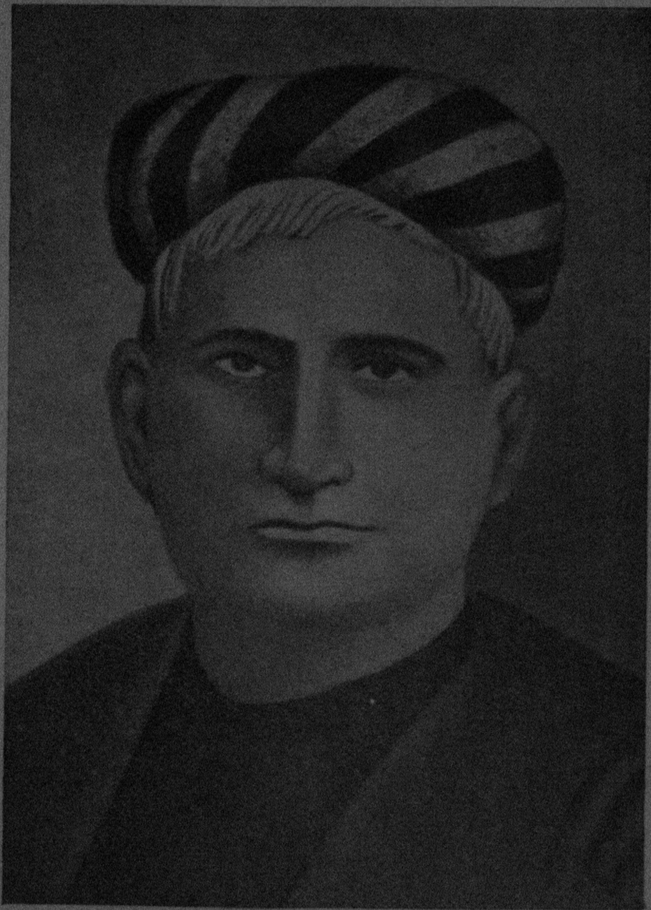


মাইকেল মধুসূদন দত্ত

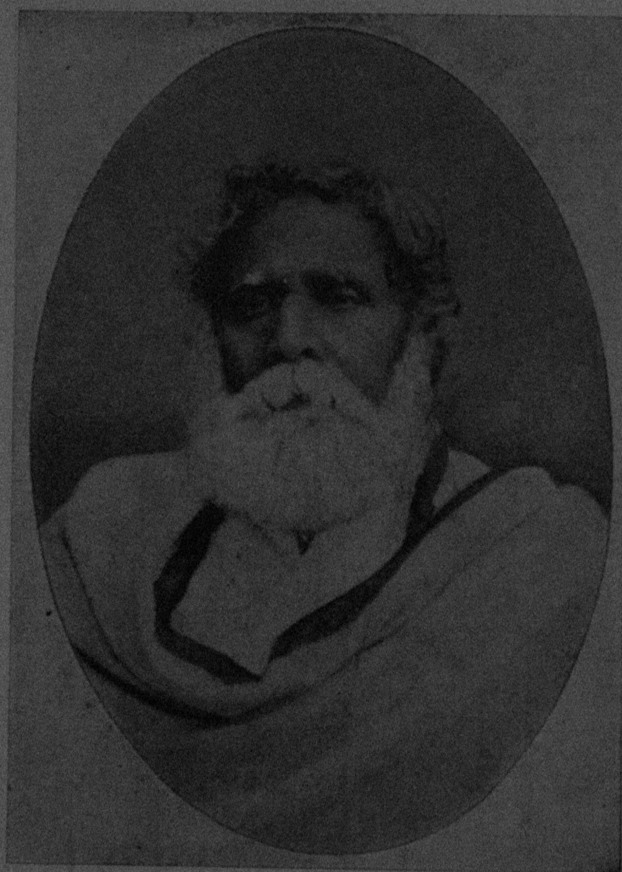
[রমেশচন্দ্র পাল নির্মিত প্রতিমূর্তি]



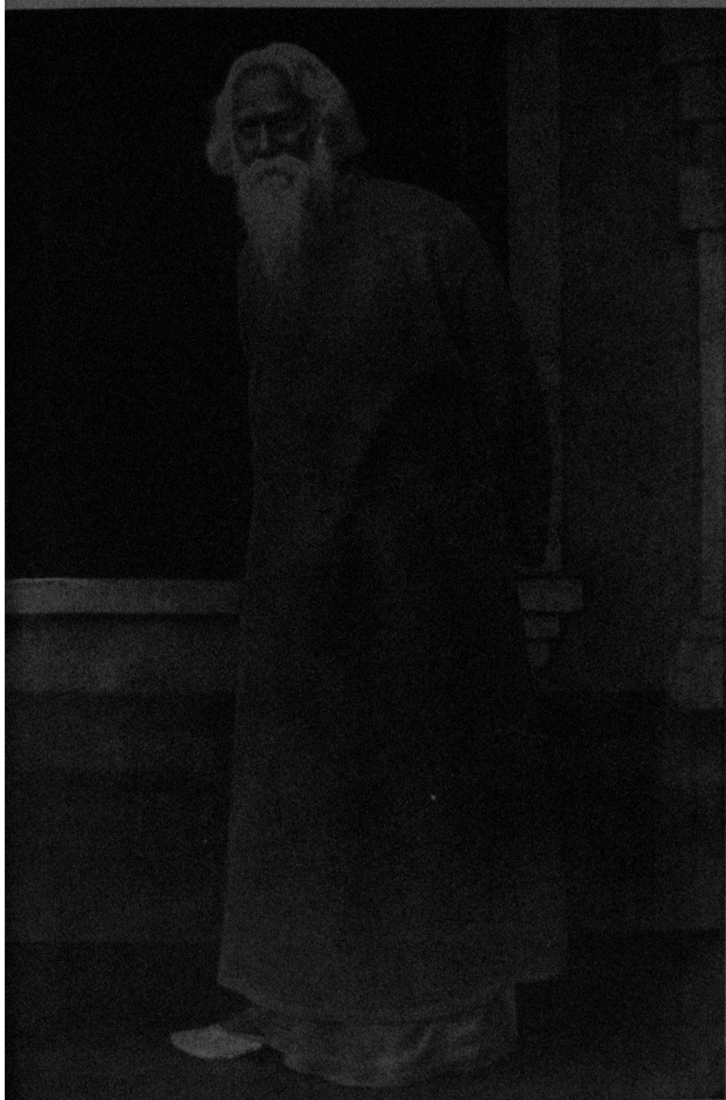
দীনবন্ধু মিত্র



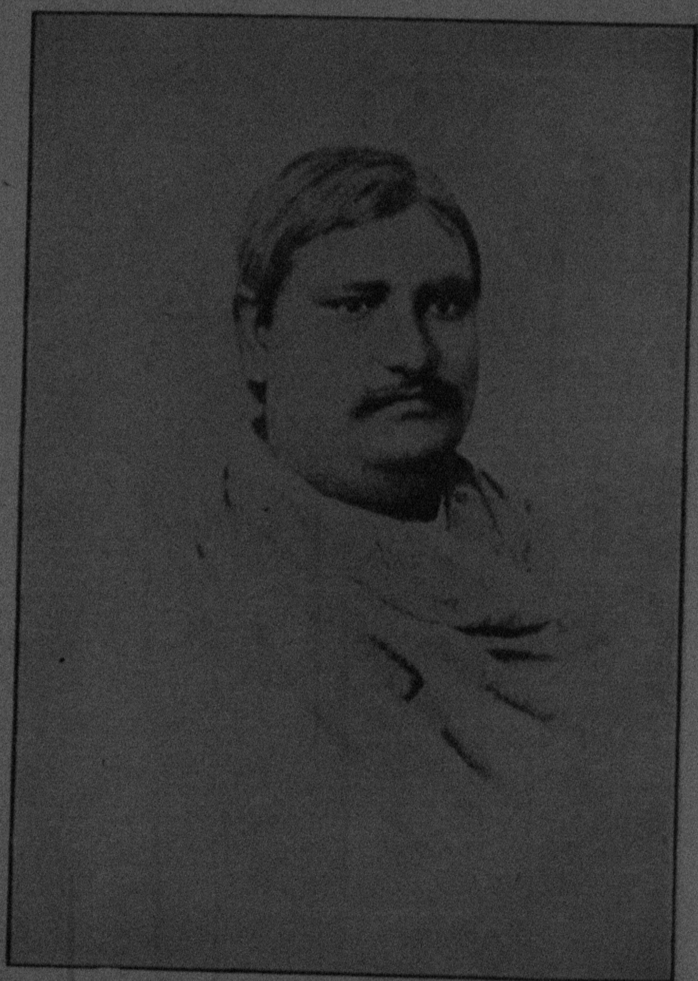
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়



রাজনারায়ণ বসু



রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা

প্রস্তাবনা

বঙ্গদেশ

বাংলা দেশ কত দিনের পুরানো এবং এই দেশের আদি অধিবাসী কারা, তা নিয়ে কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করা যায় না। মোটামুটি এইটুকু বলা যায় যে খৃঃ পূঃ ২০০০ অব্দে যখন বৈদিক আর্যেরা উত্তর ভারতে বসতি করছেন, তখনো পূর্বাঞ্চলীয় এই ভূমিভাগে মানুষ ছিলেন।

অবশ্য তখন বাংলা বলে একটা দেশ ছিল না। নদী পাহাড় জঙ্গল ও জলাভূমি সমাকীর্ণ ভারতের পূর্ব সীমানা জুড়ে রাঢ়, পৌণ্ড্র ও বঙ্গ, এই তিনটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ভৌগোলিক আয়তন ছিল। রাঢ় হল পশ্চিম বঙ্গ, পৌণ্ড্র উত্তর বঙ্গ এবং বঙ্গ পূর্ববঙ্গ। রাঢ়ের আর এক নাম ছিল সুহ্ম, পৌণ্ড্রের মালদহ অঞ্চলও কোন এক সময় থেকে গৌড় নামে পরিচিত হয়। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় যে বঙ্গ নামটাই কালে গোটা দেশের নাম হয়েছে এবং জাতিও বাঙালী হয়েছে তাই থেকে।

প্রাচীন বাংলার এই তিন প্রধান ভূমিভাগের সঙ্গেই ছিল তাম্রলিপ্ত, সমতট, হরিকেল এবং আরো দু-একটি অঞ্চল। তাম্রলিপ্ত হল তমলুক, কাঁথি ও মেদিনীপুর। সমতট যশোহর, খুলনা ও সুন্দরবন এবং হরিকেল ময়মনসিংহ ও শ্রীহট্ট। এই সব রাজ্য ও তার অধিবাসীদের নাম অতি প্রাচীন কাল থেকেই পুঁথিপত্রে চলে আসছে। ভাগবতে দেখা যায়, পৌণ্ড্রের রাজা বাসুদেব কৃষ্ণের দ্বারকা আক্রমণ করেছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কুরুপক্ষে বঙ্গরাজ যোগ দিয়েছিলেন, একথা বলা হয়েছে মহাভারতে। গ্রীকরা গঙ্গারীঢ় নামে এক জাতির বীরত্বের উল্লেখ করেছেন, যাঁদের ভয়ে আলেকজাণ্ডার-বাহিনী পূর্ব

ভারতে অভিযান চালাতে সাহস পায় নি! রাঢ়ের রাজপুত্র বিজয়সিংহ সিংহল জয় করেছিলেন।

প্রাগৈতিহাসিক কালের এইসব বৃত্তান্ত অনেকটা কিংবদন্তীর মতো হলেও, ঐতিহাসিক কালের প্রামাণ্য বৃত্তান্তও পাওয়া যায় কম নয়। খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে মৌর্যেরা যখন মগধ অধিকার করেন, তখন বাংলার কতকটা মগধের অন্তর্ভুক্ত হয়। খৃষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীতে গুপ্ত সম্রাটরা ত সমগ্র বাংলাই মগধের সঙ্গে যুক্ত করেন। এই আটশত বছরেই বাংলাব সমাজ ও সংস্কৃতিতে আর্যাবর্তের প্রভাব বিস্তার লাভ করে। তারপরে সপ্তম শতাব্দী থেকে বাংলার আসল ইতিহাস সুরু হয়, যখন গৌড়রাজ শশাঙ্ক বাংলা দেশকে উত্তর ভারতের কবলমুক্ত করেন। শুধু তাই না, উত্তর ভারতের বৃহৎ একাংশে তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তৃত করেন। শশাঙ্ককে বৌদ্ধ গ্রন্থকার বাণভট্ট 'গৌড়ভুজঙ্গ' বলেছেন, কেন না তিনি শৈব ছিলেন এবং বৌদ্ধ সম্রাট হর্ষবর্ধনের সঙ্গে তাঁর প্রবল যুদ্ধ হয়েছিল।

শশাঙ্কের মৃত্যুর পর সুরু হয় বাংলার পাল রাজবংশ। পালেরা বৌদ্ধ ছিলেন এবং একাদিক্রমে অষ্টম শতাব্দী থেকে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত, চার শতাব্দী কাল তাঁরা গৌড় শাসন করেছিলেন। এই বংশের বিখ্যাত রাজা ধর্মপালের সময় বাংলার সীমানা কাশী, কলিঙ্গ, কামরূপ ও মিথিলা পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল। পালযুগেই বাংলায় বৌদ্ধ সহজিয়াদেব অর্থাৎ যোগী ও সিদ্ধাইদের আবির্ভাব হয়। একাদশ শতাব্দী থেকে সেন রাজারা বাংলার শাসনকর্তৃত্ব দখল করেন। সমাজে কৌলীন্যপ্রথা প্রবর্তিত হয় বল্লালের সময়। সেনেরা বৈষ্ণব ছিলেন, শৈব-শাক্ত সহজিয়ারা তাঁদের প্রভাবে বৈষ্ণব হন। দ্বাদশ শতাব্দীতে লক্ষ্মণ সেনের আমলে তুর্কী অভিযান হয় এবং সেখান থেকেই হিন্দু যুগ শেষ হয়ে সুরু হয় মুসলীম যুগ।

মুসলীম যুগ ত্রয়োদশ শতাব্দীর সুরু থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত, এই প্রায় সাড়ে পাঁচশো বছর স্থায়ী হয়। এই সময় বাংলা নামে দিল্লীশ্বরের সাম্রাজ্যভুক্ত হলেও, কাজে প্রায় স্বাধীন দেশই ছিল। গৌড়ের মুসলীম সুলতানেরা বার বার দিল্লীর প্রভুত্ব অস্বীকার করে নিজেদের স্বাধীন সার্বভৌম নরপতি বলে ঘোষণা করেছেন। তাছাড়া দূরবর্তী বাংলার সঙ্গে দিল্লীর যোগ রাখা সেদিন খুব বেশী সম্ভবও ছিল না।

এক হিসাবে এ যুগ বিশেষ সমৃদ্ধির যুগ। মুসলীম যুগের বাংলায় গৌড়ীয়

বৈষ্ণবধর্ম প্রচারিত হয়েছে। কৃত্তিবাস, চণ্ডীদাস, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র প্রমুখ শ্রেষ্ঠ কবির গ্রন্থগুলি রচিত হয়েছে। ভাস্কর্য ও কারুশিল্পেও দেশের প্রভূত উৎকর্ষ হয়েছে। কিন্তু সমাজজীবনে শান্তি, শৃঙ্খলা বা ঐক্য বিশেষ ছিল না এযুগে। প্রথমত বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সময় উঠেছেন ভূঁইঞা রাজারা এবং তাঁরা কখনো গৌড়েশ্বরের, কখনো দিল্লীশ্বরের প্রভুত্ব অস্বীকার করেছেন। দীর্ঘদিন তাই নিয়ে চলেছে যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং সমাজের শান্তি নষ্ট হয়েছে। দ্বিতীয়ত বর্ণহিন্দুদের দ্বারা নিগৃহীত অনুন্নতেরা দলে দলে মুসলীম রাজশক্তির পীড়নে ও প্রলোভনে ধর্মান্তরিত হয়েছেন। তার ফলে সমাজজীবন হয়েছে দ্বিধাবিভক্ত এবং অশান্তিপূর্ণ।

রাজশক্তি বিচক্ষণ হলে নিরপেক্ষ শাসন ও সমদর্শিতার দ্বারা এর মধ্যেও হয়ত শান্তি স্থাপন করতে পারতেন। কিন্তু হুসেন শা, গিয়াসুদ্দীন ইলিয়াস প্রভৃতি দু-চারজন উদারবুদ্ধি শাসক সময় সময় দেখা দিলেও, সরকারী নীতিই তাঁদের ধর্ম-নিরপেক্ষ ও সমদর্শিতাপূর্ণ ছিল না।

প্রধানত এই অবিচারের বিরুদ্ধেই ভূঁইঞা রাজারা বিদ্রোহ করেছেন, চতুর্দশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের সাম্য ও সমন্বয়ের আন্দোলনও এর বিরুদ্ধেই চালিত হয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিদেশী বণিকদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে হিন্দু ভূম্যধিকারীরা যে মুসলীম শাসনের অবসান ঘটালেন, সে-ও এই অনৈক্য ও অশান্তিরই রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া।

বাঙালী সংস্কৃতি

রাঢ, পৌণ্ড্র ও বঙ্গের অধিবাসীরা কবে থেকে এক জাতিভুক্ত ও বাঙালী নামে অভিহিত হতে সুরু করেন, তা বলা কঠিন। তবে পালযুগে রচিত চর্যাপদে বাঙালী কথাটা পাওয়া যাচ্ছে। যেমন,

ভুসুক আজ তু বাঙালী ভৈলী।
নিঅ ঘরণী চণ্ডালী লেলী ॥

বোঝা যাচ্ছে খৃষ্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীর মধ্যেই এক-জাতি হিসাবে বাঙালীর গঠন সম্পূর্ণ হয়েছিল। মুসলমান ঐতিহাসিকরা দেশ অর্থে বঙাল ও জাতি অর্থে বঙালী শব্দ বার বার ব্যবহার করেছেন। তাঁদের আমলে নিশ্চয় সংজ্ঞা দুটির বহুল প্রচার ছিল দেশে।

বাঙালী জাতির উৎপত্তির ইতিহাস নিয়ে তর্ক আছে। মোটের ওপর এইটুকু প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে বাঙালীরা বৈদিক আর্য জাতিগোষ্ঠীর সন্তান নন। তাঁরা অস্ট্রিক বা অস্ট্রেলেশিয়াটিক গোষ্ঠীসম্ভূত এবং সম্ভবত ভূমধ্যসাগরীয় কোন অঞ্চল থেকে তাঁরা গোড়ায় ভারতে এসেছিলেন। তারপর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মুঙ্গল গোষ্ঠীয় মানুষদেরও কিছুটা মিশ্রণ হয়ত হয়েছিল তাঁদের সঙ্গে। তাঁরা নদী, বসুমতী, অন্ন, বিদ্যা ও বিত্তের অধিষ্ঠাত্রী এক-একটি মাতৃ-দেবতার পূজা করতেন। এর প্রত্যেকটিই ছিল তাঁদের মতে এক-একটি শক্তি এবং এই সব খণ্ড-শক্তি নিয়ে গঠিত যে মহাশক্তি, তিনিই ছিলেন তাঁদের প্রধান উপাস্য। এছাড়া পিতৃ-দেবতা শিবেরও উপাসনা করতেন তাঁরা। মৃত পূর্ব-পুরুষদের পূজা, প্রেতপূজা, বৃক্ষ ও পাথরপূজা, এমন কি নাগ, বাঘ ও কুমীরের পূজাও সমাজের কোন কোন স্তরে চলিত ছিল।

অনেকে বলেন, যে-শাস্ত্র অনুসারে তাঁরা এই সব পিতৃপূজা ও মাতৃপূজা করতেন, তা হল আগম ও নিগম, একযোগে যার নাম তন্ত্র। পরে আর্য ও আর্যেতর জাতিগুলির মধ্যে মিশ্রণ হলে, তন্ত্র সমগ্র হিন্দু জাতির শাস্ত্র হয়। কিন্তু গোড়ায় তা ছিল শুধু পূর্বাঞ্চলীয়দের শাস্ত্র। হয়ত তা লিখিত হয়েছিল আজকের কোন অজ্ঞাত ভাষায়। অনেকে সাংখ্য দর্শনকেও এই আদিবাঙালীর রচিত বলে মনে করেন। সাংখ্য দর্শন মতে প্রকৃতি ও পুরুষ অর্থাৎ জড় ও চেতনা, এ দুইয়ের সম্মেলনে জগৎ ও জীবনের উৎপত্তি হয়েছে। বাংলার প্রধান ধর্মগুলিতেও জীবাত্মাকে প্রকৃতি এবং পরমাত্মা বা ঈশ্বরকে পুরুষ বলা হয়েছে এবং এ দুইয়ের মিলনকে আরাধনা বলা হয়েছে। এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে, তন্ত্র ও সাংখ্য দর্শনের সঙ্গে বাঙালীর যুগল-আরাধনার আদিতে কোন যোগ ছিল।

এই আদিবাঙালীরা ধান ও তুলোর চাষ করতেন। বোধহয় সুতোর কাপড় বোনাও আয়ত্ত করেছিলেন তাঁরা। তাঁরা মাছ ভাত খেতেন। তেল, হলুদ, পান, সুপুরি ও সিঁদুরের ব্যবহার ছিল তাঁদের মধ্যে। তাঁদের সামাজিক সংগঠন সাম্যাশ্রিত ছিল। জাতকর্ম, বিবাহ ও শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠানে তাঁদের সম্পূর্ণ নিজস্ব ধরন ছিল। আর্য জাতিরা এই সব বৈশিষ্ট্যের জন্যই বোধহয় তাঁদের বিদ্বেষের চোখে দেখতেন। বৌধায়ন সূত্রে বাঙালীর উদ্দেশে প্রচুর কটূক্তি আছে, এ লক্ষ্য করার মতো।

আদিকাল থেকে ঐতিহাসিক কালে এসে অবশ্য উত্তর ভারতের সঙ্গে

বাংলার সংযোগ হয়েছে এবং মৌর্য (খৃঃ পূঃ ৩০০) থেকে গুপ্ত (খৃঃ ৫০০) যুগ পর্যন্ত আট শত বৎসরের মধ্যে উত্তর ভারত থেকে বৈদিক ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি ব্যাপক ভাবে বাংলায় সঞ্চারিত হয়েছে। তার মানে আর্যাবর্ত থেকে বৈদিক (ব্রাহ্মণ্য) ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা বাংলায় এসে বসতি স্থাপন করেছেন। সমাজে বর্ণাশ্রম ও বৈদিক আচার-সংস্কার প্রবর্তন করেন ব্রাহ্মণ্যবাদীরা। আর বৌদ্ধেরা মিশে যান পুরানো শিব-শক্তি-উপাসকদের সঙ্গে, যার ফলে হয় সহজিয়া ধর্মের প্রতিষ্ঠা। অদ্ভুত একটা সমন্বয়ের আদর্শ দেখা যায় বাংলার এই সহজিয়াবাদের মধ্যে। শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, বাউল, সমস্ত মতই জন্মেছে এই উৎস থেকে এবং পুরানো বাংলা সাহিত্যের এ-ই হল প্রধান আশ্রয়। বিশুদ্ধ আর্যসংস্কৃতি, দর্শন ও পুরাণও বাংলায় এসেছে। কিন্তু বাংলার মনোলোকে তেমন প্রাধান্য পায় নি সে সব।

দুঃখের বিষয়, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে যে সমন্বয় দেখা যায়, সমাজে তা হয়নি। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ভেদমুখী দৃষ্টিভঙ্গীই তা হতে দেয়নি। বরং অষ্টম-নবম শতাব্দীতে কুমারিল ভট্ট ও শঙ্করের হিন্দু-অভ্যুত্থান আন্দোলন এবং দ্বাদশ শতাব্দীতে বল্লালের কৌলীন্য সমাজে জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা আরো বেশী করে কায়েমই করেছে। মুসলীম আমলে এই অস্পৃশ্যেরাই ইসলাম নেন রাজশক্তির অনুগ্রহ লাভের আশায় এবং তখন থেকেই বাংলায় আত্মস্বতন্ত্র দুটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন-ধারা সৃষ্টি হয়। তবু বাউল, আউল, পীর, ফকির প্রভৃতির মাধ্যমে একটি হিন্দু-মুসলমান সমন্বয়ের চেষ্টা হয়, যার ফলে সত্যপীরকে হিন্দুরা শিরনি দিয়েছেন, মুসলমানেরাও রাধাকৃষ্ণ পদাবলী লিখেছেন।

বাংলা ভাষা

ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে আজ যে তেরো-চোদ্দটি ভাষা চলে, দু-একটি ছাড়া তার সবগুলিই এখন থেকে প্রায় হাজার বছর আগে প্রাকৃত থেকে জন্মায়। প্রাকৃতের জন্ম আরো এক বা দেড় হাজার বছর আগে।

বৈদিক আর্যেরা যখন উত্তর এশিয়ার ভল্গা তীরবর্তী কোন স্থান থেকে ভারতবর্ষে এসে বসতি স্থাপন করেন, তখন এদেশে সভ্য দ্রাবিড়গোষ্ঠীর মানুষরা বাস করতেন। তাঁরা কোন্ ভাষা ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিলেন, তা জানা যায় না। সিন্ধু উপত্যকার মহেঞ্জোদাড়ো, পাঞ্জাবের হরপ্পা ও (গুজরাট) আমেদাবাদের লোথালে এই বিলুপ্ত সভ্যতার যে সব নিদর্শন পাওয়া গেছে,

তার মধ্যে পোড়ামাটির সীলমোহরে উৎকীর্ণ কতকগুলি বর্ণমালা দেখা যায়। দুঃখের বিষয় এই লিপি পড়া যায় নি। গেলে হয়ত আর্যপূর্ব ভারতের ভাষার সন্ধান পাওয়া যেত।

এখনো পর্যন্ত ভারতবর্ষে লিখিত ভাষার সবচেয়ে পুরানো নিদর্শন পাওয়া যায় ঋগ্বেদে, যা খৃষ্টজন্মের অন্যূন দু-হাজার বছর আগের লেখা। লক্ষ্য করার বিষয় যে বেদ-উপনিষদের সংস্কৃত রামায়ণ-মহাভারতের যুগে অনেকটা সরল হয়ে এসেছে। মহাকাব্যের যুগের সঙ্গে আবার কালিদাস-ভবভূতির যুগের সংস্কৃতেরও একই রকম তফাৎ চোখে পড়ে। মোটের ওপর খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী থেকেই সাহিত্যে সংস্কৃত ও প্রাকৃতের পাশাপাশি প্রচলন দেখা যায়। কণিষ্কের (১ খৃঃ অঃ) সমসাময়িক কবি ভাস থেকে ভবভূতি (৮ খৃঃ অঃ) পর্যন্ত সংস্কৃত নাটকে উচ্চশ্রেণীর পুরুষের মুখেই শুধু সংস্কৃত ব্যবহৃত হয়েছে, আর সাধারণ মানুষ ও মহিলাদের মুখে বসানো হয়েছে প্রাকৃত।

অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে প্রাকৃতই সর্বজনের কথোপকথনের ভাষা ছিল, আর সংস্কৃত ছিল সংস্কৃতিচর্চার ভাষা। কেউ কেউ বলেন, আদি প্রাকৃতকেই ঘষে মেজে নূতন করে গড়ে নিয়েছিলেন বৈদিক আর্যেরা, তাঁদের নিজেদের আদিভাষার সঙ্গে মিশাল দিয়ে। তাই তার নাম সংস্কৃত।

যে ভাবেই হক, প্রাকৃত ভাষাও সারা ভারতে একরকম ছিল না। অঞ্চল-ভেদে তার বিভিন্ন ধরন ছিল—মাগধী, শৌরসেনী, বৈদর্ভী, নানা পর্যায়ের প্রাকৃত ছিল। বাংলা, ওড়িয়া, অসমীয়া প্রভৃতি পূর্বাঞ্চলীয় ভাষার জন্ম মাগধী প্রাকৃত থেকে। মাগধী প্রাকৃতের অপভ্রংশ থেকে ধীরে ধীরে এই ভাষাগুলির উৎপত্তি হয়েছে।

অষ্টম-নবম শতাব্দীতে সঙ্কলিত প্রাকৃত পৈঙ্গল নামক কবিতা সঙ্কলনে এই অপভ্রংশের নমুনা পাওয়া যায়। যেমন,

অগ্‌গর ভাত্ত কদলীপত্ত।
গাইকি ঘিত্ত দুগ্ধসযুত্ত॥
মৌলিমচ্ছ নালিয়াগুচ্ছ।
দিজ্জয় কান্তা খাএ পুণিবত্ত॥

দশম শতাব্দীতে রচিত চর্যাপদে এই ভাষা বাংলায় পরিণত হয়েছে। যেমন,

টিলাত মোর ঘর নাহি পরিবেশী।
হাঁড়িত ভাত নাএ নিতি আবেশী॥

বেঙ্গব সংসাব বাঢম যায়।
ছুহিল ছুধ কিএ বেন্টে সামায়॥

পঞ্চদশ শতাব্দীতে বচিত কৃষ্ণকীর্তনে এই বাংলা আমাদেব পবিচিত বাংলাব রূপ ধবেছে। এখান থেকে বৈষ্ণব সাহিত্য ও মঙ্গল সাহিত্যেব যুগ অতিক্রম কবে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা গদ্যভাষা সাহিত্যেব মাধ্যম হয়েছে এবং গত দুই শতাব্দীতে সেই ভাষাই আমাদেব মাতৃভাষা-রূপে অসীম ঐশ্বর্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ভাবতবর্ষেব আজকেব ভাষাগুলিকে অঞ্চল হিসাবে ভাগ কবলে মোটামুটি চাবটি শ্রেণীতে ফেলা যায। উত্তবাঞ্চলীয ভাষাগোষ্ঠীব মধ্যে পড়ে হিন্দী, উর্দু, পাঞ্জাবী, কাশ্মিবী। পূর্বাঞ্চলীয ভাষাগুলিব নাম আগেই কবা হয়েছে। পশ্চিমাঞ্চলে পাওযা যায গুজবাটী ও মাবাঠী এবং দক্ষিণাঞ্চলে তামিল, তেলেগু, কনাড়ী ও মালযালী। এব মধ্যে উত্তব ও পশ্চিমাঞ্চলেব ভাষাগুলি যেমন পবস্পব ঘনিষ্ঠ, দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলেব ভাষাগুলিও তেমনি একে অন্যেব জ্ঞাতি। যদিও প্রত্যেকেবই নিজস্ব বর্ণমালা আছে, তবু শব্দভাণ্ডাব ও ব্যাকবণবিধিতে এদেব ঐক্য লক্ষ্য কবাব মতো।

বাংলা ভাষাব প্রধান বিশেষত্ব এই যে তাতে সংস্কৃতেব মতো ক্লীবলিঙ্গেব ব্যবহাব নেই এবং সর্বনাম ও ক্রিয়াপদেব লিঙ্গানুযায়ী পবিবর্তন হয না বাংলায়, যা হয হিন্দীতে। বাংলায একবচন থেকে বহুবচনে এলেও হিন্দীব মতো শব্দেব রূপান্তব হয না, মূল শব্দেব সঙ্গে বা-বৃন্দ-গণ ইত্যাদি যোগ কবে বহুবচন বোঝাতে হয। বাংলা ভাষাব আব একটি বিশেষত্ব এই যে শব্দেব অন্তঃস্থিত ব্যঞ্জন বর্ণ প্রায সর্বত্রই হসন্ত আকাবে উচ্চাবিত হয়। ওড়িয়াতে হয সমস্ত শব্দই হলন্ত আকাবে।

বলে বাখা দবকাব যে বাংলা ভাষায় যেমন সংস্কৃত-প্রাকৃত-সম্ভূত শব্দেব প্রাচুর্য দেখা যায, তেমনি যায দেশজ এবং বহিবাগত শব্দেবও। বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দেব নাম তৎসম, সংস্কৃত-সম্ভূতেব নাম তদ্ভব। বিভিন্ন সময়ে আববী, ফার্সী, পর্তুগীজ, ডাচ, ফবাসী, ইংবেজী প্রভৃতি ভাষা এবং কোল, ওবাঁও, মুণ্ডা প্রভৃতি লোকভাষা থেকেও বিচিত্র পর্যায়েব শব্দমালা বাংলা ভাষাব পুষ্টিসাধন কবেছে।

বাংলা ভাষায লেখ্য ভাষা ও কথ্য ভাষাব মধ্যে মস্ত একটা পার্থক্য দেখা যায়। পদ্য ও গদ্য ভাষাব মধ্যেও পার্থক্য কম নেই। এমন কতকগুলো ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম আছে, যা শুধু পদ্যেই চলে। আধুনিক কালে কলকাতা অঞ্চলের

কথ্য ভাষাকে সাহিত্যে ব্যাপক ভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে, এবং গদ্য পদ্যের মধ্যেও সীমারেখা মোছার চেষ্টা চলছে। ভাষা চলন্ত জিনিস, জাতির সংস্কৃতি ও সমাজ-চেতনার ক্রমবিকাশের সঙ্গেই তা যুগে যুগে বিবর্তিত হয়। আজকের এই ভাষাও হয়ত আগামী দিনে আমূল বদলে যাবে।

সহস্র বর্ষব্যাপী বাংলা ভাষার এই বিবর্তনের পথে যে সাহিত্য জন্মেছে, এবার তার ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করা যাচ্ছে।

প্রথম অধ্যায়

শাক্ত ও শৈব সহজিয়া

পাল রাজাদের আমলে বাংলা দেশে বৌদ্ধ সহজিয়াদের বিশেষ প্রাদুর্ভাব হয়েছিল। বাঙালীরা আদিতে আর্যেতর জাতি। তাঁদের আচার-ব্যবহার, খাদ্য-পরিচ্ছদ, পূজাপদ্ধতি, সবই বৈদিক আর্যদের থেকে পৃথক ছিল। তাঁরা পিতৃ-দেবতা শিব ও মাতৃ-দেবতা শক্তির আরাধনা করতেন, করতেন আরো অনেক দেব-দেবীর আরাধনা। খৃঃ পূঃ তৃতীয় অব্দে মৌর্যেরা যখন মগধের শাসক, বাংলার বৃহৎ একাংশ তখন ছিল মগধের অন্তর্ভুক্ত। খৃষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীতে গুপ্তদের আমলে গোটা বাংলাদেশই ছিল গুপ্ত সাম্রাজ্যভুক্ত। এই আট শ বছরে উত্তর ভারত থেকে বৈদিক ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রভাব বাংলায় আসে। সমাজের উঁচু মহল এই সময় থেকে বর্ণাশ্রমিক শ্রেণীবিভাগ ও ধর্ম-ব্যবস্থা মেনে নেন, আর নীচু মহল স্বাগত করেন বৌদ্ধধর্মকে।

বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর বৌদ্ধরা দুটি যান অর্থাৎ পন্থায় ভাগ হয়ে যান—হীনযান আর মহাযান। যাঁরা বুদ্ধের বিশুদ্ধ ধর্ম নিয়ে রইলেন, তাঁরা হীনযানী, আর যাঁরা বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে তান্ত্রিক দেব-দেবী, অদৃষ্ট, জন্মান্তর ইত্যাদির মিশ্রণ করলেন, তাঁরা মহাযানী। তিব্বত, নেপাল, আসাম, বাংলা ও উড়িষ্যা, এই পূর্বাঞ্চলীয় দেশগুলিতে মহাযানী মত ভাঙতে ভাঙতে কালচক্রযান, সহজযান, বজ্রযান, আরো কতকগুলি যান সৃষ্টি হয়। বাংলার জনসাধারণ নিলেন সহজযানী মত, তাই তাঁদের নাম হল সহজিয়া। তাঁরা শিব-শক্তি-আরাধনার সঙ্গে বৌদ্ধধর্মকে মিশিয়ে নিলেন। তাঁদের মধ্যে যাঁরা সন্ন্যাস, বৈরাগ্য ও অন্যান্য বৌদ্ধ অনুশাসনের সঙ্গেই নৈরঞ্জনা-রূপিণী শবরীর সঙ্গে নির্বাণের তপস্যা করতেন, তাঁরা হলেন সিদ্ধাই বা সিদ্ধাচার্য। যাঁরা শিব-শক্তির আরাধনা করতেন এবং বৌদ্ধদের ধর্ম, সঙ্ঘ ও বুদ্ধ এই ত্রিরত্নকে ত্রিশূল-আকারে শিবের হাতে তুলে দিলেন, তাঁরা হলেন যোগী। এছাড়া বৌদ্ধ শূন্যবাদ ও তান্ত্রিক মোক্ষবাদে মিশিয়ে ধর্মপূজা করতেন, এমন আর একটা সম্প্রদায়ও ছিলেন। এই তিন শ্রেণীই কিছু কিছু সাহিত্য রচনা করেছিলেন পাল রাজত্বের চারশত

বৎসর ধরে। অর্থাৎ অষ্টম শতাব্দী থেকে একাদশ শতাব্দীর মধ্যে। পালেরা নিজেরা ছিলেন বৌদ্ধ, তাই বৌদ্ধদের তাঁরা ছিলেন প্রধান পৃষ্ঠপোষক।

চর্যাপদ

১৯১৬ সালে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল থেকে চর্যাচর্যবিনিশ্চয় নামে একখানি পুঁথি সংগ্রহ করেন। এই পুঁথিতে পাওয়া যায় সাতচল্লিশটি হেঁয়ালি-ধরনের পদ বা কবিতা এবং পুঁথির নাম অনুসারে এগুলির নাম দেওয়া হয় চর্যাপদ।

হাজার বছর আগে পাল রাজাদের আমলে কাহ্নপাদ, লুইপাদ, ভুসুকপাদ, সরোরুহবজ্র প্রমুখ সিদ্ধাচার্যেরা লিখেছিলেন এই সব পদ। আজ আমরা যে বাংলা লিখি বা বলি, এদের বাংলা তা থেকে অন্যরকম। তবু এ যে বাংলা ভাষাই, তা বুঝতে কষ্ট হয় না। সাধারণ ভাবে পদগুলি পড়তে সহজ ছড়ার মতো। কিন্তু সমস্ত পদই এমন এক সাংকেতিক পদ্ধতিতে লেখা যে এদের আসল বক্তব্য কি, তা বোঝাই দুষ্কর।

যেমন,

ভবনই গহন গম্ভীর বেগ বাহী।
দুআন্তে চিখিল মধ্যে ন থাহী॥
ধামার্থে চাটিল সাঙ্কম গঢ়ই।
পারগামি লোঅ নিভর তরই॥

অথবা,

কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল।
চঞ্চল চীএ পইঠো কাল॥
দিঢ় করিঅ মহাসুহ পরিমাণ।
লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅা জাণ॥

মাঝে মাঝে এদের বক্তব্য একেবারে অবোধ্য হয়ে ওঠে, অত্যধিক সাংকেতিক শব্দ ও প্রতীক-ব্যবহারের ফলে।

মোটকথা এইটুকু ধরা যায় যে শূন্য বা নির্বাণই হল জীবনের লক্ষ্য— সেখানে পৌঁছতে হলে বাসনার গণ্ডি অতিক্রম করে মানুষকে মুক্ত বা উলঙ্গ হতে হবে। তাহলেই হবে বোধি বা নৈরঞ্জনা-লাভ।

এই তত্ত্বটি বোঝানোর জন্যে চর্যাকাররা জগৎকে বলেছেন মায়া এবং মায়াকে আকাশকুসুম, শশকশৃঙ্গ, গন্ধর্বনগর ও নানা অলীক জিনিসের সঙ্গে তুলনা করেছেন তাঁরা। এঁদের ব্যবহৃত ভবনদী, মনপবন, কায়াতরু, কামনা-মৃগ প্রভৃতি চিত্র-প্রতীকগুলি বাংলা ভাষায় এখনো ঘরোয়া শব্দ হিসাবে চলে।

তত্ত্বকথার সঙ্গেই চর্যাপদগুলিতে তখনকার মানুষের নানা সামাজিক রীতি-নীতি ও বৃত্তি-ব্যবসার কিছু কিছু পরিচয় জানা যায়। সমাজে তখন অস্পৃশ্যতা ছিল। সাধারণ মানুষরা তাঁত বোনা, নৌকা চালানো, মাছ ধরা, চাষ করা, পাখী মারা, এই সব করতেন। আর ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও উচ্চজাতীয় গৃহস্থেরা শাস্ত্র পড়তেন, জপতপ করতেন, গীত-বাদ্য ও নাট্য চর্চা করতেন। এই শেষোক্ত সমাজে মদ্যপান এবং পাশাখেলাও চলত।

অবশ্য চর্যাপদগুলির সাহিত্য হিসাবে দাম অতি সামান্য। প্রবাদবাক্যে পরিণত হবার যোগ্য, কিংবা চতুর বাগ্‌বিন্যাস হিসাবে লক্ষণীয় পঙক্তি এতে অনেক আছে, কিন্তু কবিতা নেই। দু-একটা মাত্র পদে মাঝে মাঝে একটু ছবি পাওয়া যায়, যা কাব্যধর্মী। যেমন,

উঁচা উঁচা পবত,
তঁহি বসতি শবরী বালী।
মযূরাঙ্গী পিচ্ছি পিরহিণ
গিমত গুঞ্জামালী॥

সর্বজন-পরিচিত 'ভুবনেশ্বরীস্তোত্রে' কালিকার যে বর্ণনা আছে, তা অবিকল এই,

আবির্নিদাঘজলশীকরশোভিতবক্ত্রাং,
গুঞ্জাফলেন পরিকল্পিত হারযষ্টিম্।
পত্রাংশুকামসিতকান্তিমনঙ্গতন্বামাদ্যাং,
পুলিন্দতরুণীং সকৃৎ স্মরামি॥

শাক্তের কালিকাই কি সহজিয়ার মোক্ষরূপিণী শবরীর ছদ্মবেশে দেখা দেন নি এখানে?

নাথগাথা

চর্যাকারদের মতো বৌদ্ধ সহজিযাদের আর একটি সম্প্রদায় ছিলেন। এঁদের নাম যোগী বা নাথ যোগী। বৌদ্ধদের বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘ এই ত্রিরত্নের উপাসনা এঁদের হাতে এসে শিব-শক্তির উপাসনায় পরিণত হয়।

এই সম্প্রদায়ের বিখ্যাত গুরু মীননাথ, গোরক্ষনাথ, চৌরঙ্গীনাথ এক সময় সারা দেশে এবং দেশের বাইরেও সম্মানিত ছিলেন। নেপালের গোর্খারা আদিতে গোরক্ষনাথের শিষ্য এবং উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুরও তাঁরই নামের স্মৃতি বহন করছে।

এই নাথ সম্প্রদায়ও পাল আমলেই বিশেষ প্রভাবশালী ছিলেন। নানা কাহিনী ও উপকথার মাধ্যমে তাঁরা নিজেদের ধর্মমত প্রচার করেছিলেন। নাথেদের রচনা চর্যাপদের মতো বিচ্ছিন্ন গান নয়, তা কাব্যকাহিনী এবং এ পর্যন্ত দু-প্রস্থ কাহিনী পাওয়া গেছে। এক প্রস্থ হল গুরু মীননাথের মায়ায় বদ্ধ হওয়া এবং শিষ্য গোরক্ষনাথ কর্তৃক তাঁর উদ্ধারসাধনের কাহিনী, যার নাম মীনচেতন। আর এক প্রস্থ হল রাণী ময়নামতীর সাধনরহস্য এবং তাঁর পুত্র গোপীচাঁদের সন্ন্যাসগ্রহণের কাহিনী। দুই কাহিনীই যোগী ভিক্ষুকরা গ্রামে গ্রামে গেয়ে ফিরতেন।

ময়নামতী ও গোপীচাঁদের কাহিনীর যতটুকু গ্রেয়ার্সন কর্তৃক সংগৃহীত হয়েছে, তা পুরানো সন্দেহ নেই। কিন্তু ভাষা তার পাঁচশো বছর আগের নয়। মীনচেতন বা গোরক্ষবিজয়ের ভাষা আরো আধুনিক, বড জোর তিনশত বছরের পুরানো হবে। এমন হতে পারে যে হয়ত লোকের মুখে মুখে গাথা আকারে এক যুগ থেকে আর এক যুগ পর্যন্ত চলে আসার ফলেই এদের ভাষা সরল হয়ে গেছে, যা হতে পারেনি চর্যাপদের। তবে রচনার বিষয়বস্তু পুরানো এবং অনেক ক্ষেত্রে বেশ উপভোগ্যও। রাজা মাণিকচাঁদের স্ত্রী ময়নামতী স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্তা হয়ে ফেরুসা গ্রামে তপস্যা করতেন। হাড়িপা সিদ্ধাই তাঁকে জানান যে তাঁর ছেলে গোপীচাঁদ বারো বছরের জন্যে সন্ন্যাস না নিলে, অকালে মারা যাবেন। গোপীচাঁদ তখন মাতৃ-আজ্ঞায় সন্ন্যাস নিলেন এবং হাড়িপার কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যথাসময়ে বাড়ী ফিরে এলেন···সংক্ষেপে এই হল গোপীচাঁদ কাহিনীর সারাংশ।

এর মধ্যে সন্ন্যাসের আগে গোপীচাঁদ ও তাঁর দুই পত্নী অদুনা ও পদুনার কথোপকথন থেকে ছোট একটি অংশ উদ্ধৃত করছি,

মোর সঙ্গে যাবু রাণী পন্থের শোন কাহিনী।
ক্ষুধা কালে না পাবু অন্ন তৃষ্ণার কালে পানি॥
শালবন শিমুলবন চালিতে মান্দার।
যে ঠাঁই চলে হাড়িগুরু দিবসে আন্ধার॥

স্ত্রী আর পুরুষে যদি পন্থ বহিয়া যায়।
হেন বা দুষ্টের বাঘ আছে নারী ধর্‌য়া খায়॥

রাণীরা কিছু এতে ভয় পেলেন না। তাঁরা বললেন,

থাকনা কেনে বনের বাঘা তাক না করি ডর।
নিত কলঙ্ক মরণ হক স্বামির পদের পর॥

গোরক্ষবিজয়-কাহিনীর বিষয় হল কদলীপত্তনে গুরু মীননাথ তপস্যাভ্রষ্ট হয়ে রূপসীদের হাতে বন্দী হয়ে আছেন। নর্তকীবেশে গোরক্ষনাথ সেখানে এলেন এবং কায়াসাধন মন্ত্র প্রচার করলেন মাদল বাজিয়ে। মীননাথের চেতনা ফিরল, তিনি আবার বুঝলেন রূপ-লাবণ্য সুখ-সম্পদ সবই ক্ষণিকের। প্রকৃত সত্যবস্তু হল মহাজ্ঞান, যা তিনি হারিয়েছিলেন পার্বতীর অভিশাপে।

গোরক্ষনাথের তত্ত্বকথাগুলি এই রকম,

প্রদীপ নিবিলে গুরু কি করিবে তেলে।
আইল বান্ধিয়া কিবা ফল জল আগে গেলে॥
মূল কাটা গেলে গুরু না জীয়ায় গাছ।
বিনি জলে কথাত শুনিছ জীয়ে মাছ॥

শৈব ও বৌদ্ধধর্ম মিশেই যোগীধর্ম সৃষ্টি হয়েছিল, একথা আগে বলেছি। এক দিকে তাই যোগীরা সন্ন্যাস, নির্বাণ ও শূন্যের তপস্যা করতেন, অন্যদিকে শিব-দুর্গার আরাধনা করতেন এবং তন্ত্রমন্ত্র, ঝাড়ফুঁক ও বশীকরণ ইত্যাদি তন্ত্রাচারে অভ্যস্ত ছিলেন। মীননাথ গোরক্ষনাথে প্রথম দিকের এবং হাড়িপা ও ময়নামতীতে দ্বিতীয় দিকের দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। সুকুর মামুদ, ফৈজুল্লা ও ভবানী দাসের এবং আরো কোন কোন কবির গোরক্ষবিজয় বা মীনচেতন বই আছে।

শূন্যপুরাণ

এই পর্যায়ের আর একটি বিশিষ্ট রচনা হল শূন্যপুরাণ। এর লেখক রামাই পণ্ডিত তদানীন্তন মেদিনীপুরের অন্তর্গত যাজপুর অঞ্চলের লোক এবং সম্ভবত তিনি দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে জীবিত ছিলেন। মেদিনীপুর অঞ্চলে এখনো পণ্ডিত-উপাধিধারী ডোম-পুরোহিতদের একটি সম্প্রদায় দেখা যায়, যাঁরা ধর্ম ঠাকুর এবং হাড়িঝি চণ্ডীর পূজা করেন। হয়ত রামাই পণ্ডিতও এমনি কোন সহজিয়া-পরিবারভুক্ত ধর্মদেবতার পুরোহিত ছিলেন এবং বৌদ্ধ

শূন্যবাদ ও নৈরঞ্জনা-তত্ত্বের আলোকে তিনি সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের রহস্য ব্যাখ্যা করেছিলেন।

নাহি রেক নাহি রূপ নাহি ছিল বন্ন চিন।
নাহি আকাশ নাহি সূর্য নাহি ছিল রাত্রি দিন॥
শূন্যেতে ভ্রমণ প্রভুর শূন্যে করি ভব।
কাহারে সৃজিব প্রভু ভাবেন মাযাধর॥

বলা দরকার যে শূন্যপুরাণে সৃষ্টিতত্ত্বের মতো প্রলযতত্ত্বটিও সুন্দর।

শূন্য পুরাণের ভাষা দেখে অনেকে একে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ বা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকের রচনা বলেছেন। হতে পারে, কিংবা নাথগাথার মতো বহুল প্রচারের ফলে শূন্যপুরাণেরও যুগে যুগে ভাষাগত রূপান্তর হযে থাকতে পারে।

এ সিদ্ধান্ত করার প্রধান কারণ হল 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' নামে রামাই পণ্ডিতের নামাঙ্কিত বড় একটি কবিতা। এতে দ্বাদশ শতাব্দীতে তুর্কী অভিযানের ফলে দেশের ধর্মক্ষেত্রে কি বিপর্যয হযেছিল, তার চিত্র আছে।

আপুনি চণ্ডিকাদেবী তেঁহ হৈলা হাযাবিবি,
পদ্মাবতী হৈলা বিবি নূর।
জতেক দেবতাগণ হৈঞা সভে এক মন
প্রবেশ করিল যাজপুর॥
দেউল দেহারা ভাঙ্গে, কাড়্যা কিড়্যা খায রঙ্গে,
পাখড় পাখড মুখে বোল।
ধরিয়া ধর্মের পায় রামাঞি পণ্ডিতে গায
ই বড় বিষম গণ্ডগোল॥

দ্বিতীয় অধ্যায়

বৈষ্ণব সহজিয়া

একাদশ শতাব্দীতে পালেদের পর বাংলার শাসনক্ষমতা যায় সেনেদের হাতে। তাঁরা এসেছিলেন দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটক থেকে এবং তাঁরা ছিলেন বৈষ্ণবমতাবলম্বী হিন্দু। এই বংশের বল্লাল সেন সমাজে কৌলীন্যপ্রথা প্রবর্তন করেন। সমাজের তথাকথিত উঁচু ও নীচু শ্রেণীগুলিকে তিনি গণ্ডিবদ্ধ করে দেন এবং বৌদ্ধ ভিক্ষু, যোগী ও সহজিয়াদের সমাজ থেকে উৎখাত করেন। এমন কি, তাঁদের ভিক্ষা দেওয়াও নাকি নিষিদ্ধ হয়। সাধারণ মানুষরা অনেকে তখন রাজধর্ম হিসাবে বৈষ্ণবধর্ম নিলেন এবং শিব-শক্তি আরাধনা রূপান্তরিত হল রাধা-কৃষ্ণ আরাধনায়। যাঁরা পুরানো সহজিয়া মত আঁকড়ে থাকলেন, তাঁরা হয়ে গেলেন সমাজ-বহির্ভূত। এঁরাই হলেন বাউল।

আদি বৈষ্ণবধর্ম বাংলায় এসেছিল দক্ষিণ থেকে। দক্ষিণের শ্রীসম্প্রদায় ছিলেন ভক্তিবাদী এবং তাঁদের সঙ্গেই ছিলেন আলোয়ারা ভাব-সাধকদের একশ্রেণী, যাঁরা সখীভাবে আরাধনা করতেন। সেন রাজাদের প্রভাবে এঁদের মতই হয়ত বাংলায় এসেছিল। তবে এঁদের আরাধনায় রাধা ছিলেন না, ছিলেন নাপ্পীনাই। হয়ত তিনিই বাংলায় রাধা হয়ে গেছেন, কারণ এই শব্দটির অর্থ নাকি আরাধিকা। মোটকথা এই আদি বৈষ্ণব বা বৈষ্ণব সহজিয়ারাই হলেন বাংলায় বৈষ্ণবধর্মের ভিত্তিস্থাপক। এঁরা রাধা-কৃষ্ণ আরাধনার যে রীতি প্রবর্তন করেন, তা বাংলায়, উড়িষ্যায়, আসামে ও মিথিলায় প্রচুর সাহিত্যরচনার প্রেরণা দেয়। এই প্রেরণাতেই দ্বাদশ শতাব্দীতে জয়দেব এবং চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীতে বিদ্যাপতি ও বড়ু চণ্ডীদাসের উদ্ভব হয়। ষোড়শ শতাব্দীতে যখন শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব হয়, তিনি এঁদের রচনার দ্বারাই প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন।

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল গীতি,
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ দামোদর সনে, মহাপ্রভু রাত্রি দিনে,
গায় পড়ে পরম আনন্দ॥

মহাপ্রভুর পার্শ্বচর নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র বীরভদ্র সহজিয়া বৈষ্ণবদেরই গৌড়ীয় বৈষ্ণবে রূপান্তরিত করেন। কেউ কেউ বলেন, উত্তর ভারতের মুসলীম দরবার থেকে সুফীদের মতবাদ বাংলায় এসেছিল, তা থেকে বৈষ্ণব ভাব-সাধনার জন্ম। এ কথা বোধহয় সত্য নয়, কারণ দ্বাদশ শতাব্দীতে যখন মুসলীম অভিযান হয়, তখনই জয়দেব দেখা দিয়েছেন।

জয়দেব

জয়দেব বাংলার আদি বৈষ্ণব কবি। তিনি অবশ্য বাংলায় লেখেন নি, লিখেছেন সরল সংস্কৃতে। কিন্তু বাংলা দেশে রাধা-কৃষ্ণ লীলা-বিষয়ক পদ তিনিই প্রথম লিখেছেন। বৈষ্ণব কবিদের তাই তিনি গুরুস্বরূপ।

বীরভূম জেলার কেঁদুলি গ্রামে জয়দেবের জন্ম। তাঁর সহধর্মিণীর নাম পদ্মাবতী। স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে রাধা-কৃষ্ণ লীলা গান করতেন। জয়দেব সম্ভবত যৌবনে পীযূষলহরী নাটক লেখেন এবং প্রৌঢ় বয়সে গীতগোবিন্দ কাব্য লিখে গৌড়েশ্বর লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি হন। তাঁর রচনায় তাঁর সমসাময়িক কবি শরণ, উমাপতিধর ও ধোয়ীর উল্লেখ আছে।

কেউ কেউ বলেন জয়দেব উড়িষ্যা দেশবাসী। অবশ্য উড়িষ্যাতেও কেঁদুলি বা কেন্দুবিল্ব গ্রাম আছে এবং গীতগোবিন্দ ও পীযূষলহরীর প্রচার আছে জনসাধারণের মধ্যে। ওড়িয়া সমাজ বলেন, জগন্নাথের আদেশে কবি গীতগোবিন্দ রচনা করেন এবং দেবদাসী পদ্মাবতীকে ভার্যারূপে গ্রহণও করেন ঈশ্বরাদেশে। বলা বাহুল্য এ সবই অনুমান ও কিংবদন্তী। জয়দেব বাঙালীই, তাতে আর সন্দেহ নেই। তাঁর রচনায় নদী, মাঠ ও আকাশের যে বর্ণনা আছে, নব-নারীর পোশাক-পরিচ্ছদের যে উল্লেখ আছে, তা সম্পূর্ণ বাংলার। কেঁদুলিতে আজো প্রতি বৎসর মহাসমারোহে জয়দেবের মেলা হয়, এটাও লক্ষ্য করার মতো।

এটা লক্ষ্য করার মতো যে ভাগবত, হরিবংশ, মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ ইত্যাদি কৃষ্ণ-লীলা বিষয়ক কোন প্রামাণ্য গ্রন্থে কৃষ্ণের লীলা-সহচরীরূপে রাধার নাম নেই। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে লেখা পদ্মপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ ইত্যাদিতে আছে। কাজেই দ্বাদশ শতাব্দীতে জয়দেব রাধার সন্ধান পেলেন কোথা থেকে? এই জন্যে অনেকের অনুমান, রাধা জয়দেবেরই সৃষ্টি

এবং আরাধনাময়ী ভক্তির প্রতীক বলেই তাঁর নাম রাধা। এ অনুমান একেবারে মিথ্যা না হতে পারে।

জয়দেব যদিও গীতগোবিন্দ সংস্কৃতে লিখেছেন, কিন্তু তাঁর ভাষা এত সরল, ছন্দোবদ্ধ ও পদযোজনা এত সুললিত যে তা প্রায় বাংলারই কাছাকাছি বলা যেতে পারে। তিনি নিজেই বলেছেন,

যদি হরি স্মরণে সরসং মনো
যদি বিলাস কলাসু কুতূহলম্।
মধুর কোমল কান্ত পদাবলীং
শৃণু তদা জয়দেব সরস্বতীম্॥

সত্যিই তাঁর 'মেঘৈর্মেদুরমম্বরং' বা 'ধীরসমীরে যমুনাতীরে, বসতি বনে বনমালী' প্রভৃতি পদগুলি অপূর্ব মধুর রচনা। তবে জয়দেবের লেখায় শব্দ-চাতুর্যই প্রধান। চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদের রচনায় যে ভাবের ঐশ্বর্য ও অনুভূতির গভীরতা দেখা যায়, জয়দেবে তা নেই। জয়দেবের রচনার রুচিও সব সময় সুন্দর নয়। এই জন্যেই কোন বিখ্যাত সমালোচক কৌতুক করে বলেছিলেন, গীতগোবিন্দে গীত আছে, গোবিন্দ নেই।

সবাই জানেন, লক্ষ্মণ সেনের আমলে বখ্তিয়ার খিলজী বাংলা দখল করেন, আর হিন্দু রাজ্যের অবসান হয় সেখানেই। জয়দেবের দশাবতার স্তোত্রে 'ম্লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালং' শ্লোকটিতে কি এরি আভাস ধ্বনিত হয়েছে?

বিদ্যাপতি

জয়দেবের দুশো বছর পরে মিথিলায় জন্মান কবি বিদ্যাপতি। তাঁর পিতার নাম গণপতি ঠাকুর। পঞ্চগৌড়ের অধীশ্বর শিব সিংহের তিনি ছিলেন সভাসৎ-কবি। কবি নিজেই বলেছেন রাজা তাঁকে বিসফী নামে একখানি গ্রাম উপহার দেন এবং রাজমহিষী লছিমার অভিপ্রায় অনুসারে তিনি রাধা-কৃষ্ণ-লীলা-বিষয়ক পদ রচনা করেন। যদিও পারিবারিক ধর্মে তিনি শৈব ছিলেন এবং হর-গৌরী-লীলা নিয়ে লেখা পদও তাঁর অনেক আছে।

বিদ্যাপতি মিথিলার কবি, তাঁর ভাষা বাংলা নয়। তবু বাংলা সাহিত্যের আলোচনা থেকে তাঁকে বাদ দেওয়া সম্ভব নয়। প্রথমত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের যিনি প্রতিষ্ঠাতা, সেই শ্রীচৈতন্য তাঁর রচনার দ্বারা প্রভাবান্বিত

হয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত গোবিন্দদাস, শেখর প্রমুখ বাংলার বিশিষ্ট কয়েকজন বৈষ্ণব কবি তাঁর ভাষার অনুকরণে একটি কাব্য ভাষা সৃষ্টি করেছিলেন, যার নাম ব্রজবুলি এবং যে ভাষায় রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত লিখেছিলেন ভানুসিংহের পদাবলী। তাছাড়া সেদিন বাংলা, উড়িষ্যা, আসাম ও মিথিলা একই সংস্কৃতির অনুগামী ছিল। পরস্পরের মধ্যে তাই অন্তরঙ্গ আদান প্রদান ছিল তাঁদের সব বিষয়েই।

বিদ্যাপতি অতুলনীয় কবি। তাঁর রচনার ছন্দোমাধুর্য যেমন অসাধারণ, শব্দ-প্রয়োগের নৈপুণ্য তেমনি লক্ষ্য করার মতো। উপমা ব্যবহারের কৃতিত্বে কেউ কেউ তাঁকে কালিদাসের সমকক্ষ বলেন। অবশ্য অত্যধিক উপমা প্রীতির ফলে মাঝে মাঝে তাঁর রচনা একটু কৃত্রিম মনে হয়। তাছাড়া অশ্লীলতা-দোষও আছে কোথাও কোথাও।

তা সত্ত্বেও বিদ্যাপতির কবিতা যেমন মধুর, তেমনি গভীর। যেমন,

জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোহি মধুর বোল শ্রবণহি শুনল
শ্রুতিপথ পরশ না গেল।
কত মধু যামিনী রভসে গোঁয়ায়নু,
না বুঝনু কৈছন কেলি।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু,
তবু হিয়া জুড়ন না গেলি॥

কিংবা,

আজু মঝু গেহ গেহ করি মানলু,
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোহে অনুকূল ভয়ল,
টুটল সব সন্দেহা॥

একটা জিনিস এই সূত্রে লক্ষ্য করার মতো যে চৈতন্য-পরবর্তী বৈষ্ণব কবিরা কৃষ্ণকে কেউ ভগবান বলেন নি। তাঁদের কৃষ্ণ কান্ত বা সখা। কিন্তু বিদ্যাপতির কৃষ্ণ সর্বশক্তিমান ভগবান। তাই তিনি তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন,

কিয়ে মানুষ পশু পাখী ভই জনমিয়ে
অথবা কীট পতঙ্গে।
করম বিপাকে গতাগতি পুন পুন
মতি রহুঁ তুয়া পরসঙ্গে॥

আপন কবিত্ব সম্বন্ধে বিদ্যাপতির ধারণা ছিল খুব উঁচু। তিনি বলেছেন,

বালচন্দ বিজ্জাপতি ভাষা।
দুহুঁকো না লাগই দুজ্জন হাসা॥
এ পরমেশর হরশির সোহই।
ও নিশচয় নায়রী মন মোহয়॥

বড়ু চণ্ডীদাস

কৃষ্ণকীর্তন-রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির সমসাময়িক কবি এবং খাঁটি বাংলা ভাষায় রাধা-কৃষ্ণ লীলা নিয়ে কাব্য লিখেছেন তিনিই প্রথম। কিন্তু তিনি কোথায় জন্মান, বীরভূমের নান্নুরে, না বাঁকুড়ার ছাতনায়, তা নিয়ে যেমন তর্ক আছে, তেমনি আছে চণ্ডীদাস একজন না দু-জন, তা নিয়েও।

আসলে কৃষ্ণকীর্তন বইটি প্রথম বাঁকুড়া থেকে আবিষ্কৃত হয় ১৯১৮ সালে এবং পরীক্ষা করে দেখা যায় যে তা পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের রচনা। তার রচয়িতার নাম চণ্ডীদাস, তিনি বড়ু অর্থাৎ ব্রাহ্মণ সন্তান এবং বাসলী বা বাশুলী দেবীর পূজারী।

এখানেই সুরু হয় চণ্ডীদাস-সমস্যার। বাংলা দেশে বহুকাল থেকে কবি চণ্ডীদাসের নাম ও রচনা সুপরিচিত। ‘সুখের লাগিয়া এঘর বাঁধিনু’, ‘কি মোহিনী জান বঁধু’, ‘আমি সাগরে ডুবিয়া সাধনা করিব’, ‘এস এস বঁধু এস’ প্রভৃতি পদগুলি তাঁরি নামে চলেছে চিরদিন। সবাই জানতেন, তিনি নান্নুরের লোক, বাশুলী দেবীর পূজা করতেন এবং রামী রজকিনী তাঁর সাধন-সঙ্গিনী ছিলেন। কৃষ্ণকীর্তন আবিষ্কৃত হওয়ার পরে বোঝা গেল, এই বই আর ঐ সব পদ একজনের লেখা নয়। তখন থেকেই দুই চণ্ডীদাসের সিদ্ধান্ত চলিত হয়েছে। যদিও কেউ কেউ বলেন, কৃষ্ণকীর্তন অপ্রচলিত ছিল বলে, তার ভাষা সাবেকী থেকে গেছে, আর পদাবলী গায়কদের কণ্ঠে প্রচারিত হয়েছে বলে, তার ভাব ও ভাষা বদলাতে বদলাতে সরল এবং সুন্দর হয়ে গেছে। কাজেই চণ্ডীদাস একজনও হতে পারেন!

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে রাধা-কৃষ্ণের প্রথম সাক্ষাৎ, বড়াই বুড়ীর মধ্যস্থতায় দু-জনে পরিচয়, দু-জনের স্বল্পস্থায়ী লীলা, তারপর কৃষ্ণের মথুরা যাত্রা বর্ণিত হয়েছে। এই কাব্যে কৃষ্ণকে পরম পুরুষ এবং রাধাকে পরমা প্রকৃতি ত নয়ই, ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলা রূপেও চিত্রিত করা হয়নি। তাঁরা একে অন্যকে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি করেন, এমন অশিষ্ট আচরণ করেন যা বর্বর অসভ্যদের উপযুক্ত। তাছাড়া দুই-এক স্থানে ভিন্ন এ বইয়ে মহৎ কবিত্বের চিহ্নও বড় বেশী পাওয়া যায় না।

অনেক বাছাবাছি করে একটি অংশ উদ্ধৃত করা যাচ্ছে,

কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কূলে।
কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে॥
আকুল শরীর মোর বেয়াকুল মন।
বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইলা রান্ধন॥

বড়ু চণ্ডীদাস যে গীতগোবিন্দ পড়েছিলেন, তার পরিচয় আছে তাঁর কাব্যে। কোন কোন স্থানে জয়দেবের হুবহু অনুসরণও করেছেন তিনি। কিন্তু সবসুদ্ধ জড়িয়ে ভাষার দিক থেকে কৃষ্ণকীর্তন যতটা মূল্যবান, সাহিত্যের দিক থেকে তা নয়। বাংলা বৈষ্ণব কাব্যের যে অপরূপ মহিমা পরবর্তী কালে সৃষ্টি হয়, এ তার ক্ষীণ পূর্বাভাস মাত্র এবং সেই জন্যেই লক্ষণীয়।

পদকল্পতরুর একটি পদে আছে, গঙ্গাতীরে কোন স্থানে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসে সাক্ষাৎ হয়েছিল।

বিদ্যাপতি শুনি চণ্ডীদাস গুণ
দরশনে ভেল অনুরাগ॥
দুহুঁ উৎকণ্ঠিত ভেল।
সঙ্গ হি রূপ নারায়ণ কেবল
বিদ্যাপতি চলি গেল॥

এই চণ্ডীদাস বড়ু চণ্ডীদাস কি?



তৃতীয় অধ্যায়

পুরাণ প্রচারকেরা

সমাজের নীচু মহলে যখন শিব-শক্তি ও রাধা কৃষ্ণ আরাধনার সঙ্গেই চলছে রকমারি মন্ত্রতন্ত্র ঝাড়ফুঁক, কারণপান ও অন্যান্য কদাচারের আধিপত্য, উঁচু মহলের বিদ্বানরা তখন অনুভব করলেন যে হিন্দু সংস্কৃতির প্রধান আশ্রয় যা, রামায়ণ মহাভারত ও ভাগবত, বাংলা ভাষায় তার সম্পদ দেশবাসীর হাতে পৌঁছে না দিলে তাঁদের চিত্তশুদ্ধি হবে না। তাঁরা উচ্চ আদর্শ বা মহৎ জীবন-বোধও লাভ করবেন না। এই উদ্দেশ্যে পঞ্চদশ শতাব্দীতে কৃত্তিবাস রামায়ণ লিখলেন, মালাধর বসু লিখলেন ভাগবত। এঁদের প্রায় একশত বৎসর পরে কাশীরাম দাস মহাভারত রচনা করলেন।

রামায়ণ মহাভারত এবং ভাগবত আরো কোন কোন কবিও লিখেছেন। যেমন কবি অনন্তরামের রামায়ণ আছে, সঞ্জয় ও শ্রীকর নন্দীর মহাভারত আছে। ভাগবতও পরশুরাম এবং আরো কোন কোন কবি লিখেছিলেন। কিন্তু আগের তিন কবিই দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। শুধু সেদিন নয়, আজ পর্যন্ত এঁরা বাংলার ছোট বড় সব মহলে সমান আদরে পঠিত। মাইকেল মধুসূদন কৃত্তিবাস ও কাশীদাসের জনপ্রিয়তার উল্লেখ করে বলেন, এঁদের বই বেলতলায়ও পড়ে, বটতলায়ও পড়ে। সর্বাংশেই খাঁটি কথা। গত চার-পাঁচশো বছর ধরে এই দুই কবি বাঙালীকে ধর্ম-কর্ম আচার-সংস্কার শিখিয়েছেন। সুখে ও দুঃখে গোটা জাতিকে দিয়েছেন প্রচুর আশা ও সান্ত্বনা। বাংলা ভাষায় যত কাব্য, নাটক, পাঁচালী লেখা হয়েছে, সব হয়েছে এঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে। প্রকৃতপক্ষে এই দুই কবির হাতে অলক্ষ্যে যেন সারা দেশের সমাজ ও সংস্কৃতিকেই গড়ে তুলেছে। আর মালাধরের রচনা পড়ে কৃতার্থ বোধ করেছেন স্বয়ং শ্রীচৈতন্য, তাঁর কৃতিত্ব সম্বন্ধে তাই আর বেশী বলার কি আছে?

কৃত্তিবাস

রামায়ণ-রচয়িতা কৃত্তিবাস বাংলার আদিকবি-রূপে সম্মানিত। তাঁর আগে, বাংলা ভাষায় যা লেখা হয়েছে, সাহিত্য হিসাবে তার মূল্য সামান্যই।

মাতৃভাষার মাধ্যমে সমগ্র রামায়ণকে উপস্থিত করে, সবরকম ভাব ও অনুভূতিই যে বাংলায় প্রকাশ করা যায়, কৃত্তিবাসই তা প্রথম প্রমাণ করেছেন।

নদীয়া-শান্তিপুরের অদূরবর্তী ফুলিয়ায় কৃত্তিবাসের জন্ম। খৃষ্টীয় ১৩৯৯ নাগাদ তাঁর জন্ম হয়। তাহিরপুরের স্বাধীন রাজা গণেশ বা কংসনারায়ণ বা দনুজমর্দন দেবের পৃষ্ঠপোষকতা পান তিনি এবং তাঁরই উৎসাহে বাংলা ভাষায় রামায়ণ রচনা করেন।

কৃত্তিবাস বাল্মীকি রামায়ণের হুবহু অনুবাদ করেন নি। কোথাও কোথাও আক্ষরিক অনুসরণের চিহ্ন দেখা গেলেও, আসলে তাঁর রামায়ণ হল মূল-অবলম্বনে স্বাধীন রচনা। মূলের আখ্যানাংশ অনেক জায়গায় কবি পরিবর্তিত করেছেন, অনেক উপাখ্যান যেমন অঙ্গদ রায়বার, ভস্মলোচনের কাহিনী, তিনি নূতন করে সংযোজন করেছেন। কিন্তু সব কিছুর সমবায়ে রচনায় এমন একটি শ্রী ও সামঞ্জস্য স্থাপন করেছেন তিনি, যা অতুলনীয় শক্তির পরিচয়।

একটা জিনিস কোন পাঠকেরই নজর এড়ায় না যে কৃত্তিবাসের রাম, সীতা, লক্ষ্মণ, রাবণ, বিভীষণ, মন্দোদরী, সকলেই চরিত্রে ও চিন্তায় পুরোপুরি বাঙালী। তাই তরণী সেনের কাটামুণ্ড রাম রাম ধ্বনি করে। তাই সীতাহরণের পরে রাম ও লক্ষ্মণ বালকের মতো আর্তনাদ করে কাঁদেন। রচনার এই অন্তরঙ্গতাই কবি কৃত্তিবাসকে বাংলার ঘরে ঘরে সমাদৃত করেছে।

অবশ্য কৃত্তিবাসের রচনা আজ আমরা যে ভাবে পাই, তার ওপর নিশ্চয় প্রচুর ঘষা-মাজা হয়েছে। শ্রীরামপুরের মিশনারীরা যখন কৃত্তিবাসী রামায়ণ প্রথম ছাপিয়ে প্রকাশ করেন, তখন জয়গোপাল তর্কালংকার তার পুঁথি সম্পাদন করেন। অনেকে মনে করেন, রচনা সরল ও সুখপাঠ্য করার জন্যে অনেক জায়গাতেই তিনি কলম চালিয়েছিলেন। কারণ নলিনীকান্ত ভট্টশালী যে রামায়ণের পুঁথি আবিষ্কার করেন, তার ভাষা প্রচলিত রামায়ণের ভাষার মতো প্রাঞ্জল ও প্রসাদগুণসম্পন্ন নয়।

কৃত্তিবাসের রচনার একটু নিদর্শন এখানে উদ্ধৃত করা হচ্ছে,

গোদাবরী তীরে আছে কমল কানন।
তথা কি কমলমুখী করেণ ভ্রমণ॥
পদ্মালয়া পদ্মাবতী সীতারে পাইয়া।
রাখিলেন পদ্মবনে বুঝি লুকাইয়া॥

আপন কবি-প্রতিভা সম্বন্ধে কৃত্তিবাসের মনে ছিল দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়। তাই তিনি বলেছেন,

সরস্বতী অধিষ্ঠান আমার শরীরে।
নানা ছন্দ নানা ভাষা আপনা হইতে স্ফুরে ॥
* * *
যত যত পণ্ডিত আছে ভুবন ভিতরে।
আমার বিদ্যায় কেহ আঁটিতে না পারে।
* * *
কৃত্তিবাস রচে গীত সরস্বতীর বরে ॥

মালাধর বসু

কৃত্তিবাসের সমকালে বা অল্প পরে জন্মান মালাধর বসু। কৃত্তিবাস যেমন রামায়ণের, ইনি তেমনি ভাগবতের ভাবানুবাদ করেন। এঁর বইয়ের নাম শ্রীকৃষ্ণবিজয়, যা রচিত হয় আনুমানিক ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে।

বর্ধমান জেলার কুলীন গ্রামে তাঁর জন্ম। গৌড়েশ্বর হুসেন শা তাঁকে গুণরাজ খাঁ উপাধি দেন। আত্মপরিচয় হিসাবে কবি লিখেছেন,

কায়স্থ কুলেতে জন্ম কুলীন গ্রামে বাস ॥
বাপ ভগীরথ মোর মাতা ইন্দুমতী।
যার পুণ্য হইতে মোর নারায়ণে মতি ॥
গুণহীন অধম মুঞি নাই কোন জ্ঞান।
গৌড়েশ্বর দিলা নাম গুণরাজ খান ॥

মালাধর সমগ্র ভাগবত বাংলায় লেখেন নি, মাত্র বৃন্দাবন-লীলার অংশটুকুকেই কাব্যাকারে প্রসারিত করেছেন। মূলগ্রন্থের দশম ও একাদশ স্কন্ধ পুনর্লিখনে কবি কৃতিত্ব কম দেখান নি। এক দিকে যেমন রচনা তাঁর স্বচ্ছ সুন্দর, অন্যদিকে রচনায় তিনি তেমনি সর্বত্র সংযম ও শুচিতার ভাবটি সার্থকভাবে বজায় রেখেছেন।

মালাধরের রচনার নিদর্শন হিসাবে শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের শেষাংশ থেকে কিছুটা এখানে উদ্ধৃত করা হল,

সর্বঘটে থাকি সেহ সকলে করায়।
কেহ তাঁরে নাহি দেখে তাঁহার মায়ায় ॥

সূক্ষ্মরূপ ব্রহ্মপদ ভাবিতে না পারি।
সকল হৃদয়ে গোঁসাই রন তনু ধরি॥

গোপীরা কৃষ্ণকে কে কিভাবে সাজাবেন, সেই প্রসঙ্গে মালাধর লিখছেন,

কেহ বলে পরাইমু পীত বসন।
চরণে নূপুর দিমু বলে কোহ্ন জন॥
কেহ বলে বনমালা গাঁথি দিব গলে
মণিময় হার দিমু কোহ্ন সখী বলে॥

আগেই জয়দেব-প্রসঙ্গে বলেছি যে ভাগবতে শ্রীরাধা নেই, গীতগোবিন্দেই প্রথম তিনি দেখা দিয়েছেন চিন্ময়ী হ্লাদিনী শক্তিরূপে। মালাধর সেখান থেকেই বোধহয় আহরণ করেছেন রাধাতত্ত্ব এবং তাঁকে শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে উপস্থিত করেছেন। যেমন,

কানু বলে সত্য কহি বিনোদিনী রাই।
নবীন কাণ্ডারী আমি নৌকা নাহি বাই॥

শ্রীচৈতন্য বৈষ্ণবধর্মকে দার্শনিকতাসমৃদ্ধ নূতন মতবাদ রূপে প্রতিষ্ঠিত করার আগে যেসব গ্রন্থ তার পথ প্রস্তুত করেছিল, মালাধরের বই তার মধ্যে প্রধান। এই বই মহাপ্রভু পড়েছিলেন এবং মালাধরের পৌত্র বসু রামানন্দকে শ্রদ্ধাচ্ছলে তাই বলেছিলেন,

তোমার কা কথা তোমার গ্রামের কুকুর।
সেহ মোর প্রিয় অন্য জন বহু দূর॥

কাশীরাম দাস

কৃত্তিবাসী রামায়ণের মতো কাশীদাসী মহাভারতও বাংলার ঘরে ঘরে সমাদৃত। কাশীরাম আনুমানিক ১৬০০ খৃষ্টাব্দে বর্ধমান জেলার সিঙি গ্রামে জন্মান।

নিজের বংশ পরিচয় দিয়ে কবি লিখেছেন,

ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ বাস সিঙিগ্রাম।
প্রিয়ঙ্কর দাসপুত্র সুধাকর নাম॥
তৎপুত্র কমলাকান্ত কৃষ্ণদাস পিতা।
কৃষ্ণদাসানুজ গদাধর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা॥

পাঁচালী প্রকাশি কহে কাশীরাম দাস।
অলি হব কৃষ্ণপদে মনে অভিলাষ॥

কাশীরামের অন্য দুই ভাইও কবি ছিলেন। বড় ভাই কৃষ্ণকিঙ্কর লিখেছেন কৃষ্ণবিলাস কাব্য, আর ছোট ভাই গদাধর লিখেছেন জগন্নাথমঙ্গল কাব্য। অবশ্য কাশীরামের যেমন দেশজোড়া নাম, এঁদের তা নয়। অনেকের ধারণা যে কাশীরাম মূল মহাভারত পড়ার মতো সংস্কৃত জানতেন না। কথকের মুখে ভারতকথা শুনে তাই তিনি ছন্দে গেঁথেছেন। এছাড়া আরো একটি জনশ্রুতি চলিত আছে যে সমগ্র মহাভারত কাশীরাম লেখেন নি।

আদি সভা বন বিরাটের কত দূর।
ইহা রচি কাশীদাস গেলা স্বর্গপুর॥

ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দরাম দাস এর পর অবশিষ্টাংশ রচনা করেন।

মোটের ওপর কাশীরামের মহাভারতে ও কৃত্তিবাসী রামায়ণের মতো পৌরাণিক চরিত্রগুলি রীতিমতো বাঙালী হয়ে গেছে এবং নানা পুরাণ ও উপ-পুরাণের অনেক আখ্যান এসে মূল আখ্যায়িকার ভিতর জায়গা করে নিয়েছে। অশ্বত্থামা হত-ইতি-গজের গল্প, জলপিণ্ডস্থলের গল্প, কাম্যকবনের গল্প ইত্যাদি কাশীরামের কবি কল্পনার সৃষ্টি। কাশীরামের রচনভঙ্গি প্রাঞ্জল ও পরিচ্ছন্ন। লক্ষ্যভেদের পূর্বে অর্জুনের রূপ বর্ণনা করে কাশীরাম লিখছেন,

দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মূরতি।
পদ্মপত্র যুগ্মনেত্র পরশয় শ্রুতি॥
অনুপম তনুশ্যাম নীলোৎপল আভা।
মুখরুচি কত শুচি করিয়াছে শোভা॥
সিংহগ্রীব বন্ধুজীব অধরের তুল।
খগরাজ পায় লাজ নাসিকা অতুল॥

রামায়ণ মহাভারত ভাগবত প্রভৃতি মহৎ গ্রন্থের বাণী মধ্যযুগের সেই অন্ধকার দিনে যাঁরা মাতৃভাষার মৃত্তিকায় জাহ্নবীধারার মতো প্রবাহিত করে গিয়েছেন, সবাই তাঁরা ভগীরথের মর্যাদায় পূজিত হবার যোগ্য। কতদিন হয়ে গেছে, আজো তাই,

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

চতুর্থ অধ্যায়

গৌড়ীয় বৈষ্ণব

আদি বৈষ্ণবেরা রাধা-কৃষ্ণ লীলার স্থূল রূপটিই কবিতায় ফুটিয়েছিলেন। তার পবিত্র সুন্দর দিব্য রূপটি সৃষ্টি হল মহাপ্রভুর প্রভাবে। তাই চৈতন্য-পরবর্তী বৈষ্ণব সাহিত্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জাতের জিনিস। মহাপ্রভুর পরিকর ছয় গোস্বামী (রূপ, সনাতন, জীব, গোপাল ভট্ট, ভট্ট রঘুনাথ ও দাস রঘুনাথ) বৈষ্ণবধর্মের দার্শনিক ভিত্তি স্থাপন করেন। রূপ গোস্বামীর 'উজ্জ্বল নীলমণি' ও 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'তে, জীব গোস্বামীর 'ষট্‌সন্দর্ভ' এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চরিতামৃতে' এই দর্শনের স্বরূপ ব্যাখ্যাত হয়েছে।

চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব কবিতার মর্মস্থানে এই দর্শনের তত্ত্ব নিহিত আছে, তার আবেদন তাই দেহগত নয়, আধ্যাত্মিক, এই কথা বলেন বৈষ্ণব ভক্তেরা। কিন্তু চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, শেখর প্রমুখ কবির রচনা মন দিয়ে পড়লে, তার মধ্যে মানবিক সুখ-দুঃখ ও কামনা-কল্পনার প্রতিচ্ছবিও কম দেখা যায় না। স্পষ্ট বোঝা যায় রাধা-কৃষ্ণ কাহিনীর আড়ালে সামাজিক মানুষের মনই কথা বলেছে গোষ্ঠলীলা ও প্রেমলীলার পদগুলিতে।

গৌরাঙ্গলীলা বিষয়ক পদগুলি কীর্তন গানে গৌরচন্দ্রিকা রূপে বিশেষ সমাদৃত হলেও, প্রকৃত কবিতা হিসাবে সবগুলোই উৎকৃষ্ট নয়। কিন্তু বৈষ্ণব সাহিত্যের ঐশ্বর্য শুধু পদাবলী নয়, তার চরিত এবং তত্ত্ব-গ্রন্থগুলিও। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবত (১৫৭৩), কবিরাজ কৃষ্ণদাসের চৈতন্যচরিতামৃত (১৫৮১), লোচনের চৈতন্যমঙ্গল (১৫৮০), নরহরির ভক্তিরত্নাকর, নিত্যানন্দের প্রেমবিলাস, ঈশান নাগরের অদ্বৈতপ্রকাশ এবং যদুনন্দনের কর্ণামৃত প্রভৃতি বই একাধারে দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, ইতিহাস ও সাহিত্য হিসাবে মূল্যবান।

এই লেখকরা অধিকাংশই চৈতন্য-সমসাময়িক, অথবা তাঁর মৃত্যুর অল্পকাল পরের। কিন্তু সবাই অলৌকিক মহিমা আরোপ করেছেন তাঁর ওপর। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল ছাড়া আর কোথাও মহাপ্রভুর অবসানের কোন দিশা

মেলে না। জয়ানন্দ বলেছেন, রথ উৎসবে নৃত্য করতে করতে তাঁর পায়ে ইটের আঘাত লাগে এবং তাতে জর হয়। হয়ত এই জরেই জীবনান্ত হয়েছে তাঁর। কিন্তু পাপ-ভয়ে উল্লেখ করেন নি একথা বৈষ্ণব ভক্তেরা।

শ্রীচৈতন্য

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর জন্মের আগেই বৈষ্ণব সহজিয়ারা দেশে রাধা-কৃষ্ণের যুগল মূর্তি পূজা করতেন এবং জয়দেব, চণ্ডীদাস, মালাধর প্রমুখ কবিরা বইপুঁথিও লিখেছিলেন কৃষ্ণলীলা নিয়ে। কিন্তু বৈষ্ণব ধর্মের যে দার্শনিক ভিত্তি তা মহাপ্রভুই গঠন করেন।

১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যের জন্ম। তাঁর পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্র, মাতার নাম শচী দেবী। বাল্যে তিনি গঙ্গানাথ পণ্ডিতের টোলে পড়েন। তাঁর দুই বিবাহ, প্রথমা পত্নী লক্ষ্মীপ্রিয়ার মৃত্যুর পর বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিবাহ করেন। সামাজিক ছোট-বড়র বিভেদ-লোপের এবং ধর্মান্তরিত হিন্দুকে স্বধর্মে ফিরিয়ে আনার আন্দোলন করে তিনি একই সঙ্গে সমাজপতি ও মুসলমান শাসকদের কোপে পড়েন। যৌবনেই সন্ন্যাস নিয়ে কাশী, গয়া, বৃন্দাবন, মথুরা, প্রয়াগ এবং দাক্ষিণাত্যের নানা তীর্থ ঘুরে তিনি পুরীতে আসেন। এখানেই ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে তাঁর জীবনাবসান হয়।

মহাপ্রভু নিজে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাছাড়া তাঁর শিষ্য ও অনুচরদের মধ্যে ছিলেন সনাতন, রূপ, জীব প্রমুখ বিশিষ্ট পণ্ডিতরা। এঁরাই সহজিয়াদের আদি বৈষ্ণবধর্মকে শুচিতা ও সৌন্দর্য দেন। কিংবদন্তী আছে, বৈষ্ণব সহজিয়াদের এক গুরুর নাম ছিল নেড়া, সেই অনুসারে তাঁর শিষ্যেরা পরিচিত ছিলেন নেড়ানেড়ী নামে। নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র তাঁদের গৌড়ীয় মতে দীক্ষা দেন এবং সেখান থেকেই চৈতন্যপন্থী বৈষ্ণব-সমাজের সৃষ্টি হয়।

মোটামুটিভাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা বলেন, সখ্য, দাস্য, বাৎসল্য, মধুর, এই চার ভাবে সাধনা করা যায় ঈশ্বরের। সখ্য হল কৃষ্ণ ও ব্রজ রাখালদের ভাব, দাস্য হল কৃষ্ণ ও উদ্ধবের ভাব, বাৎসল্য হল কৃষ্ণ ও নন্দ-যশোদার ভাব, আর মধুর হল কৃষ্ণ ও রাধার ভাব। এই মধুর ভাবই হল তাঁদের মতে শ্রেষ্ঠ ভাব বা মহাভাব। মহাভাবের আবার দুটি বিভাগ—রাধাভাব ও গোপীভাব। রাধা নিজের জন্যেই কৃষ্ণের মিলন কামনা করতেন, আর গোপীরা করতেন রাধা-কৃষ্ণের মিলন কামনা। রাধা-ভাবের নাম রাগাত্মিক ভাব, আর গোপী-

ভাবের নাম রাগানুগ ভাব। মহাপ্রভু প্রথম ভাবের প্রতীক ছিলেন, দ্বিতীয় ভাবটি আর সমস্ত বৈষ্ণবদের জন্যে।

চণ্ডীদাস ঃ জ্ঞানদাস ঃ গোবিন্দদাস

আগেই বলা হয়েছে যে গোপীদের কথা ভাগবতে থাকলেও, রাধার কথা নেই। রাধা বাঙালীরই সৃষ্টি এবং রাধাভাব ও গোপীভাবে আরাধনাও বঙ্গ-ভূমিরই দান। কেউ কেউ বলেন, উত্তর ভারতের মুসলীম দরবার দিয়ে সুফী ধর্মতত্ত্ব বাংলায় এসেছিল, তার ফলেই এই মতের জন্ম হয়েছে। কেউ আবার বলেন, দক্ষিণ ভারত থেকে রামানুজ-প্রবর্তিত শ্রীবৈষ্ণবদের ধর্মমতই এই মতকে প্রভাবিত করেছে।

এই দ্বিতীয় মতটিই বেশী সমীচীন মনে হয়। শঙ্করাচার্যের মতে ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মায়া। রামানুজ বলেন, ব্রহ্মও সত্য, জগৎও সত্য। ভক্তির মাধ্যমে জগৎ ব্রহ্মে যুক্ত হয়। মহাপ্রভু এই মতকেই আর একটু প্রসারিত করে বললেন, জগৎ ও ব্রহ্ম একে অন্য থেকে অচ্ছেদ্য। এ দুই চিরন্তন প্রেমে আবদ্ধ। মহাপ্রভুর এই মতের নাম অচিন্ত্য ভেদাভেদ। অবশ্য শ্রীবৈষ্ণবরা লক্ষ্মী-নারায়ণের উপাসক, রাধা-কৃষ্ণের নন।

মহাপ্রভুর আদর্শ এবং তাঁর শিষ্যমণ্ডলীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনাবলী বাংলা দেশে ষোড়শ শতাব্দীতে এক নূতন ভাবের তরঙ্গ আনল। সমাজজীবনে যেমন দেখা দিল নূতন একটা প্রাণ-স্পন্দন, সাহিত্যে তেমনি এল একটা জাগ্রত গতিবেগ। এত দিন পর্যন্ত যা সাহিত্য রচিত হয়েছিল, তাকে দূরে ঠেলে দিয়ে বৈষ্ণব সাহিত্য সারা দেশের হৃদয় অধিকার করে নিল। তার কারণ সত্যকার মহৎ সাহিত্যের সুরু এখানেই।

বৈষ্ণব সাহিত্যের এই বিরাট ঐশ্বর্য মোটামুটি দু-ভাগে বিভক্ত—গীত বা পদাবলী সাহিত্য, আর তত্ত্ব সাহিত্য। তত্ত্ব সাহিত্যের আলোচনা পরে করা হবে। এখানে শুধু পদাবলীর কথাই বলছি। পদাবলীর বৃহত্তম অংশই রচিত রাধা-কৃষ্ণ লীলার বিচিত্র দিক নিয়ে।

কৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের জন্যে জ্যোৎস্না রাত্রে বা বর্ষা রাত্রে রাধা একা যমুনাতীরে যাচ্ছেন। কিংবা কৃষ্ণের অপেক্ষায় সখীদের সঙ্গে কুঞ্জবনে বসে আছেন, কৃষ্ণ এলেন না। অথবা বিলম্বে আসায় রাধা অসন্তুষ্ট হয়েছেন, তাই কৃষ্ণ তাঁর সন্তোষ বিধান করছেন। রাধা-কৃষ্ণলীলার

এই কাব্য-সুষমাময় বহু বিচিত্র অধ্যায় নিয়ে চণ্ডীদাস, জ্ঞান দাস, গোবিন্দ দাস, শেখর প্রমুখ কবিরা অনুপম পদাবলী লিখেছেন। ভাবের বৃন্দাবন ছেড়ে কৃষ্ণ কর্মের মথুরায় চলে গেলেন এবং বৃন্দাবনবাসীরা রাধারূপী আরাধনার দীপ জ্বালিয়ে তাঁর প্রতীক্ষা করতে লাগল, অনুপম মাথুর পদাবলীর মধ্যে দিয়ে কবিরা এই ছবিটিকেও রূপ দিয়েছেন অপরূপ ভাষায়।

শ্রীকৃষ্ণের গোচারণ, রাখাল বালকদের সঙ্গে মাঠে মাঠে দুরন্তপনা করা, মা যশোদার স্নেহব্যগ্র হৃদয়ের অস্থিরতা, এ নিয়েও আশ্চর্য রকম সুন্দর পদ লিখেছেন বলরাম দাস, উদ্ধব দাস, যাদবেন্দ্র। আর গৌরাঙ্গলীলা-বিষয়ক পদও লিখেছেন বহুজন, যাঁদের মধ্যে বাসুদেব ঘোষ, নরহরি, গোবিন্দদাস, জগদানন্দ প্রমুখ প্রসিদ্ধ। বলা বাহুল্য এঁরা সবাই চৈতন্য-পরবর্তী এবং ষোড়শ থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর ভেতরের লোক।

এঁদের মধ্যে গোবিন্দদাস এবং শেখর ব্রজবুলিতে অসীম দক্ষতা দেখিয়েছেন। জ্ঞানদাসের রচনা সরল স্নিগ্ধ এবং আড়ম্বরহীন। দৃষ্টান্ত হিসাবে তিন জনেরই কিছু কিছু রচনা-নিদর্শন এখানে উদ্ধৃত করা হচ্ছে। জ্ঞানদাস বলছেন,

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর।
দেহের পরশ লাগি দেহ মোর কান্দে।
পরাণ পীরিতি লাগি স্থির নাহি বান্ধে॥

গোবিন্দদাস বর্ষাভিসার বর্ণনা করছেন,

চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট।
মন্দির বাহির কঠিন কপাট।
তঁহি অতি দূরতর বাদর দোল।
বারি কিয়ে বারয়ে নীল নিচোল॥

বিরহের অবস্থা বর্ণনা করে শেখর লিখছেন,

অতি শীতল মলয়ানিল
মন্দ মন্দ বহনা,
হরিবৈমুখী হামারি অঙ্গ
মদনানল দহনা॥

সব সখী মেলি ঘেরি বৈঠত,
গাহত হরিলীলা।
ঐছন ধ্বনি শুনত শুনত
ধনী উচকিত ভেলা॥

পুরানো আমলেই জ্ঞানদাস চণ্ডীদাসের এবং গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির 'কবি-সন্তান' বলে সম্মানিত হয়েছিলেন। এর অর্থ জ্ঞানদাসের রচনা চণ্ডীদাসের মতো প্রাঞ্জল অন্তরস্পর্শী, আর গোবিন্দদাসের রচনা বিদ্যাপতির মতো অলঙ্কৃত ও শব্দ-ঝঙ্কারময়। সবাই জানেন,

চণ্ডীদাস রস-পদ্মে অলি জ্ঞানদাস।
মকরন্দময় ছন্দে যাঁহার প্রকাশ॥

এবং,

ভণয়তি রাস রস বিদ্যাপতি শূর।
কবি গোবিন্দদাস রসপূর॥

কিন্তু পদাবলী সাহিত্যের যিনি সম্রাট, সেই চণ্ডীদাস সম্বন্ধে এখানে বিশেষ কিছু বলা হল না। তার কারণ আগেই বলেছি। কৃষ্ণকীর্তন-রচয়িতা বড় চণ্ডীদাস এবং পদাবলী-রচয়িতা চণ্ডীদাস এক লোক নন, এ বোঝা যায় উভয়ের লেখা পড়লেই। পদাবলী-রচয়িতাকে দীন বা দ্বিজ চণ্ডীদাস বলা হয়। তিনি মহাপ্রভুর পরবর্তী, এই কথা প্রমাণিত হয় 'আজু কে গো মুরলী বাজায়' পদটি থেকে। কিন্তু বরাবর যে সব মনোরম পদ চণ্ডীদাসের নামে চলে আসছে, তার বেশির ভাগই এখন জ্ঞানদাস, লোচন প্রভৃতির নামে চিহ্নিত করা হচ্ছে এবং দীন বা দ্বিজের নামে যে পদগুলি নির্ধারিত হয়েছে, তা মোটেই অসাধারণ নয়, নিতান্ত চলনসই রচনা।

বৃন্দাবন ঃ কৃষ্ণদাস ঃ লোচন

বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য সর্বজন-সমাদৃত হলেও, বৈষ্ণবদের ভক্তিতত্ত্ব, সাধন-রহস্য বা জীবন-দর্শন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে হলে, আমাদের পড়তে হয় রূপ গোস্বামীর উজ্জ্বলনীলমণি, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বা জীব গোস্বামীর ষট্‌সন্দর্ভ প্রভৃতি গ্রন্থ। বাংলায় চৈতন্যজীবনী-বিষয়ক গ্রন্থগুলিতেও এই দিককার অনেক আলো মিলবে।

চৈতন্য-সমসাময়িকদের মধ্যে নরহরি, জগদানন্দ প্রমুখ কবিরা তাঁর সম্বন্ধে কিছু কিছু পদ লিখেছিলেন। মুরারি গুপ্ত কড়চায় অল্প কিছু আলোকপাত করেছিলেন তাঁর ব্যক্তি-জীবনের উপর এবং কবি কর্ণপূর তাঁর চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে মহাপ্রভুর মহিমা কীর্তন করেছিলেন। কিন্তু মহাপ্রভুর পূর্ণাঙ্গ জীবনী-গুলির কোনটাই তাঁর সমসাময়িকের রচনা নয়। চৈতন্যভাগবত-রচয়িতা বৃন্দাবন দাস মহাপ্রভুর মানসপুত্র নামে খ্যাত, কিন্তু তাঁর শৈশবেই প্রভুর লোকান্তর হয়, তাঁকে তিনি স্বচক্ষে দেখেন নি। চৈতন্যচরিতামৃত-রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ জীব গোস্বামীর শিষ্যরূপে বৃন্দাবনে থাকতেন। বৃদ্ধ বয়সে তিনি এই গ্রন্থ লেখেন। তিনি এবং চৈতন্যমঙ্গল রচয়িতা লোচন বৃন্দাবন দাসের অল্প পরের লোক। এই জন্যেই জীবনীগুলির পরস্পরের মধ্যে আছে অনেক তথ্যগত গরমিল। তা সত্ত্বেও তিনটি বইই মূল্যবান।

চৈতন্যভাগবত মোটামুটিভাবে চৈতন্য-জীবনের ইতিহাস। তাতে অলৌকিক কাহিনী নেই বললেই চলে। কবিত্ব বা দার্শনিকতারও প্রাচুর্য নেই। সাদাসিধা সরল পদ্যে তিনি চৈতন্য-বৃত্তান্ত ব্যক্ত করেছেন। চৈতন্যচরিতামৃত জীবনেতিহাস নয়, কবিরাজ গোস্বামী এতে পরিবেষণ করেছেন চৈতন্য-চরিতের অমৃত। 'রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত তনু' গৌরাঙ্গ তাঁর মতে মানুষও নন, দেবতাও নন, তিনি একটি দিব্য ভাব। এই ভাবকে বিবিধ দুরূহ দার্শনিক তত্ত্বের সাহায্যে ব্যাখ্যা করেছেন তিনি এবং করেছেন এমন অনস্থণ নীরস ভাষায়, যা পড়তে অনেকেই হোঁচট খান। লোচনের চৈতন্যমঙ্গল চমৎকার কাব্য। তিনি বিষ্ণুপ্রিয়া-চৈতন্যকে লক্ষ্মী-জনার্দন-রূপে দেখেছেন এবং ভক্তিবিনম্র নিষ্ঠায় লিখেছেন সমগ্র কাব্যটি। তাই তাঁর বইয়ে অলৌকিক কাহিনীর ছড়াছড়ি দেখা যায়।

এছাড়া মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য-যাত্রায় সহযাত্রী গোবিন্দ কর্মকারের কড়চা নামে যে বই আছে, তা অনেকের মতে জাল। অন্তত তার ভাষা যে উনবিংশ শতাব্দীর আগের নয়, এ নিঃসন্দেহ।

প্রকৃত পক্ষে চরিতামৃত বাংলা ভাষার এক অদ্বিতীয় গ্রন্থ। এর বহু উক্তি আমাদের ভাষায় প্রবাদে পরিণত হয়েছে।

যেমন,

অরসজ্ঞ কাক খায় জ্ঞান নিম্বফলে।
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্রমুকুলে॥

কামে আর প্রেমে হয় বহুত অন্তর।
কাম অন্ধতম প্রেম নির্মল ভাস্কর॥

* * *

মর্কট বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইঞা।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞা॥

এত বড় মনস্বী ছিলেন কবিরাজ গোস্বামী, কিন্তু কি অপূর্ব বিনয় তাঁর! নিজেকে তিনি বৃদ্ধ জরাতুর কাষ্ঠপুত্তলী বলেছেন এবং নিজ গ্রন্থ সম্বন্ধে বলেছেন,

আমি লিখি ইহ কবি বাহ্য অভিমান॥

পঞ্চম অধ্যায়

মঙ্গলকাব্য

বিদ্বান সমাজ ও সাধারণ সমাজের সাহিত্য যখন পরস্পরকে স্পর্শ না করে পৃথক পৃথক খাতে বয়ে চলেছে, তখন কিছুসংখ্যক কবি অনুভব করলেন, এ দুইয়ে যোগস্থাপনের প্রয়োজন। এঁরা লিখলেন মঙ্গল বা দেবমহিমাত্মক কাব্য। মঙ্গল কথাটির এই অর্থে প্রথম ব্যবহার দেখা যায় জয়দেবে। এই সব মঙ্গলকাব্যে পৌরাণিক ও অর্ধ-পৌরাণিক দেব দেবীর সঙ্গেই নানা লৌকিক দেব-দেবীর মহিমা কীর্তিত হয়েছে। একদিকে আছেন শিব, চণ্ডিকা, ধর্ম, অন্যদিকে আছেন বাঘের, সাপের ও কুমীরের দেবতারা।

সব মঙ্গলেরই ধরন এক রকম। প্রত্যেক দেবতাই কবিকে স্বপ্নে আদেশ দেন তার মহিমা মর্ত্যে প্রচার করতে। সব মঙ্গলেই নায়ক দেবতার বরে সমস্ত বাধা জয় করে, সমস্ত অসম্ভব সম্ভব করেন। সর্বত্র ভক্তের যে বিরোধী, অথবা উদ্দিষ্ট দেবতা সম্বন্ধে যে অবিশ্বাসী, তার সর্বনাশ হয়। সব মঙ্গলেই কুলনারীরা কাহিনীর নায়ককে দেখে পতিনিন্দা করেন, বিরহিণীরা বারমাস্যা বর্ণনা করেন, বিপদে পড়লে নায়করা বর্ণানুক্রমিক স্তোত্রে দেবতাকে তুষ্ট করেন। এই একঘেয়েমি সত্ত্বেও মঙ্গল কবিতায় সমসাময়িক সমাজের নিখুঁত ছবি পাওয়া যায়। পাওয়া যায় বিচিত্র বৃত্তি-ব্যবসায় এবং মানুষের নিখুঁত চিত্র। উচ্চ কবিত্বও পাওয়া যায় স্থানে স্থানে। লক্ষ্য করবার বিষয় যে, মঙ্গলকাব্যের দেবতারা সবাই খামখেয়ালী, অবিবেচক ও প্রতিহিংসাপরায়ণ। ভক্তের জন্যে তাঁরা সবই করেন, প্রতিদ্বন্দ্বী দেবতার ভক্তকে নাকাল করবার জন্যেও করেন না এমন কাজ নেই।

মানুষের চরিত্রও মঙ্গলকাব্যে কোথাও ব্যক্তিত্ব, পৌরুষ বা আত্মমর্যাদার পরিচায়ক নয়। দেবতার খেয়ালখুশির প্রভাবে তারা ভেসে চলেছে অসহায়ভাবে। তাদের নিজের কোন ক্ষমতা নেই, দেবতার কৃপা হলে মরা ছেলে বাঁচে, ডোবা নৌকা ভেসে ওঠে, পশ্চিমে সূর্য দেখা দেয়। এক দিকে মুসলীম শাসন, অন্যদিকে বর্ণাশ্রমের শাসন মানুষকে কি রকম নিশ্চেষ্ট নির্বীর্য করে

ফেলেছিল, এ থেকে তা টের পাওয়া যায়। পঞ্চদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই মঙ্গলকাব্য-পর্যায় লিখিত হয়েছে এবং এক এক দেবতার ওপর লেখা হয়েছে অনেকগুলি করে মঙ্গল।

মনসামঙ্গল ঃ বিজয় গুপ্ত

মনসার পুরানো স্তোত্রে তাঁকে আস্তিক মুনির মাতা, বাসুকির ভগিনী ও ও জরৎকারুর পত্নী বলা হয়েছে। সম্ভবত তিনি আর্যেতর জাতির কন্যা এবং নাগবংশ-সম্ভুতা। কালে এই নাগই সাপে রূপান্তরিত হয়েছে এবং জল, জঙ্গল ও জলাভূমি-সমাকীর্ণ বাংলায় তাঁর পূজা প্রবর্তিত হয়েছে।

সমাজ-বিজ্ঞানীরা বলেন, ভয় থেকেই অধিকাংশ গ্রাম্য দেব-দেবীর সৃষ্টি। সর্পদেবী মনসা নিশ্চিত তাই। এই ভাবেই বাঘ, কুমীর এবং বসন্ত-কলেরারও দেব-দেবীর উৎপত্তি হয়েছে। বাংলা ভাষায় মনসার মাহাত্ম্য নিয়ে অনেক মঙ্গলকাব্য লেখা হয়েছে। বরিশালের বিজয় গুপ্ত ও ময়মনসিংহের নারায়ণ দেব-রচিত পদ্মাপুরাণ দু-খানিই তার মধ্যে প্রাচীনতম। দু-জনেই পঞ্চদশ শতাব্দীর লোক। এছাড়া সপ্তদশ শতাব্দীতে বর্ধমানের কেতকাদাস এবং ক্ষেমানন্দও মনসামঙ্গল লেখেন, যা বহুল প্রচারিত।

মনসার মহিমা প্রচারের জন্য লেখা এই মঙ্গলে কি ভাবে মনসাকে অমান্য করায় শৈব চাঁদ সদাগরের একমাত্র পুত্র লখাই বিবাহের রাত্রে সর্পাঘাতে প্রাণ হারাল এবং তার বালিকা বধূ স্বামীর মৃতদেহ নিয়ে ভেলায় ভাসতে ভাসতে অবশেষে স্বর্গের রজকিনী নেতার সাক্ষাৎ পেল, তার মাধ্যমে দেবসভায় নৃত্য দেখিয়ে ও দেবতাদের প্রীতি আহরণ করে স্বামীকে বাঁচাল, তার কাহিনী বিবৃত হয়েছে। লখাইয়ের জীবনপ্রাপ্তিতেই হল চাঁদের পরাজয় এবং তিনি পূজা করলেন মনসার।

এই কাব্যে মনসার যে রূপ ফুটেছে, তা দেবতার নয়, হিংস্র পিশাচিনীর। শৈব চাঁদকে বশ্যতা স্বীকার করানর জন্যে তিনি এমন কোন নীচতা নেই, যার আশ্রয় নেন নি। মানুষের ব্যক্তিত্ব বা পৌরুষকেও এতে কিছুমাত্র মর্যাদা দেওয়া হয় নি। চাঁদ সদাগর পুরুষকারের সমর্থক, ভাগ্যের সঙ্গে ভয়ের সঙ্গে তিনি আপোষ করতে রাজী নন। তাই তাঁকে চরম দুর্গতি ভোগ করিয়ে শেষ পর্যন্ত হার মানান এবং বাঁ হাতে হলেও, মনসার পূজা করান হয়েছে।

কিন্তু মনসামঙ্গলের নারীচরিত্র দুটিই সুন্দর। নিষ্ঠা, সাহস ও জাগ্রত

আশার প্রতীক হিসাবে বেহুলা যেমন সুন্দর, মমতাময়ী মাতৃত্বের প্রতীক হিসাবে তার শাশুড়ী সনকা তেমনি চমৎকার চরিত্র। বিবাহবাসরে সর্পাঘাতে যখন পুত্র-বিয়োগ হল, তখন ক্রুদ্ধ মাতৃত্ব সব দোষ চাপিয়ে দিল ভাগ্যহীনা বালিকা বধূর ঘাড়ে। তার ভাঙা কপাল না হলে এমন হবে কেন?

খণ্ড কপালী বেহুলা চিরুণদাঁতী।
বিয়ার দিনে খাইলি পতি না পোহাতে রাতি॥

সেই বধূই আবার যখন মৃত স্বামী নিয়ে নিরুদ্দেশে ভাসতে উদ্যত, তখন অসহায় মাতৃত্ব হাহাকার করে উঠল তাঁর বুকে!

সনকা কাঁদিয়া বলে আলো অভাগিনী।
এ তিন ভুবন মাঝে কভু নাহি শুনি॥
বালিকা যুবতী বৃদ্ধা যার পতি মরে।
বিধবা হইয়া সেই থাকে নিজ ঘরে॥
কিসের কারণে তুমি জলেতে ভাসিবে।

বাংলার বাল্যবৈধব্যের এই সকরুণ বেদনা এবং বাঙালী মায়ের এই বুক-ভাঙা কান্নার সুরটি বিজয় গুপ্ত, নারায়ণ দেব থেকে কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ পর্যন্ত একটানা চলে এসেছে এবং মনসার ভাসান কোনও উচ্চ কবিত্বের স্বাক্ষর বহন না করলেও বাংলার ঘরে ঘরে আদৃত হয়েছে এই বাস্তবতার জন্যেই।

চণ্ডীমঙ্গল ঃ কবিকঙ্কণ

মহিষাসুর-নাশিনী যে চণ্ডিকার কথা পুরাণে কীর্তিত হয়েছে, বাংলার মঙ্গলচণ্ডী তা থেকে স্বতন্ত্র দেবতা। ইনি গৃহস্থ-কল্যাণ-বিধায়িনী, তাই শান্তি ও শুচিতার আশ্রয়-স্বরূপিণী। কবে কি ভাবে এঁর উদ্ভব হয়েছে বলা কঠিন। তবে সর্পবেষ্টিতা মনসার মতো ক্রূর কোপন প্রকৃতি এঁর নয়, কাজেই অত আদিম ইনি নন।

ষোড়শ শতাব্দীতে এই চণ্ডীর মাহাত্ম্য নিয়ে কয়েকখানি মঙ্গলকাব্য লেখা হয়। সব চেয়ে প্রসিদ্ধ কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের বই। বর্ধমান জেলার দামিন্যা গ্রামে তাঁর জন্ম। গ্রাম্য ডিহিদারের উৎপাতে জন্মভূমি ছেড়ে তিনি যান মেদিনীপুরের আড়ারায়। সেখানে ভূম্যধিকারী বাঁকুড়া রায়ের পুত্রের গৃহশিক্ষক হন এবং সেই খানেই তাঁর প্রসিদ্ধ কাব্য লেখেন। তাঁর সমসাময়িক মাধবাচার্যেরও একই বিষয়ে কাব্য আছে।

চণ্ডীমঙ্গলে দুই প্রস্থ কাহিনী। এক প্রস্থ ধনপতি সওদাগরের বাণিজ্য উপলক্ষে সিংহল-প্রবাস এবং তাঁর পুত্র শ্রীমন্তের পিতার খোঁজে সিংহলযাত্রা, আর এক প্রস্থ হল কালকেতু ব্যাধ ও তার পত্নী ফুল্লরার দারিদ্র্যমোচনের কাহিনী। ধনপতির অনুপস্থিতি কালে জ্যেষ্ঠা পত্নী লহনার কনিষ্ঠা খুল্লনাকে নির্যাতন, শ্রীমন্তের শৈশব, সিংহল-যাত্রাকালে শ্রীমন্তের কালীদহে কমলে কামিনী দর্শন, বহু মনোরম ও মর্মস্পর্শী অধ্যায় আছে প্রথম কাহিনীটিতে। দ্বিতীয় কাহিনীটিতেও স্বর্ণ গোধিকা সেজে ফুল্লরার ঘরে চণ্ডিকার আগমন এবং ফুল্লরার কল্পিত দারিদ্র্যের কাহিনী বর্ণনা, কালকেতুর সাহস ও ধর্মপ্রাণতা ইত্যাদির অনেক উপভোগ্য চিত্র আছে।

শুধু মঙ্গলকাব্য-পর্যায়ের নন, বাংলা সাহিত্যেরই একজন বিশিষ্ট কবি মুকুন্দরাম। তাঁর সহজ সরল বর্ণনায় আশ্চর্য সুন্দর এক-একটি ছবি মূর্তি নেয়। যেমন,

মন্দ মন্দ বহে শীত দক্ষিণ পবন।
অশোক কিংশুকে রামা বলে আলিঙ্গন॥
কেতকী ধাতকী ফোটে চম্পকবরণ।
কুসুম পরাগে অন্ধ হৈল অলিগণ॥

শ্রীমন্তের ঘুমপাড়ানী গানটিও সুন্দর। একটু উদ্ধৃত করা হচ্ছে,

আয় আয় আয়রে,
কি লাগিয়া কান্দে বাছা
কোন্ ধন চায়রে॥
তুলিয়া আনিব গগন ফুল,
একেক ফুলে লক্ষেক মূল,
সে ফুলে গাঁথিয়া দিব যে হার।
প্রাণের বাছা মোর
না কান্দ আর॥

কবিকঙ্কণের আসল বৈশিষ্ট্য চরিত্রচিত্রণে। স্বামী-প্রাণা ফুল্লরার এবং বিড়ম্বিতা খুল্লনার চরিত্র দুটি তাঁর হাতে যেমন জীবন্ত হয়েছে, তেমনি জীবন্ত হয়েছে ধূর্ত বণিক মুরারি শীল ও জুয়াচোর ভাড়ু দত্তের চরিত্র দুটি। কাল-কেতুর চরিত্রটিও তিনি নিপুণ ভাস্করের মতো কাল পাথর কুঁদে তৈরি

করেছেন মনে হয়। এ যুগের লোক হলে, কবিকঙ্কণ নিশ্চয় কাব্য না লিখে লিখতেন উপন্যাস।

ধর্মমঙ্গল : ঘনরাম

বৌদ্ধদের ধর্ম শেষ পর্যন্ত সহজিয়াদের হাতে ধর্মঠাকুরে পরিণত হন। এই ধর্মঠাকুর কোথাও শিব, যেমন নাথযোগীদের সাহিত্য, কোথাও নিরাকার নিরঞ্জন পরমেশ্বর, যেমন শূন্যপুরাণে। কোথাও বা তিনি স্বয়ং-সম্পূর্ণ এক দেবতা এবং মনসা ও চণ্ডিকার মতো ভক্তবৎসল, তাঁদেরই মতো ভক্তের শত্রু-নিধনে বা বিঘ্ন-মোচনে ষোল-আনা যুক্তি-বিচার-বিবর্জিত।

ন্যায় অন্যায় ও জন্ম-মৃত্যুর আদিকারণ এই ধর্ম ঠাকুরের মাহাত্ম্য নিয়ে বহু মঙ্গল লেখা হয়েছে। মাণিক গাঙ্গুলী এবং ঘনরাম দু-জন কবির লেখা ধর্মমঙ্গল পাওয়া গেছে। ঘনরাম অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকের লোক। তাঁর জন্ম বর্ধমানে। মাণিক গাঙ্গুলী তাঁর অল্প আগের বা পরের। ঘনরামের বইটিই বেশী প্রসিদ্ধ এবং ধর্মমঙ্গল বলতে সাধারণত তাঁর বইই বোঝায়।

ধর্মমঙ্গলের কাহিনী সংক্ষেপে এই—ঠাকুরদেব ইছাই ঘোষ গৌড়রাজ ধর্মপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ধর্মপালের সেনাপতি কর্ণসেনের ছয় ছেলে এই যুদ্ধে মারা পড়ে। গৌড়েশ্বরের শ্যালিকা রঞ্জাবতীর সঙ্গে এর পর কর্ণসেনের বিবাহ হয় এবং লাউসেন নামে তাঁর এক পুত্র জন্মায়। লাউসেনের জন্ম ধর্মঠাকুরের বরে, এই ধর্মই তাঁর চালক ও রক্ষক। গৌড়-রাজের প্রধান সামন্ত মাহুদা বা মহামদ অনেক ষড়যন্ত্র ফাঁদেন লাউসেনের বিরুদ্ধে, কিন্তু ধর্মের কৃপায় তিনি সব ব্যর্থ করেন। এমন কি পশ্চিম দিকে সূর্য পর্যন্ত তিনি উঠিয়ে ছাড়লেন। অবশেষে ইছাই ঘোষ যুদ্ধে নিহত হলেন তাঁর হাতে এবং লাউসেন বীর চূড়ামণি বলে কীর্তিত হলেন।

মঙ্গলকাব্যসুলভ নিয়তিবাদের আতিশয্য এবং দেবতার বিচার-বিমূঢ় অনুগ্রহ-বর্ষণের অংশটুকু বাদ দিলে, ধর্মমঙ্গল কাব্যের বিষয়বস্তু বেশ জম-জমাট, স্থানে স্থানে নাটকীয়ও। তাছাড়া এই একমাত্র মধ্যযুগীয় বাংলা কাব্য, যাতে শৌর্য ও পৌরুষের বেশ একটু শোনা যায়। কিছুটা যুদ্ধ-বিগ্রহ ও রাজনৈতিক কূট-চক্রান্তের চিত্রও আছে ইতস্তত। অবশ্য সব কিছুকে পরিব্যাপ্ত করে আছেন এক ধর্মঠাকুর, যিনি সর্বশক্তিমান হলেও সর্বজীবে সমদর্শী নন।

তাছাড়া মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গলের রচনায় যে সাবলীলতা দেখা যায়, ধর্মমঙ্গলে তার অভাব। তাই এই বীরগাথা একটানা পড়তে শেষ পর্যন্ত ক্লান্তি আসে। যেমন এর বিরস ভাষা, তেমনি একঘেয়ে রচনাভঙ্গি।

অল্প একটু নিদর্শন দেওয়া গেল,

মার মার বলি ডাক ছাড়েন ভবানী।
সেনাগণ দানাগণ সমরে নিদারুণ
দু-দলে করে হানাহানি॥
রঙ্গিনী রণজয়ী দুন্দুভি বাজই
ঘন ঘোর বাজাইয়া দামা।
রাজপুত মজবুত যৈছন যমদূত
সমযুথ যুঝে খানসামা॥

শিবায়ণ: রামেশ্বর

বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ ও মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল থেকে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল পর্যন্ত, অধিকাংশ মঙ্গলেই কোন-না-কোন আকারে শিবকাহিনী স্থান পেয়েছে। আদ্যোপান্ত শিবকাহিনী নিয়েও অনেকগুলি মঙ্গল লেখা হয়েছে। এই সব মঙ্গলের মধ্যে রামেশ্বর চক্রবর্তীর (ভট্টাচার্যের?) শিব-সঙ্কীর্তন সব চেয়ে জনপ্রিয়। এই শিবসঙ্কীর্তনই শিবমঙ্গল বা শিবায়ন নামে উল্লিখিত হয়।

রামেশ্বর মেদিনীপুর বরদাবাটী পরগনার অন্তর্গত যদুপুর গ্রামের অধিবাসী। ঐ জেলারই কর্ণগড়ের ভূম্যধিকারী যশোমন্ত সিংহের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে ১৭১০ খৃষ্টাব্দে তিনি শিবায়ণ লেখেন। তাঁর আগে (১৬৭৪) মৃগলুব্ধ বা ব্যাধের শিবানুগ্রহ লাভ নিয়ে রতিদেব কাব্য লিখেছিলেন। রামেশ্বরের লেখায় তাঁর পদাঙ্ক-অনুসরণের স্পষ্ট প্রয়াস দেখা যায়।

শুধু রামেশ্বর নন, মঙ্গল-কবিরা সবাই শিবকে ভিখারী, শ্মশানচারী, আধ-পাগলা নেশাখোর-রূপে চিত্রিত করেছেন। তাঁর পরনে বাঘছাল, গলায় হাড়ের মালা, বৃষ তাঁর বাহন, ভূত-প্রেত তাঁর সঙ্গী। এ হেন বাউণ্ডুলে মানুষের আবার ঘর-সংসার আছে, ছেলে-মেয়ে আছে। সহধর্মিণী পার্বতীর তাই দুঃখ ও দুর্গতির আর অন্ত নেই। ধনী ঘরের আদরিণী কন্যা পার্বতী, ভাগ্যদোষে তাঁর লাভ হয়েছে নিরন্ন বৃদ্ধ পতি। দিনরাত্রি স্বামী-স্ত্রীতে তাই

কলহ লেগেই আছে। সংসার-জ্বালায় উত্যক্ত হয়ে বিজয় গুপ্তের পার্বতী বলছেন,

চড়ে বেড়ায় দুষ্ট বলদ তারে খাউক বাঘে॥
লাগুক আগুন কান্ধের ঝুলি ত্রিশূল লউক চোরে।
গলার সাপ গরুড়ে খাউক যেমন ভাঁড়াইল মো'রে।

কিংবা পদ্মার বিবাহ উপলক্ষে,

হাসি বলে চণ্ডী আই তোমার মুখে লজ্জা নাই,
কোন সজ্জা আছে তোমার ঘরে।
এয়ো এসে মঙ্গল গাইতে চাইবে তারা পান খাইতে,
আর চাইবে তৈলে সিন্দুরে॥
হাসি কয় শূলপাণি এয়ো ভাণ্ডাইতে জানি,
মধ্যে দাঁড়াব ল্যাংটা হয়ে॥

রামেশ্বর এই দারিদ্র্যপীড়িত শিব-সংসারের কাহিনীই সবিস্তারে পরিবেশন করেছেন। পেটের দায়ে শিব গেছেন চাষ করতে। সবাই উপদেশ দিয়েছে তাঁকে,

আমার বচন ধর গোঁসাই তুমি কর চাষ।
কোন দিন বা অন্ন জোটে কখন উপবাস॥

কিন্তু অন্ন-বস্ত্রের অভাব হলে কি হবে? কুবুদ্ধির ত অন্ত নেই তাঁর। রাগ করে পার্বতী তাই পিতৃ-ভবনে চলে গেলেন শেষ পর্যন্ত।

দণ্ডবৎ হইয়া দেবের দুটি পায়।
কান্ত সনে ক্রোধ করি কাত্যায়নী যায়॥
কোলে করি কার্তিকেরে হস্তে গজানন।
চঞ্চল চরণে হইল চণ্ডীর গমন॥

শাঁখারী-বেশে শিব তখন শ্বশুরালয়ে গেলেন তাঁকে খুশী করে ফিরিয়ে আনতে। তাঁকে দেখেই পার্বতী চিনতে পারলেন এবং সেখানেই হল দাম্পত্য-কলহের অবসান।

বলা বাহুল্য শিব-দুর্গার কাহিনীর আড়ালে কবি এখানে তদানীন্তন কোন শিবদাস ভট্টাচার্য ও তাঁর সহধর্মিণী অন্নপূর্ণা ভট্টাচার্যের গল্পই বলেছেন এবং তখনকার চাষী-জীবন, পল্লীসমাজ ও অন্নকষ্টের চিত্রই গল্পে এই সজীবতা সৃষ্টি

করেছে। মাঝে মাঝে গার্হস্থ্য জীবনের দু-একটি আনন্দময় মুহূর্তের ছবিও আছে,

তিন ব্যক্তি ভোক্তা একা অন্ন দেন সতী।
দুই সুতে সপ্ত মুখ পঞ্চমুখ পতি॥
তিন জনে একুনে বদন হল বার।
গুটি গুটি দুটি হাতে যত দিতে পার॥

আসলে শিব আর্যেতর জাতিদের দেবতা। আর্য-অনার্য মিশ্রণের পর তিনি দেবাদিদেব মহাদেবে পরিণত হয়েছেন। কিন্তু বাঙালীর কবি-কল্পনায় তিনি সেই আদিরূপেই চিরদিন অমর থেকে গেছেন। নাথযোগী ও ধর্মোপাসক থেকে মঙ্গল-কবি পর্যন্ত, সবাই তাই শিবকে গ্রাম্য চাষী-গৃহস্থ রূপে চিত্রিত করেছেন এবং তাঁকে নিয়ে প্রচুর হাসি-কৌতুক করেছেন। বলা দরকার যে, মাঝে মাঝে রুচির সীমা ছাড়িয়ে গেলেও, এই আলাভোলা আধ-পাগল ঠাকুরটির চরিত্রে ভালো লাগার জিনিস কম নেই।

অন্নদামঙ্গল : ভারতচন্দ্র

মঙ্গলকাব্য-রচয়িতাদের মধ্যে সব চেয়ে জনপ্রিয় এবং অনেক দিক থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ কবি হলেন ভারতচন্দ্র। ছন্দচাতুর্যে যেমন, কাহিনী ও চরিত্রের ব্যবস্থাপনায় তেমনি তাঁর অসামান্যতা লক্ষ্য করবার মতো। যদিও রুচির প্রশ্নে আধুনিক পাঠকের রসনায় বিস্বাদ লাগার মতো জিনিস তাঁর রচনায় আছে, তবু প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের বিচারে ওটা বড় করে দেখলে চলবে না।

১৭১২ খৃষ্টাব্দে ভারতচন্দ্র রায় বর্ধমান জেলার পেঁড়ো বসন্তপুর গ্রামে জন্মান। তাঁর পিতৃপুরুষরা সম্ভ্রান্ত জমিদার বংশ ছিলেন। বর্ধমান রাজ-পরিবারের কোপে তাঁদের সর্বস্ব যায় এবং ভারতচন্দ্র কৈশোরে মাতুলালয়ে মানুষ হন। হুগলী দেবানন্দপুরে কিছু কাল বসবাস করার পর তিনি পরিব্রাজক রূপে নানা তীর্থস্থান ভ্রমণ করেন এবং শেষ পর্যন্ত নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি রূপে অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেন।

তাঁর বিখ্যাত বই অন্নদামঙ্গল লেখা হয় ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে। অন্নদামঙ্গল তিন খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে অন্নদার ভবানন্দ-ভবনে যাত্রা, হরিহোড়ের দুর্গোৎসব ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডে আছে মানসিংহের বাংলা-অভিযানের কাহিনী, প্রতাপাদিত্য-মানসিংহের যুদ্ধ এবং মানসিংহ-ভবানন্দ-

মৈত্রীর বিবরণ স্থান পেয়েছে এই খণ্ডে। তৃতীয় খণ্ড বিদ্যাসুন্দর, যাতে কৃষ্ণনগর-রাজকুমার সুন্দর ও বর্ধমান-রাজকুমারী বিদ্যার কাহিনী স্থান পেয়েছে।

এর ভেতর প্রথম খণ্ডই প্রকৃত অন্নদামঙ্গল এবং অন্নদা বা দুর্গা এই খণ্ডে মানবীরূপে আবির্ভূতা হয়ে নানা বিচিত্র লীলা দেখিয়েছেন। অন্নপূর্ণা ও ঈশ্বরী পাটনীর কাহিনী, অন্নপূর্ণার জরতী-বেশ ধারণ এবং অন্যান্য উপাখ্যান অনেকেরই সুবিদিত। সমস্ত মঙ্গলের প্রথা-মতো এরও প্রথমাংশে হর-পার্বতীর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে এবং ভারতচন্দ্রের শিবও নেশাখোর, ভিখারি, আধ-পাগল। তবে দক্ষ-যজ্ঞের বর্ণনাপ্রসঙ্গে হঠাৎ ভারতের শিব পুরাণ-বর্ণিত রুদ্র দেবতার মূর্তি ধরেছেন,

মহাকাল রূপে মহাদেব সাজে
ভভম্ভম ভভম্ভম শিঙ্গা ঘোর বাজে।
লটাপট জটাজূট সংঘট্ট গঙ্গা।
ছলচ্ছল টলট্টল কলক্কল তরঙ্গা
ফণাফণ ফণাফণ ফণী ফন্ন গাজে
দিনেশ প্রতাপে নিশানাথ সাজে

অন্নদামঙ্গলে ভারতচন্দ্র নানা সংস্কৃত ছন্দকে বাংলায় রূপ দিয়েছেন। যেমন,

দ্বিজ ভারত তোটক ছন্দে ভণে।
কবিরাজ কহে শুন গৌড়জনে

অথবা,

ভুজঙ্গপ্রয়াতে কহে ভারতী দে।
আরে রে দক্ষ সতী দে সতী দে

সুললিত লঘু ছন্দেও তাঁর লেখনী সমান দক্ষ। যেমন,

কল কোকিল অলিকুল বকুল ফুলে।
বসিলা অন্নপূর্ণা মণি দেউলে॥
কমল পরিমল লয়ে শীতল জল,
পবন ঢল ঢল উছলে কূলে।
বসন্ত রাজা আনি ছয় রাগিণী রাণী
পাতিল রাজধানী অশোকমূলে॥

কিন্তু এক কালে ভারতচন্দ্রের আসল প্রতিষ্ঠা নির্ভর করত তাঁর বিদ্যা-সুন্দরের ওপর। এই কাব্যে হীরা মালিনী ও বর্ধমান রাজমহিষীর নিপুণ চরিত্র-চিত্রণ মুকুন্দরামের চরিত্রগুলি মনে করিয়ে দেয়। তখনকার নাগরিক জীবনের বিলাসব্যসন, চটুলতা, পঙ্কিলতা, সবই কবি অদ্ভুত এক-একটি তুলির টানে জীবন্ত করে তুলেছেন। কিন্তু সমগ্র কাহিনীর ভিত্তিমূলে আছে যে নোংরামি, সর্বশেষের কালী-মাহাত্ম্যেও তা ঢাকা পড়েনি। এই কাব্য তাই আজকের পাঠকের প্রীতি লাভ করতে পারে না। তবে বিচ্ছিন্ন অংশ এ থেকে অনেক উদ্ধৃত করা যায়, যা হীরের টুকরোর মতো। যেমন,

আর জন কয় এই মহাশয়
চাঁপা ফুলময় খোঁপায় রাখি।
হলুদি জিনিয়া তনু চিকনিয়া
স্নেহেতে ছানিয়া হৃদয়ে মাখি॥

বিদ্যাসুন্দর কবিরঞ্জন রামপ্রসাদও লিখেছিলেন, যা আরো গ্রাম্যতাদুষ্ট এবং কুরুচিপূর্ণ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

লোকসাহিত্য

মঙ্গল-কবিরা যখন অর্ধ-পৌরাণিক ও লৌকিক দেব-দেবীর মহিমা প্রচারের মাধ্যমরূপে মানুষকে সাহিত্যে রূপ দিচ্ছিলেন, বাংলার প্রত্যন্ত সীমায় আরাকানে বসে তখনি দুই মুসলমান কবি নিছক মানুষের কাহিনী নিয়ে কাব্য রচনা করছিলেন, এটা লক্ষ্য করার মতো। বোধ হয় তাঁরা হিন্দু ছিলেন না বলেই, দশম থেকে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত যে বাংলা সাহিত্যিক ঐতিহ্য হিন্দু লেখকদের হাত দিয়ে গড়ে ওঠে, তার প্রভাব থেকে মুক্ত ছিলেন। যে জন্যেই হক, সপ্তদশ শতাব্দীর দৌলৎ কাজি ও আলাওল বাংলা ভাষার দুই অসামান্য কবি। লয়লা মজনু, শিরীন ফরহাদ প্রভৃতি ইসলামী কিস্‌সা-কাহিনীর প্রভাবেই সম্ভবত তাঁরা এই সব কাব্যকাহিনী রচনা করেন।

পূর্ববাংলার বিভিন্ন জেলায় অনামা লেখকরাও অনেকে এই রকম লোক-গাথা রচনা করেছিলেন, যার কিছু অংশ চন্দ্রকুমার দে ও দীনেশচন্দ্র সেন কর্তৃক সংগৃহীত হয়ে ময়মনসিংহ-গীতিকা নামে প্রকাশিত হয়েছে। এগুলির মধ্যে সংস্কারমুক্ত সহজ মনুষ্যত্বের রূপটি আরো উজ্জ্বল। গল্পের গাঁথুনি ও চরিত্রের বাস্তবতায় এগুলি খুব আধুনিক মনে হয়, যদিও সংগ্রাহকরা এগুলিকে ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর রচনা বলে প্রচার করেছেন। অনেকের ধারণা পশ্চিম বাংলার কোন কোন জেলাতেও এই রকম লোককাহিনী আছে।

বাংলার নানা অঞ্চলে প্রচলিত বহু বিচিত্র ছড়াগুলিও লোকসাহিত্যের নিদর্শন হিসাবে সমান অনুসন্ধান ও অনুশীলনের যোগ্য। পল্লীর মা-দিদিমাদের মুখে মুখে, চাষী-কারিগরদের মুখে মুখে যুগের পর যুগ এরা ভেসে চলেছে। এই তিন পর্যায়ের সাহিত্য নিয়েই আলোচনা করা যাচ্ছে এবার।

দৌলৎ কাজী ও আলাওল

ত্রয়োদশ শতাব্দীর সুরু থেকে বাংলা দেশে মুসলমান সমাজের প্রতিষ্ঠা হয়েছে এবং হুসেন শাহ, নসরৎ শাহ, পরাগল খান, ছুটি খান প্রমুখ সুলতানরা

অনেকেই বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ও বাঙালী লেখকদের সহায়ক ছিলেন। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর আগে বাংলা ভাষায় উল্লেখযোগ্য মুসলমান কবি বা সাহিত্যিকের উদ্ভব হয় নি।

প্রথম উল্লেখযোগ্য কবি হলেন দৌলৎ কাজী, তারপর সৈয়দ আলাওল। দু-জনেই এঁরা আরাকান-রাজ সুধর্মার সভায় ছিলেন। রাজার লস্কর-উজির আসরাফ খানের আদেশে কবি দৌলৎ কাজী 'সতী ময়নাবতী বা লোর চন্দ্রানী' কাব্য লেখেন ১৬২২-৩৮ খৃঃ অব্দের মধ্যে। এই কাব্য অসমাপ্ত রেখেই মারা যান তিনি, কবি আলাওল রাজমন্ত্রী মাগন ঠাকুরের আদেশে সমাপ্ত করেন তা।

আলাওল ফরিদপুর জেলায় জন্মান। পর্তুগীজ জলদস্যুরা তাঁকে বাল্যেই হরণ করে নিয়ে যায় ও আরাকান-রাজদরবারে বিক্রী করে দেয়। এখানে তিনি মহম্মদ মাগন ঠাকুরের প্রিয়পাত্র হন এবং তাঁর আদেশেই তাঁর বিখ্যাত পদ্মাবৎ বা পদ্মাবতী বই লেখেন (১৬৫১)। সম্রাট শাহজাহানের পুত্র সুজা যখন পালিয়ে আরাকানে আশ্রয় নেন, আলাওলের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়। তারপর আওরঙজেবের চক্রান্তে সুজা নিহত হলে, ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অপরাধে আলাওলেরও কারাবাস হয়। পরে সেখান থেকে তিনি ছাড়া পান এবং আরাকান ত্যাগ করে চলে যান। একান্ত রোমাঞ্চকর জীবন তাঁর।

দৌলৎ কাজীর সতী ময়না একটি সুন্দর উপাখ্যান-কাব্য। এর ভেতর কোন অলৌকিক ঘটনা নেই, কোন দেব দেবীর হস্তক্ষেপ নেই। সামাজিক মানুষের সুখ-দুঃখ ও আশা-আকাঙ্ক্ষার কাহিনীই কবি বিবৃত করেছেন। ঠেট হিন্দী থেকে এই কাহিনীর মূল সংগৃহীত। কাহিনী সংক্ষেপে এই : লোর দেশের রাজা সাধ্বী পত্নী ময়নাবতীকে ত্যাগ করে গোহারী রাজকন্যা চন্দ্রানীকে বিবাহ করেন। বিনা দোষে পরিত্যক্তা সতী ময়নাবতীর দুঃখের অন্ত নেই। নানা দুষ্ট দুর্বৃত্ত তাঁকে উত্যক্ত করে। অবশেষে তাঁর মহত্ত্ব এবং সতীত্বই তাঁর অনুতপ্ত স্বামীকে ঘরে ফিরিয়ে আনল। অবশ্য সঙ্গে এলেন সপত্নী চন্দ্রানী, যাঁকে ময়নাবতী প্রীতির সঙ্গেই গ্রহণ করলেন।

দৌলৎ কাজীর রচনার নিদর্শন,

শ্রাবণ মাসেতে ময়না বড় সুখ লাগে।
রিমি ঝিমি বরিখে মনে ভাব জাগে॥
ধরতি বহয় ধারা রাত্রি আঁধিয়ারি।
খেলয় বঁধুর সঙে সোহাগ ধামারি॥

আলাওলের পদ্মাবৎ হল চিতোরের রাণী পদ্মিনীর কাহিনী। মহম্মদ জায়সী-রচিত হিন্দী কাব্য থেকে এর বিষয়বস্তু গৃহীত, যদিও কবি যথেষ্ট স্বাধীন কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন পদে পদে। রাঘব নামে এক ব্রাহ্মণ রাণীর হাতের কাঁকন কোন রকমে লাভ করে খিলজী সুলতানকে তা এনে দেয় এবং বলে, পদ্মিনী আপনাকে স্বামিত্বে বরণ করবেন। এর পর হয় চিতোর আক্রমণ এবং আত্মরক্ষার্থে পদ্মিনী জহর-ব্রতের অনুষ্ঠান করেন।

আলাওলের রচনা অতি পরিচ্ছন্ন ও মাধুর্যগুণসম্পন্ন। বাহুল্য নেই, কুরুচি নেই, ভাষাও আগাগোড়া স্বচ্ছ। যেমন,

সরোবরে আসিয়া পদ্মিনী উপস্থিত।
খোঁপা খসাইয়া কেশ কৈল মুকলিত
সুগন্ধ শ্যামল ভার ধরা ছুঁইল।
চন্দ্রের ভক্ষে যেন নাগিনী বেড়িল॥

জাতিধর্ম নির্বিশেষে সব মানুষের যিনি স্রষ্টা, সেই ঈশ্বরের বন্দনা করেছেন তিনি কাব্যের প্রারম্ভে,

প্রথমে প্রণাম করি এক করতার
যেই প্রভু জীব দানে স্থাপিল সংসার

ময়মনসিংহ-গীতিকা

[illegible] প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের [illegible] কাব্য দুটি যেমন বিস্ময়কর, তেমনি [illegible] ময়মনসিংহ-গীতিকা। গীতিকাগুলিও দেশী-আনাড়ি [illegible]। [illegible] নেই। এমন কি হিন্দু-মুসলমানের বা উঁচু-নীচুর ভেদও মানেন নি কবিরা।

তারপর এদের রচনাপদ্ধতিও আশ্চর্য রকম। মঙ্গলকাব্য হক, বৈষ্ণব কাব্য হক, সর্বত্র কবিরা পুরানো অলঙ্কারশাস্ত্রের বাঁধা ছক অনুসরণ করেছেন। সেই তিলফুল জিনি নাসা, আর সেই খঞ্জন আঁখি ঘুরে ঘুরে আসে নানা কবির হাত দিয়ে। গীতিকার কবিরা কিন্তু উপমা ও অলঙ্কারের ব্যবহারে আগাগোড়া মৌলিক। তাঁদের ভাষা যেমন সরল, ভঙ্গি তেমনি অনাড়ম্বর। যে কথাটি প্রথম আবেগেই মনে আসে, ঠিক সেই কথাটির প্রয়োগ, যে ছন্দটি যেখানে মানায়, সেটি ঠিক সেখানে নির্বাচন, কবিদের অদ্ভুত

কৃতিত্বের নিদর্শন। মঙ্গলকাব্যের কবিরা পয়ার আর ত্রিপদীর চড়াই উৎরাতে গিয়ে মুহুর্মুহু চিৎ হয়ে পড়েছেন, ময়মনসিংহ-গীতিকার কবিরা কিন্তু শ্লোকের পর শ্লোক দুনো মিল দিয়ে গেঁথে গেছেন, কোথাও হোঁচট খাবার বা হেঁচড়ে চলার চিহ্ন নেই। বরং স্থানে স্থানে এমন অনেক অংশ আছে, প্রকাশভঙ্গিতে যা আধুনিক কাব্য-ভাষার খুব কাছাকাছি।

এই দুই কারণে সন্দেহ জাগে গীতিকার গল্পগুলি পুরাতন, কিছু কিছু অংশও পুরাতন, কিন্তু তাকে ঘষে-মেজে যথাসম্ভব প্রাচীন সাজে সাজিয়ে এ কালেই লেখা হয়েছে, এ কালের অনুযায়ী ব্যঞ্জনা দিয়ে।

কোড়া পাখী শিকার করতে এসে বিদেশী শিকারী জলাশয়ের ধারে ঘুমিয়ে পড়েছে, জল নিতে এসে তন্বী কিশোরী তার রূপে মুগ্ধ হয়েছে। বেদের মেয়ে বাঁশবাজি দেখাতে এসেছে, তার অনুপম দেহভঙ্গি ও বিপজ্জনক ক্রীড়া-কৌশল যুবক ব্রাহ্মণ কুমারকে সহানুভূতিতে আর্দ্র করেছে। অনুরাগের এমন সহজ লীলা ও তার স্বীকৃতি প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে আর কোথাও নেই। এমন নিখুঁতভাবে মানব-মনের স্বধর্ম উপলব্ধি করার পরিচয় মঙ্গলকাব্যে ত দূরের কথা, বৈষ্ণব কাব্যেও নেই। মানুষের সামাজিক মনই সেখানে নেই, তার পরিবেশই অপ্রাকৃত।

ময়মনসিংহ-গীতিকার যে কোন কাহিনী, সে মহুয়া হক, মলুয়া হক, চন্দ্রাবতী বা কঙ্ক-লীলা হক, সব জায়গায় জীবনকে সাদা চোখে দেখা ও প্রকাশ করার একটা আশ্চর্য সহজতা মিলবে। যেমন,

চান্দ সুরজ ডুবুক আমার সংসারে কাজ নাই।
জ্ঞাতি বন্ধু জনে আমি আর ত নাহি চাই॥
তুমি যদি ডুব কন্যা আমায় সঙ্গে নাও।
একটি বার মুখে চাইয়া প্রাণের বেদন কও॥
ঘরে তুইল্যা লইব আমার সংসারে কাজ নাই।
জলে না ডুবিও কন্যা ধর্মের দোহাই॥

দুর্বৃত্তের হাতে লাঞ্ছিতা সতী স্ত্রীর আত্ম-বিনাশনের মুখে অক্ষম স্বামীর এই আকুল ক্রন্দনের মতো সহজ কাব্য বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ। বেহুলা কলার মান্দাসে ভাসার সময়, সনকা এবং বেহুলার ভাইয়েরা তাকে নিরস্ত করতে এসে যা বলেছিলেন, তার তুলনায় এটুকু অনেক বেশী উজ্জ্বল নয় কি?

দুর্বৃত্তের কবলে পড়ে কুলবতী নারী বলছে,

গাঙের পারের হিজল গাছ ফুট্যা রইছ ডালে।
দুঃখের কথা কইও মোর বন্ধুর নাগাল পাইলে॥
সাক্ষী হইও নদী-নালা আর পশু পংখী।
অভাগী সুনাইয়ে দিল কাল বিধাতা ফাঁকি॥
সত্য যুগের বায়ু সাক্ষী আর ত সাক্ষী নাই।
বন্ধুরে কইও তোমার মরেছে সুনাই॥

রাবণের রথে আবদ্ধ সীতার আর্তনাদ এর কাছে কত কৃত্রিম মনে হয়! বলা বাহুল্য, কৃত্তিবাসের সীতার কথা বলছি।

সর্বত্র এই সহজ স্বচ্ছতার গুণেই গীতিকা এত বড় সাহিত্য হতে পেরেছে। জীবন-বোধের সার্থকতায় এর প্রত্যেকটি নরনারী যেমন বাস্তব, মনস্তত্ত্বজ্ঞানের পরিপাটিতায় প্রত্যেকটি কাহিনী তেমনি সজীব। এর তুলনা ফরাসী ক্রবাদুর কাব্যে এবং স্কচ ব্যালাডে আছে।

এখন প্রশ্ন আসে, এ জীবন কাদের? এ দেশের পারিবারিক পরিবেশে স্বাধীন ভালোবাসা কোন দিন প্রশ্রয় পায নি, তাই পরকীয়াবাদকে এদেশে ধর্ম বলে চালাতে হয়েছে। তাই বিদ্যাসুন্দরকেও শেষ পর্যন্ত কালী-মাহাত্ম্য দিয়ে বাঁচাতে হয়েছে। এই দেশে বর্ণাশ্রমবিরুদ্ধ প্রেম এবং তার জন্যে সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ···এ সত্যই অদ্ভুত। আর এ থেকেই সন্দেহ জাগে গীতিকার প্রাচানতা নিয়ে।

ছড়া

ময়মনসিংহ-গীতিকাগুলি বাঙালী বিদগ্ধ সমাজের বাইরে নিরক্ষর গ্রামবাসীদের হাতে রচিত হয়েছিল বলে দাবী করা হয়েছে। বাংলা ছড়ার যে সুবিস্তৃত পর্যায়টি আজো অলিখিত এবং অসংগৃহীত অবস্থায় পল্লীর নরনারীর মুখে মুখে বেঁচে আছে, তারও জন্ম নিরক্ষর সমাজেই। কত জাতের যে ছড়া আছে, তা বলে শেষ করা যায় না। মেয়েলী বার-ব্রতের ছড়া, কৃষিকার্য, পারিবারিক কর্তব্য, খাদ্য, পরিধেয়, মানব-প্রকৃতির বিচিত্রতা, নানা বিষয় নিয়ে তৈরী রাশি রাশি ছড়া বাংলার বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে আছে! সেগুলির ভেতর দিয়ে যেমন সমাজ-জীবনের বহু অনাবিষ্কৃত দিকের সঙ্গে পরিচয় হয়, তেমনি বহু সুসম্বদ্ধ ও নিত্য ব্যবহার্য phrase, idiom ও epigram-এর

সঙ্গে মুখোমুখি হওয়া যায়। আর প্রয়াসহীন পাণ্ডিত্যহীন সহজ কবিত্বের সাক্ষাৎ ত পাওয়া যায়ই প্রচুর। বাংলা শব্দতত্ত্ব ও ছন্দ-বিজ্ঞানের ইতিহাসের অনেকগুলো দিকের ওপর ছড়া সত্যই নূতন আলোকপাত করে। কিন্তু এসব সংগৃহীত ও সম্পাদিত করে হবে এবং কে করবেন, সে-ই হল সমস্যা।

সারা দেশে ছড়ান ছেলে-ভুলান ছড়া, বার-বতের ছড়া, রূপকথা, হেঁয়ালি, প্রবাদ-প্রবচন ইত্যাদি সযত্নে সংগৃহীত হলে দেখা যাবে, ছড়া আমাদের সাহিত্যের ঐশ্বর্য। ভাষার দিক থেকেই হক, আর ভঙ্গির দিক থেকেই হক, এ সাহিত্যে ধার-করা জিনিস নেই বললেই চলে। 'রাঙা মুখে রোদ লেগেছে ডালিম ফেটে পড়ে,' 'কুঁচবরণ রাজকন্যার মেঘের বরণ চুল,' 'তারা পাই-বলদে চষে, তারা হীরের দাঁত ঘষে'—এই রকম রাশি রাশি উজ্জ্বল পংক্তি এই ছড়া-সাহিত্যের মধ্যে অতি অনায়াসে মণি-মুক্তার মতো ছড়াছড়ি হয়ে আছে। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারে এ জিনিসের সাক্ষাৎ মেলে একমাত্র ময়মনসিংহ-গীতিকায়। কথাটা বোঝা যাবে যে-কোন দুটো লাইন হাতে নিলেই। যথা,

আম কাঁঠালের বাগান তার ছায়ায় ছায়ায় যেতে।
উড়কি ধানের মুড়কি দেব পথে জলপান খেতে।

সপ্তম অধ্যায়

গীত সাহিত্য

মঙ্গলকাব্য ও বৈষ্ণব কাব্যের যুগ শেষ হতে, বাংলায় দেখা দিল গানের যুগ। এক হিসাবে বাংলার সমস্ত প্রাচীন সাহিত্যটাই গানে সীমাবদ্ধ। বৈষ্ণব পদাবলী ত বটেই, রামায়ণ, মহাভারত এবং মঙ্গলকাব্যগুলিও আসরে গাওয়া হত। সেদিক থেকে এই যুগ-বিবর্তনে নূতনত্ব কিছু নেই। কিন্তু নূতনত্ব আছে অন্য দিক থেকে। এখান থেকেই বাংলা সাহিত্যে বৈচিত্র্যের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। শ্যামাসঙ্গীত, উমাসঙ্গীত, বাউল সঙ্গীত, লৌকিক প্রেমসঙ্গীত, নানা নূতন নূতন পথে পরীক্ষা সুরু হল, যা কৃষ্ণচন্দ্রের যুগ থেকে একেবারে ঈশ্বর গুপ্তের আমল পর্যন্ত অব্যাহত ধারায় বয়ে এসেছে।

মঙ্গলকাব্যগুলির ভেতর চণ্ডী, মনসা, শীতলা, নানা মাতৃ-দেবতার সাক্ষাৎ মেলে। কিন্তু কালিকার আংশিক সাক্ষাৎ এক বিদ্যাসুন্দর ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যায় না। রামপ্রসাদেই প্রথম কালীর আবির্ভাব এবং সে একেবারে দৈবমহিমা-বর্জিত বাস্তবী মায়ের রূপে। দাশরথি ও কমলাকান্ত এ বিষয়ে করেছেন তাঁর অনুগমন। বৈষ্ণব বাৎসল্য সঙ্গীত আগেই রচিত হয়েছিল, শাক্ত বাৎসল্য সঙ্গীত রচিত হল এই সময়। এরও সূচনা রামপ্রসাদে, কিন্তু দাশু রায় ও ব্রজ রায় প্রমুখের হাতে এই শাখার পুষ্টি হয়। শাক্ত-অভ্যুদয়ে বৈষ্ণব গীতি সাময়িকভাবে চাপা পড়লেও, কৃষ্ণকমল, হরু ঠাকুর, বদন অধিকারী, নীলকণ্ঠ প্রভৃতির হাত দিয়ে তা-ও আবার নূতন করে মাথা তুলল।

এছাড়া এল লৌকিক সঙ্গীত। উর্দু টপ্পা থেকে নিধুবাবু তা বাংলায় আমদানি করেন। শ্রীধর কথক, কালী মির্জা, রাম বসু এ বিষয়ে ছিলেন তাঁর সহকারী। বাউল গানের জন্মও এই সময়েই কিনা বলা কঠিন। কারণ বৌদ্ধ প্রভাবের যুগ থেকেই একটা ধর্ম সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল, যা বাউল নামে খ্যাত। এঁদের সাহিত্যিক ঐতিহ্য পুরানো হবারই কথা। কিন্তু ছাপার অক্ষরে যে বাউল গান আমরা পাই, তা খুব অর্বাচীন। এমন কি যে সময়ের কথা বলছি, তারও পরবর্তী হওয়া সম্ভব।

শ্যামাসঙ্গীত ঃ রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত

প্রায় তিনশো বৎসর বৈষ্ণব প্রেমসঙ্গীতের একাধিপত্য চলার পর বাংলা সাহিত্যে শ্যামাসঙ্গীত দেখা দিল।

তান্ত্রিক পূজা-পদ্ধতি এদেশে খুব প্রাচীন। ঘরে ঘরে কালীপূজার ধুম ছিল। শ্মশানকালী, রক্ষাকালী, ডাকাতে কালী, রকমারি কালী বাঙালীর কাছে পূজা পেয়েছেন। ধূপধুনো, ঢাকের বাদ্য ও পাঁঠার রক্তে নিত্য তাঁর মহিমা ঘোষিত হয়েছে। কিন্তু দেশের সাহিত্যে তাঁর সন্ধান মেলে না। সব দেবতার নামে মঙ্গল আছে, ব্যাঘ্র দেবতা দক্ষিণ রায়ও বাদ পড়েন নি, কিন্তু কালীর ভাগ্যে কোন মঙ্গল লাভ হয় নি। মাতৃদেবতার মধ্যে চণ্ডী নানা স্থানে নানারূপে আবির্ভূতা হয়েছেন। কিন্তু কালীরূপে তাঁর অবতরণ বিদ্যাসুন্দরের আগে দেখা যায় নি। এর একটা কারণ হয়ত বৈষ্ণব মতের অতিপ্রচার, কিন্তু আসল কারণটা অজ্ঞাত।

খাঁটি শ্যামা সাহিত্যের প্রবর্তন করলেন রামপ্রসাদ এবং তাঁর হাতেই এর সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতা সাধিত হল। লিরিক কবি হিসাবে বিচার করতে বসলে, রামপ্রসাদের আজ অনেক ত্রুটি চোখে পড়বে। তাঁর ভাষা সৌষ্ঠববিহীন, বক্তব্য অলঙ্করণবর্জিত, তবু রামপ্রসাদ অতুলনীয় তাঁর অকপট আন্তরিকতার জন্যে। এই আন্তরিকতার আবেদন কদাচিৎ নরোত্তম প্রমুখ বৈষ্ণব মহাজনের লেখায় পাওয়া যায়। কিন্তু এ বিষয়ে রামপ্রসাদই শ্রেষ্ঠ। যেমন,

মা মা বলে আর ডাকব না।
ওমা, দিয়াছ দিতেছ কতই যন্ত্রণা॥
ছিলাম গৃহবাসী, করিলি সন্ন্যাসী,
আর কি ক্ষমতা রাখিস এলোকেশী,
ঘরে ঘরে যাব, ভিক্ষা মেগে খাব,
মা বলে আর কোলে যাবো না॥

এই যেমন হতাশামিশ্রিত অভিমানের সুর, তেমনি আত্মনির্ভরতাও দেখা যায়,

আমি কি দুখেরে ডরাই।
তবে দাও দুখ মা আর কত চাই॥

বিষের কৃমি বিষে থাকি মা,
বিষ খেয়ে প্রাণ রাখি সদাই।
আমি এমন বিষের কৃমি মাগো,
বিষের বোঝা বয়ে বেড়াই ॥
প্রসাদ বলে ব্রহ্মময়ী,
বোঝা নামাও ক্ষণেক জিরাই।
দেখো সুখ পেয়ে লোক গর্ব করে,
আমি করি দুখের বড়াই ॥

এই কখনো অভিমান, কখনো হতাশা, কখনো উল্লাস, কখনো অনুনয়… এ যেন আপন অন্তরঙ্গের সঙ্গে আন্তরিক বোঝা-পড়া। আপন প্রত্যয়ে অকপট না হলে, মানুষ কখনো এত সহজে নিজেকে তার মধ্যে ডুবিয়ে দিতে পারে না, ভেবে চিন্তে আক্ষরিক স্তব বা অষ্টক বা বন্দনা লেখে! প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে সে রকম লেখার পরিমাণ বড় কম নয়।

রামপ্রসাদের এই ধারা কমলাকান্তে এবং দাশরথিতেও কতক পরিমাণে বয়ে এসেছে। কমলাকান্তের রচনা ঐকান্তিকভাব এই উচ্চভূমি কদাচিৎ স্পর্শ করে। মাঝে মাঝে যখন তাঁর পাণ্ডিত্যের নকল আবরণটি খসে পড়ে, তখন তাঁর লেখনীও রামপ্রসাদের সহজ বেগ অর্জন করে। যেমন,

মজলো আমার মন-ভ্রমরা কালী-পদ-নীলকমলে।
বিষয়-মধু তুচ্ছ হল, কামাদি রিপুসকলে।

অনুপ্রাস বাতিকগ্রস্ত দাশুরায়ও এক-একবার এই স্তরে পৌঁছেছেন,

দোষ কারো গো নয় মা,
আমি স্ব-খাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা।

শ্যামাসঙ্গীতের এই করুণ মধুর সুরটি কিন্তু এইখানেই শেষ হয়ে যায়। পরবর্তী কালে আর তা শোনা যায় নি।

উমাসঙ্গীত ঃ দাশরথি রায়

শ্যামাসঙ্গীতের পাশাপাশি আর একটি শাখা সাহিত্যকে আস্তে আস্তে অধিকার করেছিল, তা হচ্ছে উমাসঙ্গীত। উমাসঙ্গীত বৈষ্ণব বাৎসল্য-সঙ্গীতের মতোই বাঙালীর আদরের সামগ্রী।

বৈষ্ণব কবিতায় যশোদার আদরের ধন গোপাল বনে যায় গরু চরাতে। বনে নানা বিপদের ভয়, কচি ছেলে গোপাল, তার ওপর দুরন্ত, কাজেই মায়ের প্রাণ নানা আশঙ্কায় ব্যাকুল। সারা দিনের অদর্শনে ব্যাকুলা হয়ে তাই তিনি ঘর-বার করেন। এই ক্ষণিক অদর্শন ও আশঙ্কার উত্তাপেই বেশির ভাগ কবিতার জন্ম।

গো-চারণে যাবার আগে যশোদা গোপালকে দিয়ে শপথ করিয়ে নিচ্ছেন,

মায়ের শপতি লাগে না ধাইও ধেনুর আগে
পরাণের প্রাণ নীলমণি।
নিকটে রাখিও ধেনু বাজাইও মোহন বেণু
ঘরে বসে আমি যেন শুনি।

* * *

তৃষা হলে চেও বারি বলাই ধরিবে ঝারি
নামিও না যেন যমুনায়।

স্নেহান্ধ মাতৃ-হৃদয়ের সকরুণ আশঙ্কা এর চেয়ে সুন্দর ভাবে আর প্রকাশ করা যেত কিনা সন্দেহ!

গোপালের দৌরাত্ম্যে বিব্রত জননীর স্নেহমিশ্রিত অনুযোগ প্রকাশ পেয়েছে যে দু-এক স্থানে, তা-ও কম উপভোগ্য নয়! যেমন,

মরি বাঁছা ছাড়ো রে বসন,
কলসী উলাইয়া তোমায় লইব এখন।
আমি রইলাম তোমায় লইয়া,
যায় যে ঘরে উনান বইয়া,
মোর হইবে কিসের উপায়।
কলসী লইয়া কাঁখে, ছাড়ো রে অভাগী মাকে,
হেরো দেখো ধবলী পিয়ায়॥

এখানে জননীর যে রূপ, তা কৃষ্ণ-জননী যশোদার রূপ নয়। সন্তানের যে রূপ, তা-ও গোলোকবিহারী হরির নয়। এ রূপ বাংলা মায়ের, বাঙালী ছেলের। যে হতভাগিনী পল্লী-জননী দূর গ্রামে কোলের শিশুটিকে পড়তে পাঠিয়ে, সারাদিন তার পথ চেয়ে বসে থাকেন, আর নানা অমূলক চিন্তায় আকুল হয়ে ছটফট করেন, এ তাঁরই অন্তরের রূপ। যে পল্লী-গৃহিণী

বিপুল কর্মভারবিব্রত সংসারে কোলে দামাল ছেলে নিয়ে বিব্রত হন, এ রূপ তাঁরই।

উমাসঙ্গীতের আবেদন আরো গূঢ়, কারণ তার অন্তর্লগ্ন বেদনা আরো প্রত্যক্ষ। ধনী পিতা-মাতার একমাত্র কন্যা গৌরী বৃদ্ধ বর শিবের হাতে পড়েছেন। দরিদ্র, তাতে অসংযত স্বভাব, অভাবের সংসারে অনেকগুলি কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে গৌরীর তাই দুঃখের শেষ নাই। মা মেনকা মেয়ের এই দুর্দশা ভেবে দিবারাত্র কাঁদেন। কখনো পাষাণ স্বামীকে এমন পাত্রে কন্যা সমর্পণ করার জন্যে দোষারোপ করেন। কখনো মেয়ের ওপর অভিমান করেন। কখনো বা স্বপ্নে তাঁর যোগিনী রূপ দেখে চমকে ওঠেন। স্বামীকে অনুরোধ করেন, কয়েক দিনের জন্যে মেয়েকে কাছে এনে দেবার জন্যে। মায়ের এই আশঙ্কা, বেদনা ও আকুলতার কান্না এদেশে আগমনী গান নামে বহুকাল থেকে চলে আসছে। পার্বতী আসেন, তিন দিন মাত্র থেকে আবার চলে যান। আবার সুরু হয় মায়ের কান্না। তার নাম এদেশে বিজয়া সঙ্গীত।

এই আগমনী ও বিজয়া সঙ্গীত যথাক্রমে দুর্গোৎসবের আগে ও পরে এখনো ভিক্ষুকদের মুখে শোনা যায়। কৌলীন্যপ্রথায় দেশের কত পার্বতীই এমনি ধারা অপাত্রে ন্যস্ত হয়ে অভাগিনী মায়ের কান্নার কারণ হয়েছে। কত অজানা অন্তঃপুরের অশ্রুধারা পুঞ্জিত হয়ে আছে এই সব সঙ্গীতে। অল্প আঘাতেই যে বাঙালী মা যশোদার মূর্তিতে আনাচে-কানাচে কেঁদে বেড়িয়েছেন, এতবড় ব্যথায় বুক তাঁর কতটাই না ভেঙেছে! সে ভাঙার সুর আছে এই গানগুলিতে।

উমাসঙ্গীত রামপ্রসাদ দিয়ে সুরু হলেও, এ বিষয়ে দাশু রায়েরই সর্বোৎকৃষ্ট রচনার নিদর্শন পাওয়া যায়। সাধারণত লোকের মুখে মুখে যে গানগুলি ফেরে তা সবই দাশুর রচনা। দাশুর প্রকৃত খ্যাতি এদেশে পাঁচালীর জন্যে। দুঃখের বিষয়, বেশির ভাগ পাঁচালীই তাঁর ভদ্রজনের পাতে দেবার মতো নয়। কিন্তু আগমনী ও বিজয়ার গানে দাশু রাজা।

রামপ্রসাদই অবশ্য প্রথম ধুয়াটা ধরিয়ে দিয়েছিলেন,

এবার আমার উমা এলে আর তারে পাঠাব না।
বলে মন্দ বলবে লোকে কারুর কথা শুনব না॥
কতই লোকে প্রচার করে, জামাই নাকি ভিক্ষে করে,
এবার মায়ে ঝিয়ে করব ঝগড়া জামাই বলে মানব না॥

দাশু এরই ওপর সুরের পর সুর চড়িয়েছেন। মা মেনকার বিরহব্যথার বিভিন্ন স্তর তাঁর গানে অপরূপ ভাষায় রূপ পেয়েছে। যথা,

গিরিরাজ কি করো গৃহে বসিয়ে।
সম্বৎসর গত হল উমারে আনো গিয়ে॥

কিংবা,

গিরি গৌরী আমার এসেছিল।
স্বপ্নে দেখা দিয়ে চৈতন্যরূপিণী
অচৈতন্য করে কোথায় লুকাল॥
কহিছে শিখরী কি করি অচল,
নাহি চলাচল হলাম হে অচল,
চঞ্চলার মতো জীবন চঞ্চল
অঞ্চলের নিধি পেয়ে হারাল॥
দেখা দিয়ে কেন হেন মায়া তার,
মায়ের প্রতি মায়া নেই মহামায়ার,
আবার ভাবি গিরি কি দোষ অভয়ার,
পিতৃদোষে মেয়ে পাষাণী হল॥

কমলাকান্ত, রসিক রায়, ব্রজ রায় প্রভৃতিরও অনেক উল্লেখযোগ্য গান আছে এই পর্যায়ে। তবে একটা কথা সত্যের অনুরোধে স্বীকার করতেই হবে যে, মঙ্গলকাব্যেই হক, আর বৈষ্ণব কাব্যেই হক, আর শ্যামাসঙ্গীত উমা-সঙ্গীতেই হক, বাংলা সাহিত্যের মৌলিক পুঁজি বেশী নয়। সেই স্বল্প মূলধন এক জনের হাত থেকে পাঁচ জনের হাতে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। এতে মূল কে. আর কে অনুকারক স্থির করাই কঠিন।

এইখানে বলে রাখা যেতে পারে যে, মঙ্গলকাব্যে শিব-দুর্গার যে রূপ আমরা দেখেছি, উমাসঙ্গীতে তাঁদের রূপ তারই ওপর এক পোঁচ মাত্র। সেই একই ঐতিহ্য অব্যাহতভাবে বয়ে চলেছে।

বাউল-সঙ্গীত

সচরাচর যে বাউলদের আমরা পথে ঘাটে দেখি, তাঁদের পোশাকও যেমন বিচিত্র টুকরোর সমাবেশে তৈরী, তাঁদের ধর্মমতও তেমনি বিভিন্ন মতের ভগ্নাংশ নিয়ে গঠিত। এই সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব বাংলার বাইরে নেই এবং বাঙালীর

সামাজিক জীবনের বাইরেই তাঁদের স্থিতি। তাঁরা হিন্দুও বটে, মুসলমানও বটে, আবার দুইয়ের কোনটাই নয়। মনে করা যেতে পারে, দুই সম্প্রদায়ের মূল শাখা থেকে কোন-না-কোন কারণে যাঁরা ছাঁট পড়ে গেছেন, তাঁরা উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মমতের কতক কতক স্থূল কথা নিয়ে, তার সঙ্গে কিছু পরিমাণ নূতন জিনিস মিশেল দিয়ে, নিজেদের মতো করে একটা স্বতন্ত্র সম্প্রদায় গড়ে নিয়েছেন। প্রচলিত সমাজবিধির সঙ্গে সামঞ্জস্য না হওয়ায় লোকে তাঁদের বলেছে বাউল বা বাতুল।

সমাজতাড়িতদের সমন্বয় সাধন ও একীকরণের মন্ত্র হিসাবে এঁরা তাই প্রচলিত দেব-দেবীদের বাতিল করেছেন। এঁদের উপাস্য হচ্ছেন সাঁই বা গুরু। কিন্তু এঁদের উপাসনা-পদ্ধতিতে বৈষ্ণবোচিত নতি ও মাধুর্যের অভাব নেই, আবার সুফীদের ভোগবাদকেও এঁরা উপেক্ষা করেননি। এঁদের সাঁই বা গুরু বা কর্তা কখনো পার্থিব গুরু, কখনো বা ঈশ্বর। তাঁর নির্দেশ ছাড়া অন্য কোন অনুশাসনই এঁরা মানেন না। এই জন্যে এঁদের আর এক নাম কর্তাভজা। এঁদেরকে এক শ্রেণীর সহজিয়া ও বলা যেতে পারে। বোধ হয় তান্ত্রিক বৌদ্ধ আমলে সমাজ বহির্ভূত রকমের কতকগুলো সম্প্রদায় দেশে গড়ে উঠেছিল, যার একটা শাখার পরিণতি বাউলে।

বাউল সঙ্গীত এঁদের রচনা না হব, এঁদের জন্যে রচিত, তাতে আর সন্দেহ নেই। অধিকাংশ গানেরই রচনা এমন নিখুঁত, বক্তব্য এত গভীর এবং ব্যঞ্জনা এত মধুর যে, এগুলো অশিক্ষিত বাউল সম্প্রদায়ের রচনা বলে ত মনে হয়ই না, উপরন্তু খুব বেশী প্রাচীন বলেও মনে হয় না। এ পর্যন্ত যে সমস্ত সঙ্কলন প্রকাশিত হয়েছে, তার কোনটাই নির্ভেজাল ভাবা যায় না। অমুক মাঝি, অমুক কৈবর্ত, অমুক বাগ্দি, অমুক হরকরা, বিচিত্র নামের স্বাক্ষর দিয়ে সঙ্কলয়িতারা যতই প্রচার করুন না, গানের রচনা থেকে শিক্ষিত আধুনিক কবির হাত তাঁরা গোপন করতে পারেন না। এদের ভাষাই এ বিষয়ে আমাদের প্রধান সাক্ষ্য,

ধন্য আমি বাঁশীতে তোর আপন মুখের ফুঁক।
এক বাজনে ফুরাই যদি নাইক কোন দুখ॥
ত্রিলোক ধাম তোমার বাঁশী আমি তোমার ফুঁক।
ভালো মন্দ রন্ধ্রে বাজি, বাজি দুখ আর সুখ॥

সকাল বাজি সন্ধ্যা বাজি বাজি নিশুইত রাত।
ফাগুন বাজি শাওন বাজি তোমার মনের সাথ॥

কিংবা,

হৃদয় কমল চলছে ফুটে কত যুগ থেকে।
তাতে তুমিও বাঁধা আমিও বাঁধা মুক্তি দিবে কে।
ফোটে ফোটে ফোটে কমল ফোটার না হয় শেষ।
সেই কমলের গন্ধ একই রূপ যে তাই বিশেষ॥
তারে পারে না রে লোভী ভ্রমর যাইতে ফেলে রেখে।
তাতে তুমিও বাঁধা আমিও বাঁধা মুক্তি দিবে কে॥

কিংবা,

তোমার পথ ঢেকেছে মন্দিরে মসজেদে।
তোমার ডাক শুনে সাঁই চলতে যে চাই,
রুখে দাঁড়ায় গুরুতে মুরশেদে॥

কিংবা,

পরাণ আমার সোতের দীয়া,
মোরে ভাসাইলা কোন ঘাটে॥

নিঃসন্দেহে এগুলো আধুনিক রচনা। শুধু আধুনিক নয়, রবীন্দ্রযুগের রচনা। এর ভেতর যেটুকু Archaic ভঙ্গি দেখা যায় তা স্বেচ্ছাকৃত, একটু পাল্টে দিলেই আর কোথাও অচেনা কিছু থাকে না। এসব রচনা আর যাই হক, ময়মনসিংহ-গীতিকার চেয়ে ঢের বেশী ভেজাল। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে গীতের অনেক শাখা, অনেক রূপ আছে। কোথাও ভালো জিনিস নেই এমন নয়, কিন্তু সর্বত্র তা অতিশয় গতানুগতিক। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাই এই অদৃষ্টপূর্ব ঘটনাকে স্বীকার করে নেওয়া কঠিন।

লৌকিক সঙ্গীত : নিধু বাবু ও শ্রীধর

চর্যাপদ থেকে সুরু করে একেবারে বাউল সঙ্গীত পর্যন্ত, বাংলা সাহিত্যে একটানা উপ-ধর্মের আধিপত্য চলে এসেছে। কিস্‌সা-কাব্য ও ময়মনসিংহ-গীতিকা ভিন্ন সামাজিক মানুষের দাবী কোথাও স্বীকৃত হয় নি। মঙ্গলকাব্যে সামাজিক মানুষ আছে, সে দেব-দেবীদের বকলমায়। রামপ্রসাদে একবার

ব্যক্তিগত আকুতির সুর শুনেছি, সে-ও ধর্মসম্পর্কহীন নয়। কাজেই আমাদের সাহিত্যে প্রেম এসেছে রাধার জবানীতে। বাৎসল্য এসেছে যশোদা বা মেনকার মারফতে। শৌর্য এসেছে চণ্ডিকার দোহাই নিয়ে।

উনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় ক্রমে ব্যক্তিক অনুভূতি ভাঙা ভাঙা ভাবে আসতে সুরু করল। যেটাকে আমরা বলি কবিওয়ালাদের যুগ, সেই যুগের গীত সাহিত্য সম্বন্ধে সত্যি কথা বলতে গেলে বলা দরকার যে, বৈষ্ণব কবিতার পর লিরিক কাব্যের ধারা-বিবর্তনে তার একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। যদিও এই সব কবির প্রেমসঙ্গীতের ধারা মূলত বৈষ্ণব কবিতা থেকেই গৃহীত, তবু এখানে রাধা-কৃষ্ণ নেই, তার স্থান দখল করেছে সামাজিক স্ত্রী-পুরুষ। তাদেরই অনুরাগ, আবেদন, অভিমান, বিরহ, অপমান, প্রেমের বিভিন্ন অবস্থা অবলম্বন করে এই সব গান লিখিত হয়েছে। নিছক কৃষ্ণসঙ্গীত এবং শ্যামা-সঙ্গীতের প্রভাব তখনো ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে কাজ করেছে। কৃষ্ণকমলের 'রাই উন্মাদিনী' কিংবা বদন অধিকারী বা নীলকণ্ঠের পদে, কিংবা রসিক রায় বা ব্রজ রায়ের শ্যামাসঙ্গীতে তার ভগ্নদশার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাই। কিন্তু নূতন সুরেরই প্রাবল্য ঘটেছে। সে সুর ক্ষীণ হতে পারে, তবু উপেক্ষণীয় নয়।

নিধু বাবু, শ্রীধর কথক, রাম বসু, কালী মির্জা, হরু ঠাকুর, এই ক-জন এই নূতন দলের অন্তর্গত। নিধু বাবুই এই দলের মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতিসম্পন্ন। শোরি মিঞার টপ্পাকে বাংলা ছাঁদে ঢেলে, তিনি একদা দেশের আবালবৃদ্ধ-বনিতাকে মাতিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর সেই সব গান আজো বাংলার পল্লী-অঞ্চলে কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত হয়। তার ভেতর বিরহের তীব্রতা বা মিলনের মদিরতা না থাকলেও, হৃদয়াবেগের প্রসন্নতা আছে, যা ভালোই লাগে। যেমন,

বিধু মুখে মধুর হাসি,
দেখিলে সোহাগে ভাসি,
তাই তোমায় দেখিতে আসি,
দেখা দিতে আসি না॥

কিংবা এটা,

তোমার তুলনা তুমি এ মহীমণ্ডলে,
আকাশের পূর্ণ শশী সে-ও কাঁদে কলঙ্ক ছলে॥
সৌরভে আর গৌরবে, কে তব তুলনা হবে,
আপনি আপন সম্ভবে, যেন গঙ্গাপূজা গঙ্গার জলে॥

এ দুটি গান শ্রীধর কথকের নামেও চলতে দেখা যায়, যদিও বেশির ভাগ বইয়ে নিধুর নামই প্রচলিত আছে। শ্রীধর এবং নিধুর রচনাপদ্ধতি অনেকটা এক রকম, দু-জনের বিষয়ও এক, শব্দ-প্রয়োগেও তফাৎ খুব কম। কাজেই এ গোলমালের একটা সঙ্গত কারণ আছে। কিন্তু এর ওপরেও আর একটা কারণ, গীত আকারে এদের লোকের মুখে মুখে ফেরা। উপায় কি ওপরের গান দুটির সঙ্গে নীচের গানটির তফাৎ ধরার? নীচেরটি শ্রীধরের রচনা বলে প্রচারিত,

তবে ভবে কি সুখ হত।
আমি যারে ভালোবাসি সে যদি ভালোবাসিত॥
প্রেম-সাগরের জল হইত তবে শীতল,
বিচ্ছেদ বাড়বানল যদি তাহে না থাকিত।

এই শ্রেণীর গান বহু কবির আছে। পৃথক পৃথক ভাবে এর জন্যে কোন কবিকে নির্বাচন করা চলে না, সমগ্রভাবে এই পর্যায়ের সাহিত্যকে একটা বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্গত করে দেখাই শ্রেয়।

রাম বসু বা কালী মির্জার বিরহসঙ্গীতের আবেদন আর একটু গভীর। অনেক স্থানে তা প্রায় খাঁটি লিরিকের কাছাকাছি এসে পড়েছে, নিধুবাবু বা শ্রীধর কথকে যা হতে পারেনি। রাম বসু বা কালী মির্জার বিরহগানে বানানো কথা যে নেই তা নয়, মামুলি উপমার বাহুল্য যে নেই তা-ও নয়। তবে সে সবকে ছাপিয়ে ওঠে একটা আকুলতা, একটা অব্যক্ত বেদনা, যা মনকে টানে। যেমন রাম বসুর,

মনে রইল রে মনের বেদনা।
প্রবাসে যখন যায় গো সে,
তারে বলি বলি বলা হল না।
সরমে মরমের কথা কওয়া গেল না॥

কিংবা কালী মির্জার (যদিও এতে কিছু পরিমাণে কৃষ্ণ-রূপকের আভাস আছে),

আর ত যাব না আমি যমুনারি কূলে।
... ...
গুরুজন ছিল সাথে, মরে ছিলাম মরমেতে,
ভরিয়ে এনেছি কুম্ভ নয়নেরি জলে॥

এই ধরনের গানই যে আধুনিক প্রেমসঙ্গীতের পিতা না হক পিতামহ-স্থানীয়, তাতে আর সন্দেহ নেই। নিধু বাবু বা শ্রীধর কথক, কিংবা রাম বসু বা কালী মির্জা এই ধারাটা কোথা থেকে পেলেন, তা নিয়ে গবেষণা করে দেখতে আমাদের বেশী দূর যেতে হবে না। অনুমান করতে পারা যায়, দেব-দেবী-সঙ্গীত যথেষ্ট হয়ে যাবার পর দেশের চিত্তবৃত্তি মানব-সঙ্গীত খুঁজছিল। তারই ভাষা আধো আধো ভাবে প্রকাশ পেয়েছে এইসব প্রেমের গানে বা নিধুর প্রসিদ্ধ বাংলা ভাষা সম্বন্ধীয় গানে,

নানান দেশের নানান ভাষা।
বিনে স্বদেশী ভাষা মেটে কি আশা।

এই প্রেমসঙ্গীত আরো একটু হাল্কা, কিন্তু আরো অনেক বেশী সাবলীল ভাষায় রূপ পেয়েছে গোপাল উড়ের বিদ্যাসুন্দর গানে। ভারতের বিদ্যাসুন্দরে যে মানবিক আবেদনটুকুর অভাবে কাব্যটি আগাগোড়া অপূর্ব শব্দ-লীলার নিষ্ফল খেলায় পর্যবসিত হয়েছে, গোপাল উড়ের যাত্রা-গানে তার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়েছে। কোন কোন বিষয়ে গোপাল উড়ে আধুনিককেও টেক্কা দেন, যেমন,

কমলেরি বনে গেলে কাঁটা ফোটে পায়।
তা বলে কি ফাঁকে ফাঁকে পা বাড়ানো যায়॥
ডুবেছি না ডুবতে আছি, পাতাল কত দূরে দেখি।

নয়ত,

রূপ দেখে কি কুল হারালাম বকুলতলায় এসে ...

নয়ত,

চেঁচা চুলে বকুল ফুলে মালা গেঁথেছে।

বলা বাহুল্য, রুচির প্রশ্ন নিয়ে আমরা মাথা ঘামাচ্ছি না। আমাদের মনে রাখতে হবে, একদা এই উড়িয়া মহাশয়ের গান প্রকাশ্য আসরে গাওয়া হত, আর মণ্ডলী করে বসে বালকবৃদ্ধ তাই শুনতেন। চিকের আড়ালে কুলনারীরাও শুনে দু-হাতে কান ঢাকতেন না।

সমকালানুক্রম

খৃঃ পূঃ ২০০০—বৈদিক আর্য সভ্যতা। বেদে পূর্বাঞ্চলীয় দেশ ও মানুষের উল্লেখ।

খৃঃ পূঃ ১০০০—রাঢ় (সুহ্ম), পৌণ্ড্র (গৌড়) ও বঙ্গ (পূর্ববঙ্গ)। অষ্ট্রিক জাতির সভ্যতা। শিব-শক্তি আরাধনা।

খৃঃ পূঃ ৩০০—মৌর্য শাসন। মগধের অধীনে বাংলার কতকাংশ। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির বাংলায় প্রবেশ।

খৃঃ অঃ ৪০০—গুপ্ত শাসন। বাংলায় আর্যাবর্তের সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিস্তার। বাঙালীর রূপান্তর।

খৃঃ অঃ ৭০০—কর্ণসুবর্ণে (মুর্শিদাবাদে ?) শশাঙ্ক মহারাজের আবির্ভাব। হর্ষবর্ধন ও শশাঙ্ক।

খৃঃ অঃ ৯০০—বাংলায় পাল রাজাদের শাসন। ধর্মপালের দিগ্বিজয়। বৌদ্ধ সহজিয়াবাদ এবং চর্যাপদ ও নাথ সাহিত্য।

খৃঃ অঃ ১২০০—সেন রাজাদের শাসন। কৌলীন্য প্রথা। লক্ষ্মণ সেন ও জয়দেব। সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্ম। তুর্কী অভিযান। রামাই পণ্ডিতের শূন্য পুরাণ।

খৃঃ অঃ ১৪০০—মিথিলায় বিদ্যাপতি। বাংলায় বড়ু চণ্ডীদাস। আদি বৈষ্ণব কবিতা। তাহেরপুরে (রংপুর) কংস নারায়ণ বা রাজা গণেশ। কৃত্তিবাসী রামায়ণ। বরিশালে বিজয় গুপ্ত ও ময়মনসিংহে নারায়ণ দেব। মনসা মঙ্গল। মালাধর ও শ্রীকৃষ্ণ বিজয়।

খৃঃ অঃ ১৫০০—শ্রীচৈতন্য ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম। ছয় গোস্বামী ও তাঁদের মত। পদাবলী ও চরিত সাহিত্য। বৈষ্ণবভাব প্রভাব। মুকুন্দরাম ও মাধবাচার্য। চণ্ডী মঙ্গল।

খৃঃ অঃ ১৬০০—কাশীরাম দাস ও মহাভারত। ঘনরাম ও ধর্ম মঙ্গল। মুসলীম কিস্সা কাব্য। দৌলৎ কাজি ও আলাওল। জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রমুখের কবিতা।

খৃঃ অঃ ১৭০০—রামেশ্বরের শিবায়ণ। ময়মনসিংহ গীতিকা ও লৌকিক ছড়া সাহিত্য।

খৃঃ অঃ ১৮০০—ভারতচন্দ্র ও নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র। অন্নদা মঙ্গল। হালিসহরের রামপ্রসাদ ও শ্যামা সঙ্গীত। বাউল গান।

খৃঃ অঃ ১৯০০—গীতিসাহিত্য। দাশরথি, কমলাকান্ত, নিধুবাবু, হরু ঠাকুর ও গোপাল উড়ে। এন্টুনি, ভোলা ময়রা প্রভৃতি কবিওয়ালা।

দ্বিতীয় ভাগ ঃ আধুনিক কাল

সূচনা

ইংরেজ অধিকার

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় হল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি পেল ১৭৬৫ সালে। ১৭৭৩ সালের রেগুলেটিং এক্ট কোম্পানিকে বৃটিশ জাতির প্রতিনিধি রূপে বাংলা শাসনের অধিকার দিল। এখান থেকেই সুরু হল ভারতে ইংরেজ শাসন এবং নূতন যুগ এল।

নবাবী আমলের সামাজিক বিশৃঙ্খলায় ও শাসক জাতির বৈষম্যমূলক আচরণে হিন্দুরা পাঁচ শতাধিক বৎসর নিগৃহীত হয়েছিলেন। তারা আন্তরিক ভাবে চাইছিলেন পরিবর্তন। ইংরেজ শাসনকে তাঁরা তাই উন্নতি ও প্রগতির সহায়ক জ্ঞানে স্বাগত করলেন।

শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ইংরেজ শাসন সত্যই প্রগতির পরিপোষক হল। ১৮০০ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়। এর পরে একে একে ঢাকা কলেজ, কৃষ্ণনগর, হুগলী ও বহরমপুর কলেজ হয় এবং ১৮৫৭ সালে গঠিত হয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। পুরানো আমলের শিক্ষা-দীক্ষার উপর ছেদ পড়ল এখানে এবং নব সংস্কৃতির সূচনা হল। রামমোহন রায় ১৮২৩ সালে যুগের অনুযায়ী ধারায় এদেশে বিজ্ঞান, ইতিহাস, চিকিৎসাশাস্ত্র ইত্যাদি পড়ানোর দাবি জানিয়ে তখনকার গবর্ণর জেনারেল লর্ড আমহার্ষ্টকে এক চিঠি দেন। এই চিঠি এবং ১৮৫৪ সনের উড়ের Education Despatch থেকেই শিক্ষাক্ষেত্রে আসে বৈপ্লবিক পরিবর্তন।

এই নূতন শিক্ষা-দীক্ষার ফলে দেশের সামাজিক জীবনকে আমূল ঢেলে সাজার তাগিদ অনুভব করলেন দেশবাসী এবং একে একে তাঁদের দাবি অনুযায়ী আইন তৈরি সুরু হল। রামমোহন রায়ের আন্দোলনে সতীদাহ নিবারণ আইন হল (১৮৩০), বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ আইন পাশ করালেন ১৮৫৫ সালে। ১৮৫০ সালে জন্মগত বাধা অপসারণ আইন এবং ১৮৭২ সালে অসবর্ণ বিবাহ আইন সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতে আনল আরো বড় পরিবর্তন। ১৮৪৯ সালে

নারীদের শিক্ষার জন্যে প্রতিষ্ঠিত হল বেথুন কলেজ। নারীর সামাজিক অধিকার লাভের এই হল প্রথম সোপান।

রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজ গঠন করেন, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাকেই পুষ্ট ও সমুন্নত করেন ১৮৩৯ সালে। কেশবচন্দ্র সেন ও শিবনাথ শাস্ত্রী পরে ভিন্ন ধারায় চলে যান যদিও, তবু সমগ্র ভাবে ব্রাহ্মসমাজই দেশে বিধবা বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ, জাতিভেদ লোপ, নারীর শিক্ষার অধিকার প্রভৃতি প্রগতিমূলক আন্দোলন করেছে এবং নূতন যুগ ও জীবনের প্রতি লক্ষ্য রেখে সাহিত্য ও সংস্কৃতিরও পুনর্গঠন করেছে। এই প্রগতিমূলক আন্দোলনের বিরুদ্ধে একটা সনাতনী আন্দোলন চলে রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে। কিন্তু দেশে তা বিশেষ আত্মপ্রতিষ্ঠ হতে পারে নি।

নূতন সংস্কৃতি

ইংরেজ শাসনে নূতন শিক্ষা-দীক্ষা ও নূতন সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি দেশে এল বটে, কিন্তু মস্ত একটি কুফলও এল এই সঙ্গে। দেশের অর্থনৈতিক বনিয়াদ সম্পূর্ণ ধ্বসে পড়ল ইংরেজ জাতির শোষণের ফলে। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পর্বেই বাষ্প ও বিদ্যুৎকে যান-বাহন চলাচলে এবং শিল্প-উৎপাদনে নিয়োজিত করতে পেরেছিলেন ইংরেজ জাতি। তার ফলে কুটীরশিল্পের যুগ শেষ হয়ে ইংলণ্ডে এসেছিল বৃহৎ শিল্প বা যন্ত্রশিল্পের যুগ।

ভারতবর্ষ থেকে সুলভ মূল্যে সংগৃহীত কাঁচা মাল নিয়ে গিয়ে, ইংলণ্ডের কারখানায় তা দিয়ে পণ্য বানানো এবং ভারতের বাজারে আবার সেই পণ্য এনে বেচা, এই করে ইংরেজরা অসীম ঐশ্বর্যের অধিকারী হলেন এই সময় থেকে। আর এই শোষণের ফলে নিঃস্ব সর্বস্বান্ত হতে লাগলেন ভারতবর্ষের চাষী ও কারিগর শ্রেণী। কিন্তু দেশের এই অর্থনৈতিক সর্বনাশ টের পেলেন না অনেক দিনই তথাকথিত ভদ্রসমাজ। তাঁদের একাংশকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুযোগে জমিদার করেছিলেন ইংরেজরা, আর একশ্রেণীকে ইংরেজীশিক্ষিত স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত বানিয়েছিলেন, যাদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের সংস্রব ছিলনা।

দেশে কিন্তু আস্তে আস্তে আত্মচেতনা জাগতে লাগল। শিক্ষিত মধ্যবিত্তেরা যখন ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষকতায় জমিদার ও ব্যবসায়ী হয়ে ধনসঞ্চয় করতে লাগলেন, অথবা সরকারী চাকুরিয়া রূপে ক্ষমতা, আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করতে লাগলেন, সাধারণ মানুষরা তখনি স্বাধীনতা লাভের

কথা ভাবতে আরম্ভ করলেন। এই ভাবনা থেকেই আস্তে আস্তে সুরু হল বিদ্রোহ এবং সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, সিপাহী বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ, একের পর এক করে দেখা দিতে লাগল। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহে বাঙালীর কোন বড় ভূমিকা ছিল না, কিন্তু ১৮৬০ সালের নীল বিদ্রোহে তাঁরা প্রবল শক্তিতে লড়েছেন।

শিক্ষিত শহুরেদের মধ্যে হরিশ মুখোপাধ্যায় হিন্দু পেট্রিয়টে নীল বিদ্রোহ নিয়ে আন্দোলন করেছেন। দীনবন্ধু এ নিয়ে নাটক লিখেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ মহিমান্বিত হয়েছে। কিন্তু শহুরেদের রাজনীতি বিদ্রোহ অপেক্ষা নিয়মতন্ত্রের পথকেই বেশী খুঁজেছে। ১৮৬৭ সালের হিন্দু-মেলায় প্রথম সঙ্ঘবদ্ধ রাজনৈতিক আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপিত হয়। ১৮৮৫ সালে জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে এই চেতনাই বিস্তার লাভ করে। তারপর বঙ্গভঙ্গ রোধের প্রয়োজনে ১৯০৫ সালে স্বদেশী আন্দোলন দেখা দিল, ক্রমে রক্ত-বিপ্লবে ঘটল তার রূপান্তর। রাজনীতির দু-ধারাই তখন থেকে চলল পাশাপাশি।

দেশের মুসলমানরা কেউ কেউ জাতীয় আন্দোলনে এসেছিলেন, কিন্তু বেশির ভাগই দূরে ছিলেন। ইংরেজের প্রতি বিদ্বেষ বশে তাঁরা আধুনিক শিক্ষা নেননি, তাই এই আন্দোলনের প্রকৃত তাৎপর্য তাঁরা উপলব্ধি করেননি। তাছাড়া ১৮৫০ সালের ওহাবী বিদ্রোহ এবং ১৮৭৯ সালের আলিগড় কলেজ স্থাপনা মুসলীম মনস্তত্ত্বে দারুণ একটি ভেদবুদ্ধিও সৃষ্টি করেছিল। এই ভেদবুদ্ধিই ১৯৩০ সালে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার সুযোগে লীগ মন্ত্রিসভা গঠনের এবং ১৯৪৭ সালে বঙ্গবিভাগের মধ্যে দিয়ে মূর্ত হয়েছে বাংলার চির দুর্ভাগ্য রূপে।

আধুনিক সাহিত্যের বিকাশ

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ধারা বুঝতে হলে, ইংরেজ রাজত্ব স্থাপনের সুরু (১৭৫৭) থেকে স্বাধীনতা লাভের (১৯৪৭) অধ্যায় পর্যন্ত, জাতীয় জীবনের এই ধারাবাহিক প্রবাহটা অনুধাবন করা দরকার। সাহিত্য জাতীয় মানস-প্রকৃতি এবং সমাজ প্রবণতারই দর্পণ, সেদিকটা বাদ দিয়ে তাই সাহিত্যের প্রগতি বোঝাই সম্ভব নয়।

এই সময়ের মধ্যে আমরা দেখলাম, দেশে বিচিত্র জ্ঞান-বিজ্ঞান আমদানির জন্যে প্রভূত চেষ্টা চলছে। সামাজিক কুসংস্কার ও নৈতিক কদাচার দূর করার

আন্দোলন' চলছে। দেশপ্রেমকে জাতির মানসলোকে সগৌরবে প্রতিষ্ঠা করার আয়োজন হচ্ছে। এই নানামুখী বাস্তব প্রয়োজন থেকেই জন্মেছে বাংলা গদ্য, যা প্রথম কেরী (১৭৬১-১৮৩৪), মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার (১৭৬২-১৮১৯), রামরাম বসু (১৭৫৭-১৮১৩) ও রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩) সৃষ্টি করেন।

বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও অভিধান প্রথম রচিত হয় এঁদের সময়। ছোট-বড় বহু বই লেখা হয়েছিল। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের 'বঙ্গভাষাভিধান' (১৮১৭), রাধাকান্ত দেবের 'বাংলা শিক্ষক' (১৮২০), রামমোহন রায়ের 'গৌড়ীয় ভাষার ব্যাকরণ' (১৮২৬), রামকমল সেনের 'ইংরেজী-বাংলা অভিধান' (১৮৩৪) তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। পাদ্রী পণ্ডিতদের মধ্যে হালহেড, আপজন, কেরী, মার্শম্যান, হটন প্রভৃতির কাজ এক্ষেত্রে সব চেয়ে স্মরণীয়। প্রথম সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রেরও এঁদের হাতেই জন্ম। মার্শম্যানের 'সমাচারদর্পণ' (১৮১৮), রামমোহন রায়ের 'সম্বাদকৌমুদী' (১৮২১), ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ-প্রভাকর' (১৮৩১) পরের পর লক্ষণীয়।

কিন্তু কেবল মাত্র প্রয়োজনাত্মক লেখা নিয়েই ব্যস্ত থাকেনি আধুনিক বাংলা সাহিত্য। যুগোচিত বিচিত্র ভাব-কল্পনা, মননশীলতা ও জীবন-দর্শন তাকে নূতন সাহিত্য রচনাতেও প্রবর্তিত করেছে। কাব্য, নাটক, উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ, নানা পথে যেমন সাহিত্যিকের সৃজনী প্রতিভা উচ্ছ্বসিত হয়েছে, তেমনি সমাজ-জীবনের বিচিত্র সঙ্কট-সমস্যা তাতে মূর্ত হয়েছে। নর-নারীর সম্পর্কের উপর হয়েছে নূতন আলোকসম্পাত এবং জগৎ ও জীবনের রহস্য রূপায়িত হয়েছে গল্পে, গানে, লিরিক কবিতায়। ঈশ্বর গুপ্ত (১৮১১-১৮৫৯), প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩), বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৮৬), অক্ষয় দত্ত (১৮২০-১৮৯১), মাইকেল (১৮২৩-১৮৭৩), রঙ্গলাল (১৮২৭-১৮৮৭), দীনবন্ধু (১৮৩০-১৮৭৩), বঙ্কিম (১৮৩৮-১৮৯৪), হেমচন্দ্র (১৮৩৮-১৯০৩), নবীনচন্দ্র (১৮৪৭-১৯০৯), রমেশচন্দ্র (১৮৪৮-১৯০৯), বিহারীলাল (১৮৩৫-১৮৯৪), গিরিশচন্দ্র (১৮৪৪-১৯১১), রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১), দ্বিজেন্দ্রলাল (১৮৬৩-১৯১৩), দেবেন সেন (১৮৫৫-১৯২০), অক্ষয় বড়াল (১৮৬৫-১৯১৮), প্রভাত মুখোপাধ্যায় (১৮৬৩-১৯৩১), প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬), শরৎচন্দ্র (১৮৭৬-১৯৩৮), এই শতাব্দীব্যাপী সাহিত্যযাত্রার কয়েকজন মুখ্য স্রষ্টা। এঁদের সঙ্গেই আছেন আরো বহুজন।

উনবিংশ শতাব্দীতে জাতীয়তাই ছিল সাহিত্য-সৃষ্টির আদি উৎস। সিপাহী বিদ্রোহের অশ্বারূঢ়া ঝান্সীর রাণী মাইকেলের 'মেঘনাদবধে' (১৮৬০) প্রমীলার মূর্তিতে দেখা দিয়েছেন। সন্ন্যাসী বিদ্রোহ 'আনন্দমঠে' এবং বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলন 'বিষবৃক্ষে' প্রেরণা দিয়েছে বঙ্কিমকে। 'নীলদর্পণে'র কথা আগেই বলেছি। রবীন্দ্রনাথও স্বদেশী আন্দোলন থেকে 'গোরা'র (১৯০৭) উদ্দীপনা পেয়েছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী রচনাগুলি দেশ-কালের সীমাতিক্রম করে আন্তর্জাতিক মানবাত্মাকে স্পর্শ করেছে তার ভাবের প্রাচুর্যে ও আদর্শের মহত্ত্বে। এখান থেকেই আধুনিকতার সুরু। শরৎচন্দ্র, প্রমথ চৌধুরী ও সমসাময়িক লেখকরা এখান থেকেই তাঁদের যাত্রা সুরু করেছেন।

উনবিংশ শতাব্দীর সুরু থেকে বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের হয়েছে আশ্চর্য ও অসামান্য প্রসার। কিন্তু কলকাতা যখন থেকে হয়েছে সারা দেশের রাজধানী এবং দেশের সমস্ত ধন-জন ও জ্ঞান এসে সীমাবদ্ধ হয়েছে কলকাতায়, তখন থেকে দেশের চাষী, কারিগর ও সাধারণ মানুষদের সঙ্গে মানসিক যোগ ছিন্ন হয়ে গেছে আধুনিক লেখকদের। নবযুগের সাহিত্য তাই দেশের বৃহত্তম মানবগোষ্ঠীর কাছে অপরিচিতই থেকে গেছে। এ জিনিস ছিল না সেকালে। মঙ্গল গান, পাঁচালী, কথকতা ও যাত্রার মাধ্যমে দেশের সাহিত্য নিরক্ষর মানুষদের কাছেও পৌঁছে দেওয়া হত। সাধারণ মানুষকে প্রভাবিত করতে না পারাই হল উনবিংশ শতাব্দীর সংস্কৃতির প্রধান ব্যর্থতা। একালের সাহিত্যে সাধারণ মানুষদের সমস্যাকে নূতন করে রূপদানের চেষ্টা হচ্ছে, কিন্তু তাঁরা এ সাহিত্যের অংশীদার হতে পারেননি আজ পর্যন্ত।

প্রথম অধ্যায়

গদ্য

বাংলা গদ্য একান্ত ভাবে এ যুগের সৃষ্টি। শ্রীরামপুরের খৃষ্টান মিশনারীরা এবং তাঁদের সহযোগী বাঙালী পণ্ডিতরা যখন গদ্য ভাষায় বই-পুস্তক ও সাময়িক পত্রিকা প্রচার করতে সুরু করেন, তখনো দেশে চলছে পদ্য রচনার একাধিপত্য। দেশের লোককে জ্ঞান-বিজ্ঞানে ওয়াকিবহাল করে তুলে, সেই তৈরী জমির ওপর খৃষ্টধর্মের বীজ বপনই ছিল পাদ্রীদের লক্ষ্য। কিন্তু দেশের সাহিত্য তা থেকে আশ্চর্য ভাবে আত্মপ্রসারের প্রেরণা লাভ করল এবং বাংলা গদ্য হু-হু করে গড়ে উঠল। এঁদের রচিত বই-পুথির আজ অবশ্য সাহিত্যিক মূল্য বেশী নয়। কিন্তু এঁদের আদর্শেই রামমোহন, বিদ্যাসাগর, অক্ষয় দত্ত পরবর্তী সময়ে সুষ্ঠুতর গদ্য লিখতে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

বিদ্যাসাগরী বাংলার পাশাপাশি ছিল আর একটি বাংলা, সে হল চলিত বা খাস বাংলা। পাদ্রী-আমল থেকেই সেটি নিঃশব্দ পদসঞ্চারে চলে আসছিল। সংস্কৃতাভিমানী পণ্ডিত সমাজের চোখে তা জলাচরণীয় বলে বিবেচিত হয়নি। বিদ্যাসাগর ঘরোয়া বাংলার phrase, idiom, নাম-ধাতু ইত্যাদিকে সংস্কৃতে অনুবাদ করে, একটি ধ্বনিগম্ভীর রচনাভঙ্গি গড়ে নিয়েছিলেন। আর এই ঘরোয়া ভঙ্গির নাম হল হুতোমী, কারণ কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম পেঁচার নক্সা' বইয়ে এই ভঙ্গির সত্যিকার উৎকর্ষ দেখা যায়। টেকচাঁদের বা ভবানীচরণের উপন্যাস বা রামনারায়ণের নাটক প্রধানত হুতোমী বাংলায় লেখা এবং অক্ষয় দত্ত, তারাশঙ্কর তর্করত্ন, মদনমোহন তর্কালংকার, সবাই বিদ্যাসাগরী বাংলার অনুগামী।

বঙ্কিমে এসে এই পরস্পর-বিচ্ছিন্ন দুটি ধারায় মিল হল। শুধু তাই নয়, সমাজসংস্কার, ধর্মপ্রচার এবং শিক্ষাবিতরণের প্রাত্যহিক উদ্দেশ্য ছেড়ে, রসসৃষ্টির মহত্তর আদর্শ নিয়ে সাহিত্যরচনাও সুরু হল। ঔপন্যাসিক ও প্রবন্ধকার রূপে বঙ্কিম একাই বাংলা গদ্যকে বহুদূর এগিয়ে দিয়েছেন। তাঁর

অনুগামী চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রমুখও এদিক থেকে তাঁকে প্রচুর সহায়তা করেছেন। ঈশ্বর গুপ্ত দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সমালোচনা-সাহিত্য সুরু হয়েছিল। রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতির হাতে তা খানিকটা উদ্দীপনা পায়। বঙ্কিম-যুগে এসে সমালোচনা-সাহিত্য একটি নিজস্ব মর্যাদা লাভ করল। অক্ষয় সরকারকে আজকের হিসাবেও বড় সমালোচক বলা যায়। বঙ্কিম-যুগ থেকেই বাংলা ভাষায় দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, জীবনচরিত ইত্যাদি রচনার রেওয়াজ বেড়ে গেল। তারপর রবীন্দ্রনাথ বাংলা গদ্যকে ষোল-আনা সাহিত্য-পদবাচ্য করে তুললেন।

রবীন্দ্রনাথের গদ্য সাহিত্যকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে: সমালোচনা বা সাংবাদিকতা-প্রধান, শিল্প-প্রধান এবং তত্ত্ব-প্রধান। বলা বাহুল্য, এ শ্রেণীবিভাগ বোঝাবার পক্ষে সুবিধাজনক হলেও, আসলে খাঁটি নয়, কারণ রবীন্দ্রনাথ এমন কিছুই লেখেন নি সাহিত্যাংশে যার বিশেষত্ব নেই। রবীন্দ্রনাথ একই সঙ্গে ধ্বনিসমৃদ্ধ ক্ল্যাসিক্যাল ভঙ্গি এবং ব্যঞ্জনাগভীর কথ্যভঙ্গিকে গদ্যের বাহন-রূপে ব্যবহার করেছেন। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত বাংলা গদ্য মূলত তাঁর আদর্শেই রচিত হচ্ছে। জগদীশচন্দ্র বসু, রামেন্দ্র-সুন্দর ত্রিবেদী, বিপিনচন্দ্র পাল, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, জলধর সেন, দীনেন্দ্রকুমার রায়, দীনেশচন্দ্র সেন, প্রভাত-কুমার মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বাংলা গদ্যের বিশিষ্ট লেখক যাঁরা, তাঁরা সকলেই অল্প-বিস্তর রবীন্দ্র-রীতির দ্বারা প্রভাবিত।

আধুনিক কালের লেখকদের মধ্যে একমাত্র প্রমথ চৌধুরী (বীরবল) তাঁর নিজস্ব রচনাভঙ্গির জন্যে যশস্বী হয়েছেন। তাঁর অনুগামী লেখকবর্গ এবং আজকের সমস্ত কথা-সাহিত্যিক ও প্রবন্ধকার যে নূতন রীতির গদ্যরচনায় অবহিত হয়েছেন, এ তাঁরই প্রভাব! কিন্তু এখনো পর্যন্ত এ প্রচেষ্টা পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তর অতিক্রম করে, সার্থক সাহিত্যিক কৌলীন্য অর্জন করেছে সামান্যই।

মৃত্যুঞ্জয় : কেরী : রামমোহন

বৌদ্ধ গান ও দোঁহা থেকে রামপ্রসাদ পর্যন্ত, বাংলা সাহিত্যে শুধু কবিতা এবং গানেরই একাধিপত্য চলে এসেছে। নীতিকথা, ধর্মতত্ত্ব, উপাখ্যান,

জীবনী, ইতিহাস, সবই লেখা হয়েছে পদ্যে। ঘরোয়া চিঠি-পত্রে বা দলিল-দস্তাবেজে একটা গদ্যের চল অবশ্যই ছিল, কিন্তু সাহিত্যে তার স্বীকৃতি ছিল না। সহজিয়াদের পুঁথি-পত্রে ছিটে-ফোঁটা যে গদ্যের নিদর্শন পাওয়া গেছে, তা মেরুদণ্ডহীন এবং বক্তব্য বিষয় পরিস্ফুট করার পক্ষে নিতান্ত অপটু। প্রকৃত গদ্য তৈরী হল ইংরেজ আমলে। শ্রীরামপুরের পাদ্রীরা ধর্মপ্রচারের সুবিধা হবে বলে, বাংলা ভাষার উন্নয়নে মন দেন। বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, অভিধান, সংবাদপত্র, সবই দেখা দিল তাঁদের হাত দিযে। এছাড়া পণ্ডিত নিযুক্ত করে তাঁরা ইতিহাস, বিজ্ঞান ও উপকথা-বিষয়ক বহু বই বাংলায় লেখাতে সুরু করলেন। বাংলা ছাপাখানারও জন্ম তাঁদেরই হাতে।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার, রামরাম বসু, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ তৎকালের প্রসিদ্ধ বাঙালী পণ্ডিতরা এবং তাঁদের সমসাময়িক কেরী, মার্শম্যান, হালহেড প্রমুখ ইংরেজ পাদ্রীরা বাংলা গদ্যের প্রাথমিক ভিত্তি স্থাপন করেন। সেই ভিত্তির উপরই পরবর্তী কালের সাহিত্য-সৌধ গড়ে ওঠে। এই আমলের রচনার নিদর্শন 'সমাচারদর্পণ', 'সম্বাদকৌমুদী', 'তিমিরনাশক' প্রভৃতি সংবাদপত্রের ফাইলে এবং পূর্বোক্ত লেখকদের বইপত্রে পাওয়া যায়। এদের রচনা-ধারা লক্ষ্য করলে একটা জিনিস চোখে পড়ে। দেশী ইডিয়ম-সম্পন্ন সরল কথ্যভঙ্গি এবং দাঁত কিড়িমিড়ি-করা অনুস্বার-বিসর্গ-বর্জিত সংস্কৃত ভঙ্গি, অর্থাৎ ঘরোয়া বাংলা ও পণ্ডিতী বাংলা পাশাপাশি চলেছে। কেরীর 'কথোপ-কথনে' বা 'সমাচারদর্পণ' ও 'সংবাদপ্রভাকর' প্রভৃতিতে প্রকাশিত 'প্রেরিত পত্র'গুলিতে কথ্যভঙ্গির এবং মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের 'প্রবোধচন্দ্রিকায়', রামরাম বসুর 'প্রতাপাদিত্য-চরিতে', রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের 'কৃষ্ণচন্দ্র-চরিতে', এমন কি রামমোহন রায় ও ঈশ্বর গুপ্তের প্রবন্ধে পণ্ডিতী বাংলার নিদর্শন পাওয়া যায়। দীর্ঘ দিন এই দুটি আদর্শ পরস্পর পাল্লা দিয়ে চলেছিল। 'নববাবুবিলাস,' 'আলালের ঘরের দুলাল,' 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা,' 'কুলীনকুল-সর্বস্ব,' 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ', এমন কি 'সধবার একাদশী' পর্যন্ত প্রথম এবং রামমোহন, বিদ্যাসাগর, অক্ষয় দত্ত, তারাশঙ্কর তর্করত্ন, মদনমোহন তর্কালংকার পর্যন্ত দ্বিতীয় ধারার সমমাত্রিক গতি লক্ষ্য করা যায়। বঙ্কিমে এসে দুইয়ে একটা আপোষ হয়।

রামমোহন মিশনারী তথা পণ্ডিতী বাংলার সরীসৃপ-দেহে একটি ঋজুতা ও দার্ঢ্য এনেছিলেন। দুরূহ বৈদান্তিক তত্ত্বের আলোচনায় বা সতীদাহ-

নিবারণের প্রচারকার্যে রামমোহন যে বলিষ্ঠ গদ্য ভাষা প্রবর্তন করেছিলেন, তা তাঁর নিজেরই সৃষ্টি। তাঁর সমসাময়িক ভাষা থেকে তিনি বিশেষ সাহায্য পান নি। তখনকার কোমর-ভাঙা গদ্যে জীবনী-শক্তির অভাব ছিল এত বেশী যে, রামমোহনকে তাঁর প্রবর্তিত গদ্য কেমন করে পড়তে হবে, তার নির্দেশ পর্যন্ত দিতে হয়েছিল।

বিদ্যাসাগর

কিন্তু রামমোহন শব্দ-শিল্পী ছিলেন না, যা ছিলেন বিদ্যাসাগর। তাই বিদ্যাসাগরই সর্বপ্রথম বাংলা রচনা-রীতিতে একটি শিল্পরূপ দিতে পারলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগরই হন বা রামমোহনই হন, বাংলা গদ্যকে কেউ ষোল-আনা প্রাণবন্ত করতে পারেন নি। বিদ্যাসাগর 'বিধবাবিবাহ-বিষয়ক প্রস্তাবে' যেমন সহজ পৌরুষের এবং 'কথামালায়' যেমন অনলঙ্কৃত সারল্যের পরিচয় দিয়েছেন, 'শকুন্তলা'য়, 'সীতার বনবাসে' তেমনি ধ্বনিমুখর শব্দ-সুষমার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু বাংলা ভাষার আসল প্রাণ যেখানে, তার ফ্রেজ, ইডিয়ম, নাম-ধাতু, বিদ্যাসাগর তার সুযোগ না নিয়ে, তারই অনুরূপ করে সংস্কৃতমূলক শব্দপর্যায় তৈরী করে নিয়েছেন। এই যে আনুবাদিক পদ্ধতি, এর ফলেই বিদ্যাসাগরী বাংলা ঠিক স্বতঃস্ফূর্ত হয়নি। তা অলঙ্কারাঢ্য, কিন্তু শ্লথগতি।

রামমোহন-মৃত্যুঞ্জয়ের সমসাময়িক ভবানীচরণে এবং অল্প পরের হুতোমে যে গদ্য-রীতি পাই, তা অনেক বেশী জীবন্ত। তাঁরা যে ভাষা ব্যবহার করেছেন, তা ঢের বেশী স্বচ্ছ হয়েছে এই জন্যে যে, তাঁদের কোন ধার-করা রচনাভঙ্গির মাধ্যমে ভাব প্রকাশ করতে হয়নি। ঘরোয়া শব্দ, দেশী ফ্রেজ-ইডিয়ম, খাস বাংলা ক্রিয়া ও ক্রিয়া-বিশেষণ ইত্যাদির সংযোজনায় তাঁদের বাংলা অনায়াসে মাথা খাড়া করে দাঁড়াতে পেরেছে। একেবারে আজকের চলতি বাংলার পাশে ফেললেও, এঁদের, বিশেষ করে হুতোমের ভাষা-ভঙ্গিটা খুব পুরানো মনে হয় না। অর্থাৎ হুতোমী বাংলাটা আমাদের খুব কাছের জিনিস এবং আমাদের আজকের বাংলায় তার বৈজিক রক্ত বেশ টের পাওয়া যায়। কিন্তু পাদ্রী-আমল থেকে হুতোমী আমলের গোড়া পর্যন্ত, ভাষা-গঠনই চলেছে, সাহিত্য-বস্তু বিশেষ কিছু জন্মায় নি।

সাহিত্যের ভিত্তি স্থাপন করলেন বঙ্কিম। বঙ্কিমী বাংলায় বিদ্যাসাগরী এবং হুতোম-আলালী বাংলার মেল-বন্ধন হয়েছিল। তবে বঙ্কিমেরও ঝোঁক

ছিল পণ্ডিতী বাংলার দিকেই। তাঁর দলবর্তীদের মধ্যে চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, রমেশচন্দ্র দত্ত, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, সবাই বঙ্কিমী আদর্শে অনুপ্রাণিত এবং রচনা-রীতিতে বঙ্কিমের অনুগামী। এঁরা বাংলা গদ্যকে সূতিকা-গৃহ থেকে লোকালয়ে নিয়ে এলেন এবং কেবল মাত্র বেঁচে থাকার অক্ষমতা ঘুচিয়ে, তাকে রীতিমতো কেজো করে তুললেন। বাংলা গদ্যের সত্যিকার ইতিহাস সুরু এখান থেকে।

শিক্ষা, সংস্কার ও প্রচারকার্যের জন্যে বাংলা ভাষায় প্রথম গদ্য লেখা সুরু হয়, একথা আগেই বলেছি। দীর্ঘদিন বাংলা গদ্য এই নিয়েই ছিল। পাদ্রী-আমলের বইয়ে বা সংবাদপত্রে জনসাধারণের মানসিক উৎকর্ষ সাধনের প্রাথমিক চেষ্টা হয়েছিল এবং সে-চেষ্টা নানামুখী। কিন্তু সাহিত্যসৃষ্টির জন্যেও যে গদ্য লেখা যেতে পারে, এ কথা সে যুগে কারুর মাথায় আসেনি। রামমোহন রায়ও সতীদাহ নিবারণ, ব্রাহ্মধর্ম-প্রচার, বৈদান্তিক তত্ত্ববিচার, বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ-রচনা ইত্যাদির জন্যেই গদ্য লিখেছেন। ঈশ্বর গুপ্ত 'প্রভাকরে' গদ্যে সাহিত্য সমালোচনা করেছেন, কিন্তু নিজে সাহিত্য সৃষ্টি করেন নি।

বাংলা গদ্যই তখনো ভালো করে গড়ে ওঠেনি। কোন রকমে কষ্টে-সৃষ্টে বক্তব্য বিষয় পাঠকের গোচরে আনতেই তার প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়েছে। যে সহজ স্বচ্ছতায় সাহিত্যসৃষ্টি সম্ভবপর, ভাষায় তা ছিল না বলেই অবশ্য সাহিত্য হয় নি। বিদ্যাসাগরে এবং অক্ষয় দত্তে এসে বাংলা গদ্য একটা জাত পেল, কিন্তু শিক্ষা ও প্রচারের সাম্প্রতিক উদ্দেশ্য ছাড়িয়ে তখনো তা রসসৃষ্টির পথে পা বাড়াতে পারেনি। বিধবাবিবাহ-প্রচার, বহু বিবাহ-নিরোধ, ছাত্রপাঠ্য উপাখ্যান-রচনা ইত্যাদির ভেতর দিয়ে বিদ্যাসাগর এবং প্রাণিবিজ্ঞান, সৌরবিজ্ঞান, পুরাবৃত্ত আলোচনা ইত্যাদির ভেতর দিয়ে অক্ষয় দত্ত বাংলা গদ্যের প্রকাশ-ভঙ্গি ও ধারণা-শক্তি অনেকটা সাবলীল করে এনেছিলেন। কিন্তু বিষয়-নিরপেক্ষ ভাবে রসাত্মক রচনা তাঁদের হাত দিয়েও হল না। বিদ্যাসাগরের 'শকুন্তলা', 'সীতার বনবাস', 'ভ্রান্তি-বিলাস' বা অক্ষয় দত্তের 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার', 'ভারতীয় উপাসক-সম্প্রদায়' তাই প্রকৃতপক্ষে পাঠ্যপুস্তকের এলাকার বাইরে পড়ে না।

কিন্তু এই অভিজাত বাংলার পিছু ধরে, উপেক্ষা ও অবিশ্বাসের ভেতর দিয়ে অত্যন্ত ক্ষীণ ভাবে একটা সাহিত্য আদি থেকেই গড়ে উঠছিল। সমাচার পত্রিকায় 'সূতা কাটুনির পত্র' বা মাহেশের রথে তৎকালীন বাবুদের

'বিলাসের বিবরণ', বা এই জাতের আর যে সমস্ত টুকরো টুকরো লেখা তখনকার পণ্ডিতেরা বাঁ হাত দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন, তার ভেতরই বাংলা গদ্যের প্রাথমিক সাহিত্যরূপ কতকটা পাওয়া যায়। এই রূপটা আলালে, হুতোমে, নববাবুবিলাসে আরো খানিকটা স্পষ্টতা লাভ করল। বিদ্যাসাগর-চন্দ্রের 'কাদম্বরী,' টেলিমেকস,' 'রামের রাজ্যাভিষেক,' 'রোমাবতী' প্রভৃতি সংস্কৃতানুগ কাহিনীর পাশে, এই ব্যঙ্গ-রচনাগুলোকে রেখে যদি তুলনা করা যায়, তাহলেই বোঝা যাবে এরা কত বেশী উজ্জ্বল! কিন্তু এদের রচয়িতারাও সম্ভবত এই জাতের লেখাকে খুব শ্রদ্ধার চোখে দেখেননি। তাই হুতোম-রচয়িতা কালী সিংহ নিজেই বিদ্যাসাগরী ভাষায় মহাভারত লিখেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র

বঙ্কিমে এসেও বাংলা গদ্যের শিক্ষকতার রূপটাই রয়ে গেল মুখ্যভাবে, কিন্তু সেই সঙ্গে একটা সাহিত্যরূপও আস্তে আস্তে স্বীকৃত হল। বঙ্কিমের 'কমলাকান্ত', 'লোকরহস্য', চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম', চন্দ্রনাথ বসুর 'ত্রি-ধারা', কালীপ্রসন্ন ঘোষের 'নিভৃত চিন্তা', 'নিশীথচিন্তা', অক্ষয় সরকারের 'সনাতনী', রাজনারায়ণ বসুর 'সেকাল ও একাল' বইগুলি এই সময় রচিত হয়েছিল, যার লক্ষ্য ছিল লোকশিক্ষা নয়, জাতিগঠন নয়, সমাজসংস্কার নয়, নিছক রস-পরিবেষণ।

অবশ্য প্রবন্ধ-সাহিত্য বলতে আজ আমরা যা বুঝি, এইসব রচনায় তার প্রাথমিক ভিত্তি স্থাপিত হলেও, এরাও সর্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত নয়। চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের 'সেই মুখখানি' বা কালীপ্রসন্ন ঘোষের 'ঐহিক অমরতা' প্রভৃতি রচনা খেলো ভাবোচ্ছ্বাসে পূর্ণ। চন্দ্রনাথ বসুর 'একটি পাখী', 'পল্লীবাসের সুখ-দুঃখ' বা রাজনারায়ণ বসুর 'সেকালের গুরু-মহাশয়' বা 'সাহেব-সুবার চিত্র' এসবের চেয়ে বরং বেশী সুখপাঠ্য। অক্ষয় সরকারের 'পিতাপুত্র', সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পালামৌ' এবং সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার বাল্যকথা ও বোম্বাই-প্রবাস' বইয়ের কথাও এই সূত্রে উল্লেখযোগ্য। এই তিনটি বই, বিশেষত সঞ্জীবচন্দ্রের 'পালামৌ' ত হাল্কা রচনার আদর্শ বলেই গণ্য হতে পারে। বঙ্কিম-যুগের কোন লেখক, এমন কি স্বয়ং বঙ্কিমও লেখার ধারে এর কাছাকাছি ঘেঁষতে পারেন কিনা সন্দেহ!

অর্থাৎ অনভিজাত ও অনাচরণীয় রূপে যে সাহিত্য-ধারা গোড়ায় জন্ম

নিয়েছিল, সেই নববাবু, নববিবি, হুতোম প্যাঁচাই কমলাকান্তে, মুচিরাম গুড়ে, লোক-রহস্যে বা সেকাল ও একালে রূপান্তর লাভ করেছে এবং এই আমলের গদ্য সাহিত্যের যা আজো পড়ে উপভোগ করা যায়, তা কোন প্রয়োজনের বিষয় নিয়ে তৈরী হয়নি।

অবশ্য দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, রাজনীতি, পুরাবৃত্ত, ধর্মতত্ত্ব প্রভৃতি গুরু বিষয় নিয়ে বই-পত্র লিখেছেন যাঁরা তাঁরা কেউ উপেক্ষার নন। দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির, রাজনীতি ও সমাজ-কল্যাণের দিক থেকে তাঁদের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্মরণীয়। কিন্তু বিপদ এই যে, এই সমস্ত জিনিসকে সাহিত্যের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলা হয়।

বিষয় জিনিসটা হচ্ছে সাহিত্যের ক্ষেত্রে দেহের মতো। দেহ বড় সন্দেহ নেই, কিন্তু যে প্রাণ-শক্তির জোরে এই দেহটা জীবন্ত ও ক্রিয়াশীল, তার অভাব হলে দেহের কতটুকু কদর থাকে? রচনার ক্ষেত্রেও বিষয়-বস্তু হচ্ছে জড় উপাদান মাত্র, সেই উপাদানকে জীবন্ত করে ভঙ্গি। ভঙ্গিহীন বস্তুপুঞ্জ তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের যাদুঘরে সমাদর পায়, সাহিত্যের প্রবহমান প্রাণ-ধারা থেকে তার যোগসূত্র যায় বিচ্ছিন্ন হয়ে।

আমাদের দেশে গদ্য রচনার বাহুল্য আছে, কিন্তু সাহিত্যধর্মী গদ্যের অভাব। আদি থেকে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব পর্যন্ত, বাংলা ভাষায় বস্তুরই একাধিপত্য চলেছে। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার, রামরাম বসু, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত পর্যন্ত যে গদ্য লেখা হয়েছে, তার কথা ছেড়েই দিই। বিদ্যাসাগর, অক্ষয় দত্ত, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত এসে, বিষয় এবং ভাষার আভিজাত্য লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু অন্তরের বেশ তখনো দূরে। বঙ্কিমের এবং তাঁর পারিষদবর্গের লেখাতেই প্রথম প্রাণের সুর শোনা গেল। কিন্তু ওঁরাও মূলত বস্তুকেই দিয়েছেন প্রাধান্য, তাই শ্রমসাধ্য বহু রচনাই ওঁদের পুরোপুরি সাহিত্য-পদবাচ্য হয়ে উঠতে পারে নি।

রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথই প্রথম বাংলা গদ্যের শরীরে সর্বাঙ্গীণ সাহিত্যিকতা প্রতিষ্ঠা করলেন। রবীন্দ্রনাথ বললেন, সাহিত্যের পক্ষে কি বলা হচ্ছে সেটা মূল্যবান হলেও, কেমন করে বলা হচ্ছে সেটা আরো মূল্যবান। অর্থাৎ সাহিত্যে ও

অ-সাহিত্যে যে তফাৎ, তা হল দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রকাশ-রীতির তফাৎ। রবীন্দ্রনাথের ত বটেই, রবীন্দ্র-সমসাময়িক যে-কোন লেখকের লেখাতেই এই সাহিত্যিক কৌলীন্য লক্ষ্য করা যায় এবং বলা বাহুল্য, তার মূলে আছে রবীন্দ্রনাথেরই অনতিক্রমণীয় প্রভাব।

রবীন্দ্রনাথের গদ্যগ্রন্থের সংখ্যাও যেমন অনেক, তার বিষয় এবং রীতির বৈচিত্র্যও তেমনি অফুরন্ত। 'ছিন্নপত্র', 'জীবনস্মৃতি', 'পঞ্চভূত', 'বিচিত্র প্রবন্ধ', 'প্রাচীন সাহিত্য,' 'আধুনিক সাহিত্য,' 'শিক্ষা,' 'সমাজ,' 'কালান্তর,' 'শব্দতত্ত্ব,' 'ছন্দ,' প্রভৃতি বইয়ে কত না নূতন-নূতন পথে তিনি বাংলা গদ্যের ধারাকে প্রবাহিত করেছেন। সব সুদ্ধ জড়িয়ে বাংলা গদ্যকে তিনি যা দিয়েছেন, কি বস্তুর দিক থেকে, কি বিন্যাসের দিক থেকে, বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে একক ভাবে আর কোন লেখকের কাছেই বোধহয় তা পাওয়া যায় নি।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে এক এক করে তিনটি পরস্পরবিশ্লিষ্ট গদ্যরীতি প্রবর্তন করেছেন। প্রথম 'ভারতী'র যুগে, দ্বিতীয় 'সাধনা' ও 'বঙ্গদর্শনে'র যুগে, তৃতীয় 'সবুজপত্রে'র যুগে। এই ত্রি-ধারার কোন-না-কোনটাকে কেন্দ্র করেই এ পর্যন্ত বাংলা গদ্যসাহিত্য আবর্তিত হয়েছে। অলংকারবহুল ক্ল্যাসিক্যাল ভঙ্গি থেকে সুরু করে আটপৌরে কথ্যভঙ্গি পর্যন্ত, যত রকমের স্টাইল বাংলায় আনা যেতে পারে, রবীন্দ্রনাথই তার চূড়ান্ত পরীক্ষা করেছেন। রবীন্দ্র-সমসাময়িকদের অনেকে এবং রবীন্দ্রোত্তর কালের সকলেই এই পুঁজি ভাঙিয়ে যশস্বী হয়েছেন।

রবীন্দ্র-পূর্ববর্তী গদ্যরচনার আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখিয়েছি যে, তাতে শিক্ষা ও সংস্কারের উদ্দেশ্যকে রসসৃষ্টির চেয়ে বড় বলে স্বীকার করা হত। শৈশবাবস্থায় সাহিত্যের পক্ষে এটা হয়ত অপ্রত্যাশিত নয়। রবীন্দ্রনাথেই আমরা প্রথম বাংলা গদ্যের সেই বাল্যাবস্থা অতিক্রম করে, তার পূর্ণ যৌবনের শস্যসমৃদ্ধ অজস্রতার মধ্যে এসে দাঁড়ালাম। এখন থেকে যা আমাদের গদ্য, তার একটা মাপকাঠি নির্ণয় সহজ। কারণ যে-কোন চলনসই লেখকের লেখাও এরপর থেকে একটা বিশেষ স্তরের নীচে নামে না, ভাষার ধারণা-শক্তি ও প্রকাশ-ভঙ্গির এমনি একটা উন্নত মান রবীন্দ্রনাথের হাত দিয়ে বাঁধা হয়ে গেছে।

রবীন্দ্র-সমসাময়িকদের মধ্যে শক্তিমান গদ্যলেখক অনেকেই ছিলেন। তাঁদের রচনার বৈশিষ্ট্যও নিতান্ত কম নয়। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রাখালদাস

বন্দ্যোপাধ্যায়, রমাপ্রসাদ চন্দ, নিখিলনাথ রায় প্রভৃতির ঐতিহাসিক রচনা, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, জগদীশচন্দ্র বসু, বিপিনচন্দ্র পাল, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক রচনা, বিবেকানন্দের ধর্ম ও সংস্কৃতি-বিষয়ক রচনা, প্রিয়নাথ সেন, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনেশচন্দ্র সেন প্রভৃতির সাহিত্য-সম্বন্ধীয় আলোচনা, জলধর সেনের ভ্রমণকাহিনী, দীনেন্দ্রকুমার রায়, যতীন্দ্রমোহন সিংহ প্রভৃতির রেখা-চিত্র বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সম্মানের সঙ্গে গৃহীত হয়েছে। এই সমস্ত রচনায় কোন-না-কোন আকারে রবীন্দ্রনাথের রচনাভঙ্গিরই প্রতিচ্ছবি দেখা যায়, এ অবশ্য না বললেও চলে।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, রবীন্দ্রনাথের কাব্য সাহিত্য তাঁর গদ্য সাহিত্যকে অনেকটা আড়াল করে ফেলেছে। এমন কি, অনেকে তাঁকে খুব বিশিষ্ট শ্রেণীর গদ্যলেখক বলে জানেনও না। কিন্তু গল্প, উপন্যাস, স্মৃতিকথা, লঘু রচনা, তত্ত্ববিচার, সর্ব শ্রেণীর রচনায় সমান সিদ্ধহস্ত রবীন্দ্রনাথ একাই বাংলা গদ্যকে একশো বছরের পথ এগিয়ে দিয়েছেন, পরবর্তীদের জন্যে আরো এগিয়ে যাবার পুঁজি রেখে গেছেন, এটা মনে রাখতে হবে।

প্রমথ চৌধুরী

রবীন্দ্রনাথের পর বাংলায় আর একমাত্র লেখক হচ্ছেন প্রমথ চৌধুরী, যিনি বাংলা গদ্যকে নূতন পথে মোড ঘুরিয়ে দিয়েছেন এবং পরবর্তী হয়েও স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের ওপর সবিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছেন। আমরা এর আগে বাংলা কথ্যভঙ্গির সঙ্গে বিদ্যাসাগরী ও বঙ্কিমী স্টাইলের তুলনা করে দেখাতে চেষ্টা করেছি যে, বাংলা ভাষার সত্যিকার প্রাণ নিবদ্ধ আছে প্রথমোক্ত পর্বেই। প্রমথ চৌধুরী এটা অনুভব করলেন এবং নূতন করে তিনিই বাংলা গদ্য-ধারাকে আবার হুতোমী ধারার সঙ্গে সংযুক্ত করে দিলেন। বাংলা গদ্য এতদিনে তার স্বাভাবিক শক্তি-কেন্দ্রের সন্ধান পেল এবং কৃত্রিম ভাষার অবরোধ ভেঙে অবাধ মুক্তির পথে পা বাড়াল। আজকের বাংলা গদ্য চলছে এই পথেই। হুতোম ও বীরবলের সময়ের মাঝখানে যে সুবৃহৎ গদ্য সাহিত্যের পর্যায়টি রয়ে গেছে, তার মূল্য আজ যতটা ঐতিহাসিক, ততটা সাহিত্যিক নয়, একথা নিরপেক্ষ মানুষকে মানতে হবে। কিন্তু প্রমথ চৌধুরী যতটা শক্তিতে ভাষা সংস্কার করেছেন, ততটা শক্তিতে সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারেন

নি। তবে দুটো বড় কাজ তিনি করেছেন, বাংলা গদ্যকে হাল্কা পায়ে চলবার প্রেরণা দিয়েছেন, আর রবীন্দ্র-সাহিত্যের নৈর্ব্যক্তিকতার স্থানে ব্যক্তিকতার প্রবর্তন করেছেন। এর পর ব্যক্তিক রচনা (Personal Essay) জন্মানো শুধু স্বাভাবিক নয়, সর্বতোভাবে উচিত।

এই প্রসঙ্গে একটা দুঃখের কথা অনেকের মনে হবে। রবীন্দ্র-সমসাময়িক বাঙালী পণ্ডিতরা অনেকে ইংরেজী লেখায় যত মন দিয়েছেন, বাংলায় তা দেননি। বিশ্বের পণ্ডিত সমাজে বাঙালীর বিদ্যা ও বৈদগ্ধ্য প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে ইংরেজীর মতো একটা সার্বজাতিক ভাষার আশ্রয় নেওয়া হয়ত দরকার এবং সে দিক থেকে তাঁরা অন্যায়ও কিছু করেন নি। কিন্তু দেশের জিজ্ঞাসু দৃষ্টির ওপর অপরিচয়ের পর্দা টেনে দেওয়াও তাঁদের পক্ষে সমীচীন হয় নি। মাতৃভূমি ও মাতৃভাষা তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

জগদীশচন্দ্র বসুর 'Response of the Living and the Non-living', প্রফুল্লচন্দ্রের 'History of Hindu Chemistry' বা 'Life of an Indian Chemist' মুষ্টিমেয় উচ্চশিক্ষিতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, হীরালাল হালদার, বিপিনচন্দ্র পাল, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যদুনাথ সরকার, রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বিনয়কুমার সরকার, মহেন্দ্রনাথ সরকার, মেঘনাদ সাহা, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, গিরীন্দ্রশেখর বসু, রমেশচন্দ্র মজুমদার, সুরেন্দ্রনাথ সেন, এ কালের বাঙালী পণ্ডিতদের দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, সর্ববিষয়ক রচনাই আজো ইংরেজী ভাষার কারাগারে আটক রয়েছে। ইংরেজী-না-জানা দেশবাসী এঁদের নামই শুনেছেন, কিন্তু বিদ্যার নাগাল পান নি।

অবশ্য বিবেকানন্দের সমস্ত এবং অরবিন্দের কিছু রচনার বাংলা অনুবাদ হয়েছে। এঁদের মধ্যে বিবেকানন্দ বাংলায় 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', জগদীশচন্দ্র 'অব্যক্ত' এবং অরবিন্দ 'কারাকাহিনী' ও 'গীতার ভূমিকা' লিখে বিশেষ ভাবেই প্রমাণ করেছেন যে, বাংলা লেখার ক্ষমতা তাঁদের কম ছিল না। বিপিনচন্দ্র কিন্তু প্রচুর বাংলাও লিখেছেন এবং বাংলা ভাষার একজন বিশিষ্ট গদ্য লেখক বলে তাঁর প্রতিষ্ঠাও আছে। 'চরিত্রকথা', 'জেলের খাতা', 'সত্যমিথ্যা' প্রভৃতি অযত্নলিখিত কয়েকখানি বইয়ে এবং অসংখ্য অসংগৃহীত প্রবন্ধে তাঁর মনীষা, চিন্তাশীলতা ও লিপি-চাতুর্যের যে পরিচয় পাই, তাতে একথা

অসঙ্কোচেই বলতে পারি যে, সাহিত্যসেবায় অধিকতর মনোনিবেশ না করে দেশকে তিনি বঞ্চিতই করেছেন।

পরবর্তীদের মধ্যে রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের 'দরিদ্রের ক্রন্দন', 'বাঙালী ও বাংলা', সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের 'দার্শনিকী', 'রবিদীপিতা', গিরীন্দ্রশেখর বসুর 'স্বপ্ন', সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'বাংলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা', 'জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য', মহেন্দ্রনাথ সরকারের 'উপনিষদের আলো' প্রভৃতি বই এবং সাময়িক পত্রে প্রকাশিত মেঘনাদ সাহা, সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতির কয়েকটি প্রবন্ধ ছাড়া আধুনিক পণ্ডিতদের বাংলা রচনার কোন উল্লেখযোগ্য নিদর্শন চোখে পড়ে না। একমাত্র বিনয়কুমার সরকার বাংলা লেখাকে কোনদিন উপেক্ষা করেন নি। 'ভাবী সমাজের ভিত্তি', 'নয়া বাংলার গোড়াপত্তন', 'বাড়তির পথে বাঙালী', 'রবীন্দ্রসাহিত্যে ভারতের বাণী' প্রভৃতি বইয়ে তিনি বহু প্রয়োজনীয় তথ্য বাঙালী পাঠকের সামনে উপস্থিত করেছেন তাঁর চিন্তাশীলতা ও স্বাজাত্যবোধের নিদর্শন হিসাবে।

অবশ্য এই সমস্ত রচনার বেশির ভাগই সাহিত্যের সামানার বাইরে। কিন্তু সাহিত্যের প্রাণ-শক্তি, তার চিন্তা-সম্পদ ও প্রকাশ-ভঙ্গি পরিপুষ্টি লাভ করে তার পেছনে বৈদগ্ধ্যের একটি বলিষ্ঠ পটভূমি থাকলেই, যা না থাকায় বাংলা গদ্য আজো ফরাসী বা ইংরেজীর মতো শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়াতে সমর্থ হয় নি। বাংলা ভাষায় যে আজো দর্শন, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সাহিত্য, শিল্পতত্ত্ব, ইতিহাস ইত্যাদি নিয়ে চূড়ান্ত আলোচনা করার উপযোগী ধারণা-শক্তি ও পরিভাষা জন্মায় নি, তার কারণ কি এই নয় যে, ভাষার সমুন্নতিতে আমরা বিশেষ মন দিই নি? দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, শশাঙ্কমোহন সেন, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, দুর্গাদাস লাহিড়ী প্রভৃতির পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ এই ভাষায় লেখা সম্ভব হয়েছে, এতেই কি প্রমাণ হয় না যে, বাংলা ভাষাও ইংরেজী বা ফরাসীর মতোই শক্তিমান হতে পারে?

আধুনিক গদ্যলেখকরা

প্রমথ চৌধুরীর পরে বা সঙ্গে আর যাঁরা গদ্য লিখে খ্যাত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে অতুলচন্দ্র গুপ্ত, নলিনীকান্ত গুপ্ত, অজিতকুমার চক্রবর্তী, মোহিতলাল মজুমদার, সুরেশ চক্রবর্তী, দিলীপকুমার রায়, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম দেশে সুপরিচিত। এঁদের মধ্যে অতুল গুপ্তের রচনা-ভঙ্গি বেশ

প্রসন্ন, 'কাব্যজিজ্ঞাসা'র মতো তাত্ত্বিক বইও সেই জন্যে তাঁর হাতে এতখানি সরস হয়েছে। নলিনীকান্তের লেখায় পারিভাষিক দুরূহতার সঙ্গে পাণ্ডিত্যের ঘনঘটা মিশে, তাতে বেশ একটু কৃত্রিমতার সৃষ্টি হয়েছে। 'সাহিত্যিকা' বই সেই জন্যে সুচিন্তাপূর্ণ হয়েও সুখপাঠ্য হয় নি। সুরেশ চক্রবর্তীর লেখায় ঝাল-নুনের পরিমাণ বেশী, প্যাঁচোয়া উক্তির ও শব্দ-ক্রীড়ার কলাকৌশলে তিনি হুবহু প্রমথ চৌধুরীর শিষ্য। তাঁর 'হসন্তের পত্র' সত্যিই খুব মনোজ্ঞ রচনা। ধূর্জটিপ্রসাদ সুপণ্ডিত এবং তাঁর পাণ্ডিত্যের পরিধিও ব্যাপক, কিন্তু ভাষা তাঁর হাতে যেন কেমন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে। তাঁর চিন্তায় ঠিক সেই জাতের ক্রমানুবন্ধও পাওয়া যায় না, যা সুরচনার পক্ষে অপরিহার্য। তাঁর 'চিন্তয়সি', 'আমরা ও তাঁহারা' ইত্যাদি বইয়ের এক সময় অবশ্য সুনাম ছিল। দিলীপকুমারের ভাষা মিষ্টি, তাঁর দৃষ্টি এবং মননশক্তিও গভীর। কতকগুলি বাতিক এবং মুদ্রাদোষ থাকলেও তিনি নিঃসন্দেহে একজন উচ্চাঙ্গের প্রবন্ধকার। তাঁর 'তীর্থঙ্কর' বইকে ইথেল ম্যানিন বা লিটন স্ট্র্যাচীর এই জাতের লেখার সঙ্গে অনায়াসে এক পর্যায়ভুক্ত করা যেতে পারে। তাঁর 'ভ্রাম্যমাণ'ও চমৎকার স্মৃতিচিত্র।

আধুনিক দলের নামী লেখক যাঁরা, তাঁরা সবাই গল্প-উপন্যাস, নয়ত কবিতা লিখেছেন, প্রবন্ধ প্রায় কেউই লেখেন নি। যা মুষ্টিমেয় প্রবন্ধ এই সময়ের ভেতর লেখা হয়েছে, তার ইতিহাস খুব সংক্ষিপ্ত। বলা বাহুল্য, এখানে নিছক সাহিত্যিক প্রবন্ধের কথাই বলা হচ্ছে। অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'পথে প্রবাসে', 'তারুণ্য', বুদ্ধদেব বসুর 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি', প্রবোধকুমার সান্যালের 'অরণ্যপথ', 'মহাপ্রস্থানের পথে' ছাড়া সত্যি জাতের প্রবন্ধ আর বিশেষ কিছু নেই। এঁরা সকলেই, বিশেষ করে প্রথম তিন জন কথাসাহিত্য রচনা করে অধিকতর খ্যাতিমান হয়েছেন। যদিও ব্যক্তিক অনুভূতি ও চিন্তার, দর্শন ও অভিজ্ঞতার সঞ্চয় ভাঙিয়ে হাল্কা হাতে লেখা প্রবন্ধেই এঁদের লিখন-শক্তির পূর্ণতর বিকাশ হয়েছে। শিবরাম চক্রবর্তীর 'আজ ও আগামী কাল', প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়ের 'মেজদার ডায়েরী', মহেন্দ্র রায়ের মেটাবলিজ্ম সম্বন্ধীয় রচনাবলী বা 'কিশলয়' এবং মজতুবা আলীর 'দেশে-বিদেশে'ও আধুনিক প্রবন্ধ সাহিত্যে সম্মানের আসন পাবার যোগ্য।

বিধুশেখর শাস্ত্রী, ক্ষিতিমোহন সেন, যোগেশ রায় বিদ্যানিধি, অর্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সুশীলকুমার দে, সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত,

সুকুমার সেন, নীহাররঞ্জন রায়, সুশোভন সরকার, প্রমথনাথ বিশী, শশিভূষণ দাশগুপ্ত প্রমুখ অধ্যাপকেরা ইতিহাস, সাহিত্য, শিল্পতত্ত্ব ও ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান বই লিখেছেন। বিশুদ্ধ সাহিত্যের শ্রেণীভুক্ত নয় বলে তাব আলোচনা এখানে করা হল না। জবাসন্ধ, যাযাবর, ইন্দ্রজিৎ, নীলকণ্ঠ, কালপেঁচা, রঞ্জন, রূপদর্শী প্রভৃতির ছদ্মনামে যে সমস্ত লঘু নিবন্ধ বা রম্য রচনা প্রকাশিত হয়েছে, সুখপাঠ্য হলেও তা প্রধানত সাময়িক রচনা। সার্থক ও সময়াতিক্রান্ত সাহিত্য সৃষ্টি করে যশস্বী হবেন এঁরা, এ আশাই করেন সবাই।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সাময়িক পত্র

খৃষ্টান পাদ্রীদের উদ্যোগে বাংলা ভাষায় প্রথম গদ্য লেখা সুরু হয়েছিল, একথা আমরা আগেই বলেছি। পাদ্রীরা চেয়েছিলেন দেশের লোককে শিক্ষায় সংস্কৃতিতে উন্নত করে নিয়ে, তাঁদের খৃষ্টধর্মের প্রতি আকর্ষণ করতে। কিন্তু দেশের চিন্তাধারা এ থেকে আপন মুক্তির পথ খুঁজে পেল। তাঁদের প্রতিষ্ঠিত প্রথম সাময়িক পত্র 'সমাচারদর্পণে'র আদর্শেই রামমোহন রায়, ঈশ্বর গুপ্ত, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্র ঠাকুর প্রমুখ নেতারা পরে সাময়িক পত্রের ভেতর দিয়ে এক দিকে সমাজ ও ধর্মসংস্কারে, অন্য দিকে জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচারে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

আমাদের এই পুরানো সমাজ ও ধর্মে যুগার্জিত যে সমস্ত কুসংস্কার ও কদাচার জমেছিল, তা দূর করায় এবং বাংলা গদ্যকে আমাদের প্রাত্যহিক প্রয়োজনের উপযোগী করে গড়ে তোলায়, 'সম্বাদকৌমুদী', 'প্রভাকর', 'তত্ত্ববোধিনী' প্রভৃতি যে কাজ করেছে তা অসামান্য। তারপর বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শনে' এক সঙ্গে এল সাহিত্য এবং স্বাদেশিকতা। এই সময় থেকেই সাহিত্যপত্র এবং সংবাদপত্র আলাদা হয়ে গেল, গোড়াতে যা ছিল এক। বঙ্কিম-সমসাময়িক ও পরবর্তী সাহিত্য-পত্রিকার মধ্যে 'বান্ধব', 'আর্যদর্শন', 'সাহিত্য', 'ভারতী' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। আর সংবাদপত্রের মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য 'সোমপ্রকাশ', 'বঙ্গবাসী', 'হিতবাদী', 'সঞ্জীবনী', 'বসুমতী'।

স্বদেশী আন্দোলন এবং পরে গান্ধী-আন্দোলন থেকে এদেশে রাজনৈতিক সাংবাদিকতা সবিশেষ পুষ্টি লাভ করে, আর তার ফলেই সংবাদপত্র লাভজনক ব্যবসা হয়ে দাঁড়ায়। বিশ্ব-সংস্কৃতির সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য-পত্রিকারও উন্নতি হতে থাকে। 'প্রবাসী', 'সবুজপত্র', 'কল্লোল', সেই উন্নতির একদিকের উদাহরণ, আর একদিকের উদাহরণ 'আনন্দবাজার', 'বঙ্গবাণী', 'যুগান্তর'। এখনো পর্যন্ত আমরা মোটের ওপর এই আবহাওয়ার মধ্যেই রয়েছি।

সমাচারদর্পণ

বাংলা গদ্য সাহিত্যের আলোচনা আমরা শেষ করেছি। এই আলোচনা থেকে একটা প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে রাখা হয়েছিল, পৃথক ভাবে আলোচনা করবার জন্যে। সে প্রসঙ্গটি হল বাংলা গদ্যের উৎপত্তি ও ক্রম-পরিণতির মূলে বাংলা সাময়িক পত্রের দানের কথা। গোড়াতেই দেখিয়েছি যে, বাংলা গদ্যের জন্ম শ্রীরামপুরের পাদ্রীদের হাতে এবং 'সমাচারদর্পণ' হল বাংলা সাময়িক পত্রের প্রথম স্মরণীয় নিদর্শন। এই আদি পত্রিকা থেকে একেবারে আজ পর্যন্ত, প্রধানত সাময়িক পত্রের অয়নকে কেন্দ্র করেই বাংলা গদ্য নানা রূপান্তরের ভেতর দিয়ে তার আধুনিক উন্নত অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। এর পেছনে পৃথক পৃথক ভাবে নানা প্রতিভাধর লেখকের একক দান আছে ঠিকই, কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশী রয়েছে সাময়িক পত্রের ছোট-বড় ভালো-মন্দ অজস্র লেখকের সম্মিলিত দান।

উল্লেখযোগ্য বাংলা সাময়িক পত্রগুলির প্রত্যেকটিই কোন-না-কোন বিশিষ্ট সাহিত্যিকের সম্পাদনায় বের হত। সাহিত্যের ইতিহাসে এই সমস্ত সম্পাদক-সাহিত্যিক অনেকে সম্মানের আসন লাভ করেছেন। কিন্তু তাঁদের প্রতিভা বেষ্টন করে ছোট-বড়-মাঝারি আর যে সমস্ত লেখক উঠেছেন, তাঁদের পৃথক কোন স্বীকৃতির দাবী না থাকলেও সমগ্র ভাবে তাঁদের দানও উপেক্ষার নয়। প্রতিভাধর এক-এক যুগে একটি-দুটির বেশি জন্মান না। তাঁরা আসেন নূতনের বার্তা নিয়ে, যা পুরানো, যা প্রাত্যহিক, যা অভ্যাসমলিন, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বাণী নিয়ে। কাজেই প্রচলিত সমাজ হঠাৎ তাঁদের চিনতে পারে না, সহ্য করতেও পারে না। তখন তাঁদের আশে পাশে সাধারণ লেখক যাঁরা জড়ো হন, তাঁরাই নূতন যুগের বাণীকে সাধারণ্যে প্রচার করে যুগের সঙ্গে জন-মনের সংযোগ ঘটিয়ে থাকেন। এক যুগ থেকে আর এক যুগে, ভাবে, কর্মে, দৃষ্টিতে মানুষের যে স্বাভাবিক বিবর্তন, তার বীজ থাকে ভাব-নায়কদের চিন্তায়, কিন্তু বিস্তার নির্ভর করে সাধারণ কর্মীদের কৃতিত্বের ওপর। আর সব ক্ষেত্রের মতো সাহিত্যক্ষেত্রেও এই নিয়ম। কিন্তু সময় চলে যাবার পর প্রতিভাই বাঁচে, তার প্রচারকরা যান লুপ্ত হয়ে। পুরাতন সাময়িক পত্রের ফাইল ঘাঁটলেই তাঁদের অনেকের দেখা মেলে।

আগেই বলা হয়েছে, ইংরেজ আমলে দেশের লোককে পাশ্চাত্য জ্ঞান-

বিজ্ঞানে ওয়াকিবহাল এবং পাশ্চাত্য চিন্তা-ধারায় অনুপ্রাণিত করে, অজ্ঞাতসারে খৃষ্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করবার জন্যেই এ দেশে পাদ্রী-পণ্ডিতরা কলেজ বসিয়েছিলেন, সংবাদপত্র প্রকাশ করেছিলেন, বাংলা বই-পুঁথি লিখিয়েছিলেন। খৃষ্টানুরক্তি দেশে আশানুরূপ বাড়ে নি। কিন্তু পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে এ দেশের সংস্কৃতি নাড়া পেয়ে জেগে উঠেছিল। আমাদের সংস্কৃতি তখন ক্ষয়ের মুখে, দেশে তখন জমা হয়েছে ঘোরতর অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের কালো মেঘ। সেই জনচেতনাহীন নিস্তরঙ্গ আবহাওয়া ইংরেজী শিক্ষার প্রথম ধাক্কায় ঘুলিয়ে উঠল।

দেশবাসী একটানা জীবনযাপনের পথে টক্কর খেয়ে জেগে উঠে দেখলেন, সময় এগিয়েছে, তার সঙ্গে তাল রেখে তাঁরা এগোন নি। তখন সুরু হল পুরানোকে ভাঙা এবং নূতন করে তাকে গড়ে নেওয়া। সতীদাহ-নিবারণ, বহুবিবাহ-নিবারণ, বিধবাবিবাহ-প্রবর্তন, স্ত্রী শিক্ষা-প্রচার, দু-পাতা মুগ্ধবোধ, দু-কলি হাফেজের বয়েত আর রঘুর দুটি শ্লোক মুখস্থ করা ছেড়ে, দেশ-বিদেশের দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও ইতিহাস-মন্থন। অর্থাৎ এক কথায় যাকে বলা যাবে আধুনিকতা, তার সূচনা হল। শ্রীরামপুরের পাদ্রীরা, হিন্দু কলেজের স্থাপয়িতারা, ব্রাহ্ম-সমাজের উদ্যোক্তারা, সকলেই এদিক থেকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

যে সমস্ত নাম এই প্রসঙ্গে সকলের আগে মনে পড়ে, রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, আজকের বাঙালী সংস্কৃতি তাঁদের সকলের কাছেই অশেষ ঋণী। তাঁরা ও তাঁদের অগণ্য সহযোগীরা সেদিন দেশকে নবজীবনের সন্ধান দিয়েছিলেন। শুধু যে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির হাওয়াই তাঁরা দেশে বয়ে এনেছিলেন, বহিঃপৃথিবীর বিস্তৃত আকাশে দেশের বিমূঢ় দৃষ্টিকে অবারিত করে দিয়েছিলেন, তা নয়। দেশের যা ভালো, যা সত্য, যা মহৎ, তাকেও সময়োচিত আদর্শে সঞ্জীবিত এবং সংস্কৃত করে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

সতীদাহ-নিবারণে রামমোহন এবং বিধবাবিবাহ-প্রবর্তনে বিদ্যাসাগর হিন্দু সমাজ নীতির মহত্তর আদর্শই অনুসরণ করেছিলেন। বৈষ্ণবতার নামে কিশোরীভজন, তান্ত্রিকতার নামে বামাচার, পশুবলি, মদ্যপান এবং ধর্মাচরণের নামে আরো বিবিধ যথেচ্ছাচার তাড়িয়ে এবং পরব্রহ্মের উপাসনা প্রবর্তন করে রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র সেন হিন্দুধর্মের মূলতত্ত্বকেই প্রতিষ্ঠিত

করেছিলেন। সমাজ ও ধর্মে এই যে নানামুখী সংস্কার, এর অনেকটাই সম্ভবপর হয়েছিল সাময়িক পত্রিকার সাহায্যে।

সম্বাদকৌমুদী ও প্রভাকর

পাদ্রী-পণ্ডিতদের কাগজের উল্লেখ আগেই করেছি। এর পর উল্লেখযোগ্য রামমোহনের 'সম্বাদকৌমুদী', ঈশ্বরগুপ্তের 'সংবাদপ্রভাকর' এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'তত্ত্ববোধিনী'। 'সমাচারদর্পণ', 'সম্বাদকৌমুদী' এবং 'প্রভাকর' ছিল একাধারে সংবাদপত্র ও সাহিত্যপত্র। সমসাময়িক সংবাদের সঙ্গেই এগুলিতে ইতিহাস, বিজ্ঞান এবং শিক্ষা-সম্বন্ধীয় নানা প্রবন্ধ বের হত। তাছাড়া অনেক সুখপাঠ্য ও কৌতুকপ্রদ পত্র এবং শিক্ষা, সমাজ, ধর্ম ও সামাজিক ক্রিয়া-কর্ম সম্বন্ধে নানা জনের আলাপ-আলোচনা, বিচার-বিতর্ক ইত্যাদি থাকত। সম্বাদকৌমুদীতে আবার ভূগোল, জ্যোতিষ, বিজ্ঞান, এমন কি ব্যাকরণ-বিষয়ক প্রবন্ধও থাকত এবং তার বেশির ভাগ লিখতেন স্বয়ং রামমোহন। তত্ত্ববোধিনী ছিল খাঁটি জাতের সাহিত্যপত্রিকা, আর অক্ষয় দত্ত ছিলেন এর সম্পাদক। এতে অক্ষয় দত্তের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, বিদ্যাসাগরের মহাভারত-অনুবাদ, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বেদান্তধর্ম-ব্যাখ্যান, অযোধ্যানাথ পাকড়াশীর বক্তৃতা, বহু উল্লেখযোগ্য রচনা বের হত।

স্কুল-কলেজে মুষ্টিমেয় শহুরে লোক শিক্ষা পেতেন, কিন্তু দেশের জন-মনে নব সংস্কৃতির প্রভাব সঞ্চারিত করায় এই কাগজগুলিই সেদিন করেছিল সব চেয়ে বেশী সহায়তা। তখন গদ্যের অবস্থাই বা কি ছিল? কোন রকমে কষ্টে-সৃষ্টে বক্তব্য বিষয় পাঠকের গোচরে আনতেই তার প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠত। ভাষার সেই শৈশব অবস্থাতেই এদেশের সাময়িক পত্র যে সব গুরু বিষয় নিয়ে আলোচনায় অবতীর্ণ হয়েছিল, তা ভাবলে অবাক হতে হয়।

পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে একেশ্বরবাদ-প্রচার, বিশুদ্ধ বৈদান্তিক আদর্শে ধর্মসংস্কার, স্ত্রী-শিক্ষা, স্ত্রী-স্বাধীনতা ও নারীর উত্তরাধিকার-প্রতিষ্ঠা, স্মার্ত পণ্ডিতদের বিধি-বিধান খণ্ডন করে বিধবা দহন নিষেধ এবং তার পুনর্বিবাহ-প্রবর্তন, বাংলা বর্ণমালার উচ্ছেদ করে তার স্থানে রোমান লিপি চলিত করার আবশ্যকতা, এক কথায় আজকের সংবাদপত্রের আলোচনীয় যাবতীয় বিষয়ই সেদিন লেখকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং তাঁরা সে সমস্ত বিষয় নিয়ে তাঁদের মতো করে বিচার-বিশ্লেষণও করেছিলেন। এই সঙ্গে দেশ-

বিদেশের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ধ্যান-ধারণাকে যতটা সম্ভব দেশের মাটিতে পত্তনও করেছিলেন তাঁরা। কতক অনুবাদ করেছিলেন, কতক বা অনুসরণ করে লিখেছিলেন। এই সমস্ত রচনার কিছু অংশ পরে বই আকারে গ্রথিত হয়েছে, কিন্তু বেশির ভাগই গেছে লুপ্ত হয়ে। 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' বইয়ে এই সব লেখার কিছু কিছু নিদর্শন দেখতে পাওয়া যাবে।

আগেই বলেছি যে, এই সব পত্রিকা একাধারে সংবাদপত্র এবং সাহিত্য-পত্র ছিল। সেই জন্যে সমসাময়িক ব্যক্তিদের কার্য-কলাপ সম্বন্ধে এগুলিতে সময় সময় অতি তীব্র সমালোচনা বের হত। সে সমালোচনা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ধরত কদর্য আক্রমণের রূপ। রামমোহন রায়ের বিলাতযাত্রা অথবা তাঁর মুসলমানী-বিবাহ নিয়ে যে সমস্ত উতোর কাটাকাটি হয়েছিল, তা পড়লে আজ গা বমিবমি করে। বিধবাবিবাহ নিয়ে যে সমস্ত খিস্তি-খেউড় চলেছিল তা-ও সমান জঘন্য! গুড়গুড়ে ভট্টাচার্যির 'রসরাজে' আর ঈশ্বর গুপ্তের 'প্রভাকরে' যে সমস্ত বাদ-বিবাদ চলত, তার সম্বন্ধে রাজনারায়ণ বসুর মন্তব্য প্রণিধান-যোগ্য। তিনি বলেছেন, দুটি মেথরে যদি রাজপথে ঝগড়া বাধে এবং সেই ঝগড়ার মুখে তারা পরস্পরের গায়ে যদি স্ব স্ব হাঁড়ির বিষ্ঠা নিক্ষেপ করে, তাহলে যা হয়, এদের ঝগড়া হত সেই রকম। দুঃখের বিষয়, সাময়িক পত্রিকার জগতে এই মেথরামি আজো কিছুটা আছে।

সাহিত্যপত্র

দ্বিতীয় পর্বে যে সব সাময়িক পত্র উল্লেখযোগ্য, তার মধ্যে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'বিবিধার্থসংগ্রহ', টেকচাঁদের (প্যারীচাঁদ মিত্রের) 'মাসিক পত্র', ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'এডুকেশন গেজেট', বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন', যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের 'সোমপ্রকাশ', দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ভারতী', অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 'সাধারণী', কালীপ্রসন্ন ঘোষের 'বান্ধব' ইত্যাদির নাম অনেকে জানেন। এর ভেতর এডুকেশন গেজেট এবং সোমপ্রকাশ ছাড়া আর সবগুলিই মাসিকপত্র এবং সবগুলিই পুরোপুরি সাহিত্যপত্র। সাংবাদিকতা আর সাহিত্যিকতা এই সময় থেকে দুটো আলাদা জাতের জিনিস বলে গণ্য হয়ে আসছে।

বিগত শতাব্দীর ইতিহাস হল বাংলা দেশের পক্ষে সুদীর্ঘ একটা সমাজ-বিপ্লবের ইতিহাস। যে সমস্ত সংস্কার আধুনিক বাংলাকে প্রাচীন বাংলা থেকে

স্বতন্ত্র করেছে এবং এ যুগের ইতিহাসকে তার নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যে অভিষিক্ত করেছে, তাদের জন্ম বিগত শতাব্দীতেই। মধ্যযুগীয় বাংলায় বিবিধ অভ্যাসের দৌরাত্ম্য কি প্রবল ছিল এবং তা থেকে মুক্ত করে দেশকে আধুনিকতার পথে আনতে বিগত শতাব্দীর সংস্কারকদের কি কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে, তা ভাবলে অবাক হতে হয়। যুগোচিত সংস্কার দেশের মর্মস্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত করার কাজে সেদিন তাঁদের সাময়িক পত্র ছাড়া অন্য কোন সহায়ক ছিল না। দেশের আবহাওয়ায় নূতন যুগের বাণী পৌঁছে দেওয়া ও পুরাতনের দোষ-ত্রুটি সম্বন্ধে চেতনা সঞ্চার করার কাজে বিভিন্ন সাময়িকপত্র যা করেছে, তার পরিচয় আগেই দিয়েছি। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। এক দিকে যেমন সামাজিক ও নৈতিক জীবনকে এই ভাবে ঢেলে সাজা চলেছে, অন্যদিকে তেমনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা জ্ঞাতব্য তথ্য বাংলা ভাষায় পরিবেশণ করে দেশের সাংস্কৃতিক জীবনকে আধুনিকতার সন্ধানও দেওয়া হয়েছে।

তত্ত্বোধিনী ও বিবিধার্থসংগ্রহ

ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদপ্রভাকর' আর একটা বড় কাজ করেছে। পুরাতন কবিদের কবিতা এবং জীবন-বৃত্তান্ত এতে সংগৃহীত ও প্রকাশিত হত, আবার নবীন লেখকদের উৎসাহ দেওয়ার জন্যে তাঁদের রচনাসমূহও মুদ্রিত হত। পরবর্তী কালের বড় লেখক যাঁরা, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ অধিকারী, সকলেরই হাতে-খড়ি 'প্রভাকরে'। 'তত্ত্বোধিনী'তে যেমন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, বিদ্যাসাগর প্রমুখ পণ্ডিতদের হাত দিয়ে দেশে বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার আবহাওয়া তৈরী হচ্ছিল, 'প্রভাকরে'র লেখকদের হাত দিয়ে তেমনি তৈরী হচ্ছিল ভাবী সাহিত্যের আবহাওয়া। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'বিবিধার্থসংগ্রহে' সাহিত্য এবং সংস্কৃতির রূপ অধিকতর স্পষ্টতা লাভ করল। বলে রাখা দরকার যে, বিবিধার্থ-ই বাংলা ভাষায় প্রথম সাহিত্য-সমালোচনা প্রবর্তন করেছিল। সুপণ্ডিত রাজেন্দ্রলাল সাহিত্য, ইতিহাস এবং পুরাবৃত্ত সম্বন্ধে একাই বহু প্রবন্ধ লিখতেন এতে। এর অন্যতম লেখক ছিলেন মাইকেল মধুসূদন। তাঁর 'তিলোত্তমা-সম্ভব' এতে বেরিয়েছিল।

বঙ্গদর্শন

এর পর বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শন'। বঙ্গদর্শনেই বাংলা সাহিত্য তার পূর্ণ বয়সে এসে পৌঁছুল। বাংলা গদ্যের প্রাথমিক অবস্থায় সমাজ ও ধর্ম-সংস্কার এবং সংস্কৃতি-বিস্তারের ব্রত পালন করতে পূর্ববর্তী পত্রিকাগুলোকে প্রচুর মেহনত করতে হয়েছিল। ভাষার অপূর্ণতাই অবশ্য এই মেহনতের প্রধান কারণ। কিন্তু তাঁদের সম্মিলিত সাধনা ব্যর্থ হয় নি, তাঁদের তৈরী রাস্তা দিয়েই বঙ্গদর্শনের রাজরথ সবেগে বয়ে চলেছে। বিশুদ্ধ জাতের সাহিত্য-সৃষ্টির এবং উন্নততর সংস্কৃতি-বিতরণের কাজে বঙ্কিমের যে কৃতিত্ব, তার মূলে আছে এঁদের এই প্রাথমিক প্রচেষ্টা। বঙ্গদর্শনকে কেন্দ্র করে হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি কবি এবং কালীপ্রসন্ন ঘোষ, চন্দ্রনাথ বসু, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রমুখ গদ্যলেখক দেখা দিয়েছিলেন, এ-ও তার একটি সৌভাগ্য। বঙ্গদর্শন থেকেই দেশে প্রথম স্বাদেশিকতারও সূচনা। এর আগের পর্ব গেছে সামাজিক সমস্যার সমাধান নিয়ে, এবার এল রাজনৈতিক সমস্যা এবং এদিক থেকে দেশে প্রথম চেতনা-সঞ্চারের দাবী প্রধানত বঙ্কিমের।

বঙ্কিম-সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ লেখকদের অনেকেরই নিজের নিজের কাগজ ছিল। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'এডুকেশন গেজেট', কালীপ্রসন্ন ঘোষের 'বান্ধব', অক্ষয় সরকারের 'সাধারণী', চন্দ্রশেখরের 'উপাসনা' ছিল তখনকার জনপ্রিয় কাগজ। এঁদের ভালো লেখা যা-কিছু, সমস্তই প্রথমে এঁদের নিজের নিজের কাগজে বেরিয়েছিল। এই কাগজগুলি সম্মিলিত ভাবে দেশের চিত্ত ও চিন্তা-ধারাকে সর্বপ্রথম যুগের হাওয়ায় সজাগ করে তোলে। জ্ঞান-বিজ্ঞানে আধুনিক ভারতে বাঙালী যে সর্বপ্রথম জেগেছিল, তা সম্ভব হয়েছিল শুধু এই কাগজ-গুলির বহুল প্রচারের ফলে। আগাছা তুলে নূতন বীজের পত্তন আগেই সুরু হয়েছিল, এত দিনে দেখা দিল সত্যিকার শস্যসম্পদ।

নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, বঙ্গদর্শনের যুগ ভাবে ভাষায় এতখানি সম্পদের উত্তরাধিকার না রেখে গেলে, পরবর্তী রবীন্দ্র-যুগ এতটা ঐশ্বর্যশালী এত সহজেই হত না! পৃথক পৃথক ভাবে এ যুগের লেখকদের মূল্য যাই হক, একযোগে তাঁরাই যে বাংলা সংস্কৃতিকে তার আধুনিক সম্ভাবনীয়তার পথে এগিয়ে দিয়েছেন, একথা অনস্বীকার্য। ঠাকুরবাড়ীর 'ভারতীর' নামও এই

সঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বঙ্কিম-যুগের শেষাশেষি ও রবীন্দ্র-যুগের সূচনায় এই মাসিক পত্রটি অববাহিকার মতো থেকে দুটি যুগকে গ্রন্থিবদ্ধ করেছে।

সংবাদপত্র

প্রথম আমলের সাময়িক পত্রগুলি ছিল একাধারে সংবাদপত্র ও সাহিত্যপত্র। বঙ্কিম-যুগে এসে ওরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। তখন থেকে সংবাদপত্র চলে গেল সাহিত্যের এলাকার বাইরে এবং রাষ্ট্র, সমাজ ও শিক্ষার সাম্প্রতিক আলোচনাই হল তার একমাত্র কাজ। আর সাহিত্যপত্র নিল রসসৃষ্টি এবং সংস্কৃতি-বিস্তারের ব্রত।

গত শতাব্দীর সংবাদপত্রগুলির মধ্যে 'সোমপ্রকাশ', 'সঞ্জীবনী', 'বঙ্গবাসী', 'হিতবাদী', 'বসুমতী' প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আসামে চা-কুলির দুর্দশা-নিবারণে সঞ্জীবনীর আন্দোলন বিশেষ সাফল্য লাভ করেছিল। আর বঙ্গবাসীর সম্পাদকই বোধ হয় সর্বপ্রথম রাজ-দ্রোহের অপরাধে কারাদণ্ড ভোগ করেন। বঙ্গবাসীতে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পঞ্চানন্দ' এবং হিতবাদীতে যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'বৃদ্ধের বচন' তখনকার সমাজে বিশেষ আদৃত ছিল।

পাশ্চাত্য সাহিত্য ও সংস্কৃতির অনুশীলন দেশে যত প্রসার লাভ করতে লাগল, ততই দেশবাসীর ভেতর আত্মশুদ্ধির তাগিদ স্পষ্টতর হয়ে উঠতে লাগল। প্রথমত এল সমাজ ও ধর্ম-সংস্কারের দিকটা। সেটা ক্রমশ পিছিয়ে যাবার পর এল রাজনৈতিক আন্দোলন। পরের পর এই দুটি ধাপই দেশ অতিক্রম করতে পেরেছিল এত তাড়াতাড়ি, তার কারণ দেশে সাময়িক-পত্রের বিস্তার উত্তরোত্তর বিশেষ ব্যাপক হয়ে চলেছিল। হতে পারে, দেশের বর্ধনশীল মন আত্মপ্রকাশের উদ্দামতায় চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল বলেই সাংবাদিকতা এমন দ্রুত উন্নতির পথে চলছিল। অথবা সাংবাদিকতা এত দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছিল বলেই দেশ তার সঙ্গে তাল রেখে চলছিল!

এই সঙ্গে অবশ্য মুদ্রাযন্ত্রের ক্রমোন্নতির প্রসঙ্গটা ভাববার আছে, আর আছে খবরাখবর-লেন-দেন-ব্যবস্থার উত্তরোত্তর উন্নতির প্রসঙ্গ। খবর-বিক্রয়ের এজেন্সি, টেলিগ্রাফ, বেতার বার্তা, অনেক কিছুই আজ সাংবাদিকতাকে এতটা প্রসারিত হবার সুবিধা দিয়েছে। কিন্তু যেদিন এসব ছিল না, অথচ সংবাদপত্র চালাতে হত, সেদিন সাংবাদিকদের অসুবিধা কত বেশী ছিল,

তা সহজেই অনুমেয়। সেদিন তাই সাপ্তাহিক ছাড়া আর যে কোনরকম কাগজই ছিল অভাব্য। আশ্চর্যের বিষয়, তা সত্ত্বেও বাংলাদেশের অগ্রগামী মন বাধা পায় নি! ঈশ্বর গুপ্ত অল্প কিছুদিন দৈনিক প্রভাকরও বের করেছিলেন।

স্বদেশী আন্দোলন

সাংবাদিকতার প্রকৃত উন্নতি স্বদেশী আন্দোলন থেকে। যেদিন স্বাধীনতা, সমানাধিকার ও আত্মমর্যাদা-বোধের বাণী নিয়ে দেখা দিলেন বঙ্কিম সেই দিন থেকেই ইঙ্গ-ভারতে জাতীয় জাগরণের সুরু। সেই শুভ সূচনাই দুই দশক পরে স্বদেশী আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। সেই আন্দোলনের ঢেউ 'বন্দে মাতরম্,' 'সন্ধ্যা,' 'যুগান্তর' নানা পত্রিকার ভেতর দিয়ে দেশের মর্মস্থানে এসে পৌঁছেছে। বাংলার সীমানা ছাড়িয়ে তা মহারাষ্ট্র, পঞ্জাব, গুজরাট, মাদ্রাজে ছড়িয়ে পড়েছে।

বাংলার রাজনৈতিক সাংবাদিকতা যা, তার জন্ম এইখানে। কিন্তু তখনো পর্যন্ত রাজনীতি-চর্চা সীমাবদ্ধ ছিল শিক্ষিত সমাজের মধ্যে। তাই ইংরেজীই ছিল তার প্রধান বাহন। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' থেকে সুরু করে 'বেঙ্গলী,' 'ইণ্ডিয়ান মীরার,' 'অমৃতবাজার পত্রিকা' সেকালের প্রসিদ্ধ খবরের কাগজ সবই ছিল ইংরেজী। শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস পাল, নরেন্দ্রনাথ সেন, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, অরবিন্দ ঘোষ, শিশিরকুমার ঘোষ, মতিলাল ঘোষ, বাংলার সাংবাদিক ইতিহাসে যাঁদের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে আছে, দেশের রাজনৈতিক চেতনায় যাঁদের প্রভাব মৃত-সঞ্জীবনীর কাজ করেছে, তাঁরা কেউ বাংলা লেখেন নি।

তবে সৌভাগ্য এই যে, দ্বারিকানাথ বিদ্যাভূষণ, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, কৃষ্ণকুমার মিত্র, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিরা সেদিনই টের পেয়েছিলেন যে, বাংলা সাংবাদিকতাকে তফাতে রেখে বাংলা স্বাদেশিকতা সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। দেশের জন-মনে স্বাধীনতার প্রথম সাড়া এনেছিলেন এঁরাই এবং এদিক থেকে দেশ এঁদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

এর পর বাংলা সাংবাদিকতার ইতিহাসে দ্বিতীয় দফা জোয়ার এল অসহযোগ আন্দোলনের সময়। কিন্তু সে ইতিহাস মাত্র সেদিনের, তাই

তার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। প্রথম মহাসমরের পর যেদিন আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষ স্বাধীনতা-অর্জনের জন্যে উদ্দাম হয়ে উঠেছিল, কারাগার, লাঞ্ছনা, অপমান, মৃত্যু, কোন কিছুতেই পেছপা হয় নি, সেদিন সংবাদপত্রই তাকে দিয়েছিল সেই সাহসের সঞ্চয়। যে সব সংবাদপত্র এই সময় মাথা তুলেছিল, তার মধ্যে দৈনিক 'আনন্দবাজার', 'বঙ্গবাণী' এবং সাপ্তাহিক 'আত্মশক্তি'র নামই বোধ করি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। সাংবাদিকের কারাদণ্ড, অর্থদণ্ড, নির্যাতন এর আগেও হয়েছে। কিন্তু এখন থেকে সেটা হয়ে দাঁড়াল নিত্যকার ব্যাপার এবং রাজ-রোষের উদ্যত দণ্ড মাথায় নিয়েই তাঁদের চলতে হল।

সংবাদপত্রের এই দ্রুত উন্নতির সঙ্গে তাল রেখে, সাহিত্য-পত্রিকাও একেবারে আজ পর্যন্ত লম্বা পায়ে এগিয়ে এসেছে। বঙ্কিম-যুগের শেষ এবং রবীন্দ্র-যুগের সূচনায় 'ভারতী'র আবির্ভাব হয়েছিল, একথা আগেই বলেছি। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও কিছুদিন 'বঙ্গদর্শনে'র সম্পাদনা করেছিলেন, তারপর প্রকাশ করেছিলেন 'সাধনা'।

সাহিত্য

নবপর্যায় বঙ্গদর্শন এবং সাধনা থেকেই দেশ ভালো করে এ-যুগের শ্রেষ্ঠ গল্প-লেখকদের সাক্ষাৎ পেল। এঁদের মধ্যে ছিলেন প্রিয়নাথ সেন, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, জগদীশচন্দ্র বসু, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রভৃতি। আর স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ত ছিলেনই। এই শক্তিশালী লেখকদের গোষ্ঠীপতি-রূপে কবি বাংলা গদ্যের প্রাণ-শক্তি যত বড় করে দিলেন, তার পর তা আর বিশেষ বেড়েছে কিনা সন্দেহ!

বিদ্যাসাগর-দৌহিত্র সুরেশ সমাজপতির 'সাহিত্য' পত্রিকা হিসাবে ভারতী ও বঙ্গদর্শনের পরই শ্রদ্ধার আসন দাবী করতে পারে। এর লেখকবর্গ যাঁরা, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, স্বয়ং সমাজপতি, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, দীনেন্দ্রকুমার রায় প্রভৃতি বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে স্থায়ী গৌরবের আসন লাভ করেছেন। রবীন্দ্র-গোষ্ঠী এবং সমাজপতি-গোষ্ঠী পরস্পর সমান্তরাল ভাবে সাহিত্য সৃষ্টি করে দর্শনে, বিজ্ঞানে, ইতিহাসে, রসতত্ত্বে, প্রবন্ধে নিবন্ধে, গল্পে উপন্যাসে, বাংলা গদ্যকে সর্বাঙ্গসম্পূর্ণতা দিয়েছেন।

দুই দলে মতদ্বৈধ যা-ই থাকুক, উভয় দলের সম্মিলিত সাধনায় বাংলা

গদ্য যে অসামান্য সাবলীলতা এবং শক্তি অর্জন করেছে, তা বলাই বাহুল্য এবং অপক্ষপাত সহজ দৃষ্টি নিয়ে বিচার করলে, এ কথা আজকের সমালোচককে স্বীকার করতেই হবে যে, বিরুদ্ধপন্থী বলে যাঁরা সেদিন দেশে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিলেন, রচনা-ভঙ্গি এবং চিন্তা-পদ্ধতির দিক থেকে তাঁরা আসলে রবীন্দ্রনাথকেই অনুসরণ করেছিলেন। এঁদের আসর জুড়িয়ে আসার পর রবীন্দ্র-যুগ সারা দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হল। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'প্রবাসী' হল সেই যুগাদর্শের সর্বশ্রেষ্ঠ মুখপত্র। এরই পাশে পাশে ক্ষীণস্রোতা 'যমুনা'র ভেতর দিয়ে শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব, সাময়িক পত্রের ইতিহাস সে এক দৈব ঘটনার মতো।

সবুজপত্র

রবীন্দ্র-যুগের মধ্যপর্বে সাময়িক সাহিত্যে আবার একটা বিপ্লবের হাওয়া এল প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্র' থেকে। এই বিপ্লবের প্রভাবটা প্রধানত বাইরের দিকে কাজ করেছে। সে হল সাহিত্যে কথ্যভাষার ব্যবহার, যা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু অন্তরের দিকেও এর প্রভাব একটা কাজ করেছে। তা বাংলা সাহিত্যের আসরে বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার অবতারণা করা, বুদ্ধিবিদগ্ধ আধুনিক মানুষের উপযোগী সাহিত্য রচনা করা। দুঃখের বিষয়. শেষ পর্যন্ত জিনিসটা হয়ে দাঁড়াল একটা দলগত আত্মম্ভরিতা-স্বরূপ।

কিন্তু প্রমথ চৌধুরী এটা বোধহয় চান নি। তিনি চেয়েছিলেন. ভাবালুতার উচ্ছেদ করে, যুক্তিসিদ্ধ অথচ জনপ্রিয় সাহিত্য সৃষ্টি করতেই। নইলে প্রচলিত সাধু ভাষার আড়ষ্টতাকে তিনি কখনই পরিহার করতেন না। কিন্তু দেশের বিদ্বৎসমাজ তাঁকে সঠিক বোঝেন নি। তাই 'সবুজপত্র'-গোষ্ঠীর প্রায় সকলেই ভালো লেখক হলেও কেউ বড় লেখক হন নি, অবশ্য প্রমথ চৌধুরী নিজে ছাড়া। 'সবুজপত্রের' পর 'কল্লোল', 'কালি-কলম' প্রভৃতির উল্লেখ না করলে এই আলোচনা সম্পূর্ণ হবে না। আধুনিক কালের শ্রেষ্ঠ লেখক যাঁরা, তাঁদের আবির্ভাব এই দুই পত্রিকায়। এর পর আর একমাত্র পত্রিকা 'পরিচয়', যার নামমাত্র উল্লেখ করেই এই আলোচনা শেষ হবে।

তৃতীয় অধ্যায়

কাব্য ও কবিতা

ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ এবং তাঁদের পরবর্তী গীতকারদের রচনা দিয়ে প্রাচীন যুগ শেষ হল। ঈশ্বর গুপ্ত থেকে সুরু হল নূতন যুগ। প্রাচীন যুগে সাহিত্যের এক মাত্র বাহন ছিল পদ্য। গল্প, কাহিনী, জীবনচরিত, তত্ত্ববিচার, সবই লেখা হত পদ্যে। প্রাচীন সাহিত্যের জাতি-গোত্রও ছিল অনেকটা একই ধরনের। তার সমস্ত শাখা-প্রশাখারই জন্ম ধর্মকে আশ্রয় করে। তাই কি দৃষ্টি-ভঙ্গিতে, আর কি রচনা-পদ্ধতিতে, কবিদের স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় বড় বেশী পাওয়া যায় না।

আধুনিক কালে এসে সাহিত্যে শ্রম-বিভাগ দেখা দিল। উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, নানা দিক দিয়ে সাহিত্য প্রকাশের পথ পেল বলেই, পদ্য-সাহিত্য অনেকটা ভারমুক্ত হয়ে চলবার সুবিধা পেল। পদ্যের জাতি-গোত্রও আধুনিক কালে গেল আমূল বদলে। পাশ্চাত্য শিক্ষার ভেতর দিয়ে দেশে এল পাশ্চাত্য সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রভাব এবং সেই প্রভাব থেকে যেমন এ যুগে সাহিত্যের প্রাণ-শক্তি পেল নূতন নূতন প্রবর্তনা, তেমনি নূতন নূতন পথে সুরু হল সাহিত্যের প্রকাশভঙ্গি নিয়েও পরীক্ষা। কাব্যে এই পরীক্ষার ফলে মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, লিরিক, সনেট, নানা বিচিত্র ধারা নূতন করে দেখা দিল এই সময় থেকে।

ঈশ্বর গুপ্ত নিজে সৃষ্টির কাজ বেশী করতে পারেন নি, কিন্তু জমি তৈরী করেন তিনিই। সেই ভিত্তিভূমির ওপর পরে মাইকেল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র মহাকাব্যের ইমারত খাড়া করলেন, আর বিহারীলাল, সুরেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রভৃতি করলেন লিরিকের। তারপর এলেন রবীন্দ্রনাথ, যিনি বাংলা সাহিত্যের গদ্য ও পদ্য, নাটক ও কথাসাহিত্য, সমস্ত দিকই আপনার অসামান্য সৃজনী-প্রতিভার আলোয় উজ্জ্বল করে তুললেন। রবীন্দ্র-সমসাময়িকদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল, অক্ষয়কুমার, গোবিন্দচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ কবি কালে রবীন্দ্র-নাথের প্রতিভার পাশে অনেকটা নিষ্প্রভ হয়ে গেছেন।

রবীন্দ্রোত্তর কবিদের ভেতর কয়েকজনের লেখায় ইদানীং প্রতিক্রিয়া সুরু হয়েছে। এই প্রতিক্রিয়া-যুগের কবিতাকেই বলা হয় আধুনিক কবিতা।

ঈশ্বর গুপ্ত

ভারতচন্দ্রই খাঁটি বাংলা আদর্শের সর্বশেষ কবি। ঈশ্বর গুপ্ত থেকে নূতন যুগের স্থত্রপাত হল। ঈশ্বর গুপ্ত নিজে যথেষ্ট ইংরেজী-নবীশ ছিলেন বিনা সন্দেহ। কিন্তু বিদেশী চিন্তা-ধারা ও সাহিত্যাদর্শ আমাদের সাহিত্যে এল তাঁরই হাত দিয়ে। তারপর থেকে বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের সঙ্গে প্রাচীন যুগের যোগস্থত্র গেল সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে এবং প্রাচীন সাহিত্যের স্তন্ত-রস সম্পূর্ণ অস্বীকার করে, আধুনিক সাহিত্য তার স্বকীয় প্রাণ-প্রেরণায় বেড়ে উঠতে লাগল। পরবর্তী কালের বিশিষ্ট সাহিত্যিক যাঁরা, মাইকেল, দীনবন্ধু, বঙ্কিম, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, বিহারীলাল, কারো ওপরই প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের প্রভাব দেখা যায় না। তাঁদের সাহিত্যিক দৃষ্টি ও শিল্পাদর্শ তৈরী হয়েছে একান্ত ভাবে বিদেশী প্রভাবে। রবীন্দ্রনাথের হাতে বাংলা কাব্য আবার বৈষ্ণব কবিতা, বাউল সঙ্গীত এবং ছেলে-ভুলানো ছড়ার দিকে একটু মোড় ফিরেছে। কিন্তু তার আগেই সাহিত্যের মোটামুটি কাঠামোটা তৈরী হয়ে গেছে বিদেশী মালমসলা দিয়ে। তাই রবীন্দ্রনাথ যখন এদের আনলেন, তখন স্বভাবধর্মেই এরা যেন একটা জন্মান্তরের ভেতর দিয়ে এল। অর্থাৎ প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের অব্যাহত ধারায় স্পষ্ট ছেদ পড়ল ঈশ্বর গুপ্তে এবং আর একটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধারা জন্ম নিল।

ঈশ্বর গুপ্ত স্বয়ং যে সাহিত্য স্থষ্টি করেছিলেন, তা আজো টিকে নেই। কিন্তু তাতে ঈশ্বর গুপ্তের গৌরব কিছুমাত্র কমে না। তিনিই সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় অনেকগুলো নূতন জিনিস আনেন, যার মধ্যে প্রধান দুটি হচ্ছে, হাস্যরস আর দেশপ্রেম।

পুরানো আমলে বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে, রামেশ্বরের শিবায়ণে এবং দাশু রায়ের পাঁচালিতে হাস্যরস-স্থষ্টির চেষ্টা আছে। কিন্তু তা বিশুদ্ধির স্তরে উঠেছে কদাচিৎ। ঈশ্বর গুপ্তের হাসিতেও কুরুচি আছে ঠিকই, কিন্তু মুক্তিরও চেষ্টা আছে প্রচুর। তপসে মাছ, পাঁঠা, মেম সাহেব, এদের নিয়েও যে নির্দোষ হাসি সম্ভব, এ ঈশ্বর গুপ্তই প্রথম দেখান। তাঁর আগে বাঙালী

সাহিত্যিক শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে গেয়েছেন শুধু দেব-মাহাত্ম্য। ঈশ্বর গুপ্তই প্রথম বললেন,

ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে, দেখ দেশবাসিগণে,
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া।
কত রূপ যত্ন করি, দেশের কুকুর ধরি,
বিদেশের ঠাকুরে ফেলিয়া।

কাল-ধর্মে দেশাত্মবোধের এই আদর্শকে আমরা হয়ত পছন্দ না করতেই শিখেছি। কিন্তু একশো বছর আগে এই আহ্বান কম অর্থপূর্ণ ছিল না।

কিন্তু ঈশ্বর গুপ্ত সব চেয়ে বড় কাজ করেছেন সাহিত্যস্রষ্টা-রূপে নয়, সাহিত্যসংস্কারক-রূপে এবং এই দিক থেকেই ভবিষ্যৎ ইতিহাস তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে। তাঁর আমলে তাঁরই চেষ্টায় বাংলা সাহিত্যের সমস্ত মফঃস্বলবাহিনী ধারা কলকাতার এক মূল উৎসে এসে মিশল। সে হল তাঁর 'প্রভাকর'। এখনকার দিনে পত্রিকাকে কেন্দ্র করে যে সাহিত্য-গোষ্ঠী তৈরী হয়, তার সূচনা প্রভাকরে এবং ঈশ্বর গুপ্তই বাংলা সাহিত্যের আধুনিক পর্বের সর্বপ্রথম ডিক্টেটর। ঈশ্বর গুপ্ত দুটো দিকে নজর রেখে প্রভাকর চালাতেন, এক নূতন লেখক-সৃষ্টি, আর পুরাতন লেখক-প্রচার। নূতন লেখকদের মধ্যে তাঁর শাগরেদি করে এবং তাঁর কাগজে হাত পাকিয়ে পরে যাঁরা যশস্বী হন, তাঁদের কয়েকজন হলেন রঙ্গলাল, দীনবন্ধু বঙ্কিম। সুতরাং ঈশ্বর গুপ্ত যে প্রতিভা চিনতেন এবং তার পৃষ্ঠপোষকতা করতেন পাকা জহুরীর মতোই, তার আর প্রমাণ দরকার নেই। তাঁর এই জহুরীপনার আর একটু নিবিড় পরিচয় আছে। ছোকরা বঙ্কিমকে তিনি পদ্য ছেড়ে গদ্য লেখার উপদেশ দিয়েছিলেন।

নিধুবাবু, হরু ঠাকুর, রাম বসু, শ্রীধর কথক, নিতাই বৈরাগী প্রভৃতি কবি-ওয়ালার রচনা সংগ্রহ ও সম্পাদন করা এবং টীকা-টিপ্পনী, জীবনী ও সমালোচনাসহ প্রকাশ করাও তাঁর আর একটি কীর্তি। সেদিক থেকে তিনিই বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের প্রথম প্রবর্তক। এতগুলো কাজ এক জীবনে যিনি করেছেন, সম্পাদনা, সমালোচনা, সাহিত্য-সৃষ্টি ও সাহিত্যের পৃষ্ঠ-পোষকতা, তিনি নিশ্চয় অসাধারণ পুরুষ। তাঁর রচনার অশ্লীলতা বা অনুপ্রাসের বাড়াবাড়ি নিয়ে ঠাট্টা করার আগে একথা যেন আমরা সযত্নে মনে করি।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

ঈশ্বর গুপ্ত প্রাচীন সাহিত্যের সমাধি-শয্যার উপর নবীন সাহিত্যের বিগ্রহ স্থাপন করে যান। কিন্তু তাতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করার মতো সৃজনী-প্রতিভা তাঁর ছিল না। তাঁর সমস্ত আয়োজনই তাই পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সীমাবদ্ধ থেকে যায়। পরবর্তী যুগে মাইকেল এবং বঙ্কিম এসে একে কাব্যে এবং অন্যে গদ্যে বাংলা সাহিত্যে নবজীবন সঞ্চার করলেন। এখান থেকেই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের আসল ইতিহাস আরম্ভ। ঈশ্বর গুপ্ত থেকে মাইকেলে আসতে, মাঝখানে অল্প যে সময়টুকু পড়ে, তার একমাত্র উল্লেখযোগ্য কবি হচ্ছেন রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। দেব-দেবীর মহিমাত্মক মঙ্গল ছেড়ে ঐতিহাসিক চরিত্র নিয়ে উপাখ্যান-কাব্য লেখার রীতি প্রবর্তন করেছেন তিনি। 'পদ্মিনী-উপাখ্যানে' মেবারের এবং 'কাঞ্চি-কাবেরী'তে উড়িষ্যার ইতিহাস তাঁকে কাব্য-রচনার উদ্দীপনা দিয়েছে।

বিষয়ের দিক দিয়ে যেমন, রচনা রীতির দিক দিয়েও তেমনি, রঙ্গলাল মঙ্গলকাব্যের রাস্তা মাড়ান নি। তিনি সোজাসুজি অনুসরণ করেছেন স্কট, বাইরন, মুরে প্রমুখ ইংরেজ কবিদের। তাঁর প্রসিদ্ধ 'স্বাধীনতা হীনতায়' অংশটা ত হুবহু ইংরেজীরই অনুবাদ। রঙ্গলালের রচনায় বৈশিষ্ট্য কিছু থাকলেও, বৈচিত্র্য কম। বাদলের কাহিনী বা কাঞ্চি-কাবেরীর প্রারম্ভ বা এমনি দু-একটা জায়গায় তাঁর কলমে এসেছে একটু বেগ, একটু উন্মাদনা। নইলে আগাগোড়াই তা পয়ারের ভ্যানভ্যানানি। অবশ্য ঈশ্বর গুপ্তের ম্রিয়মাণ দেশ-প্রীতি রঙ্গলালে এসে বলিষ্ঠ চেহারা ধরেছে, তারই প্রেরণায় তিনি দেশের অতীত ইতিহাসকে পুনরুজ্জীবিত করতে চেয়েছিলেন কাব্যের মাধ্যমে।

এই সময়ের আর একজন কবি হচ্ছেন মদনমোহন তর্কালংকার, যাঁর 'বাসবদত্তা' কাব্য এক সময় দেশে আদৃত ছিল। ইংরেজ আমলের কবিদের মধ্যে তিনিই একমাত্র ব্যক্তি, যাঁর ওপর ইংরেজী সাহিত্যাদর্শ বিন্দুমাত্র প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। খাঁটি দেশী আদর্শ-অনুসরণে লেখা এই কাব্যে অক্ষরে-অক্ষরে কবি ভারতচন্দ্রকে অনুসরণ করেছেন। কাহিনী, চরিত্র, আঙ্গিক, ভাষা, যাবতীয় ব্যাপারেই। সংস্কৃত ছন্দের ওপর দখল ছাড়া আর কোন কিছুতে তাঁর কোন রকম স্বকীয়তার পরিচয় নেই। স্বপ্নদৃষ্ট কুমারীর সন্ধানে তরুণ নায়কের নিরুদ্দেশ যাত্রা, সেখানে রূপের ছটায় কুলকামিনীদের চিত্তে

চাঞ্চল্য সৃষ্টি করা, তারপর দূতীর সহায়তালাভ এবং সেই ভাবে কুমারী রাজকন্যার সঙ্গে মিতালি, গ্রেপ্তার এবং দৈব মধ্যস্থতায় মুক্তি ও বিবাহ! এক কথায় বিদ্যাসুন্দরের আনুপূর্বিক নকল এবং সে সকল গণেশবন্দনা থেকে সুরু করে, পঝটিকা ছন্দে উৎসব-বর্ণনা পর্যন্ত। অধুনালুপ্ত বলেই বইটি উল্লেখযোগ্য।

মাইকেল

এর পর মাইকেল, সৃজনী-প্রতিভায় যাঁর সমকক্ষ কবি তাঁর পূর্বে বাংলা দেশ দেখে নি। দেশ-বিদেশের ক্ল্যাসিক্যাল সাহিত্য তিনি মন্থন করেছিলেন। তারি সঙ্গে আবিষ্কার করেছিলেন বাংলা যুক্তাক্ষরের অন্তর্নিহিত শক্তি। এই দুইয়ের সমাবেশে তিনি যে নূতন কাব্য-রীতির প্রবর্তন করলেন, তা এমনই দুর্ধর্ষ রকমে স্বতন্ত্র যে, দেশ প্রথমটা তা বরদাস্ত করতে পারে নি। উপ-ধর্মের গণ্ডি-ঘেরা বাংলা কবিতার ক্ষীণধারা মাইকেলের বলিষ্ঠ বাহুর আলোড়নে দুলিয়ে উঠেছে, গৃহাঙ্গনের সীমা ছাড়িয়ে তা ছুটেছে মহাসাগরের অভিমুখে।

বাংলা কবিতা এখন থেকে কেবলমাত্র বাংলার কবিতা না থেকে, বিশ্বের কবিতার সঙ্গে সমানজ্ঞাতিত্বের দাবী করতে পেরেছে। মাইকেল খৃষ্টান ছিলেন বলে নয়, পাশ্চাত্য সাহিত্যে তদানীন্তন ভারতবাসীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন বলে নয়, মনে-প্রাণে অ-বাঙালীসুলভ বিদ্রোহ ও পুরুষকারের উপাসক ছিলেন বলেই, তিনি জাতীয় সংস্কৃতির মর্মমূলে বিপুল নাড়া দিয়েছেন। যুগ-সঞ্চিত জড়তা ও অন্ধ আচারনিষ্ঠার বন্ধন ভেঙে জীবনকে এনে তিনি স্থাপিত করেছেন দিগন্তপ্রসারী বিস্তৃতির পটভূমিতে। মাইকেল এঞ্জেলোর মূর্তির মতো বিরাট আর তেমনই জীবন্ত নর-নারী তাঁর সবল তুলিকাস্পর্শে মূর্ত হয়ে উঠেছে, যা বাংলা সাহিত্যে আগে হয় নি। মাইকেলের এই পৌরুষের পাশে বঙ্কিমের প্রতিভাকেও যেন নিষ্প্রভ মনে হয়।

এই অসীম প্রাণ-শক্তিই তাঁকে যেমন চিরাচরিত রীতির বিরোধী করেছিল, তেমনি করেছিল প্রচলিত ঐতিহ্যের প্রতিকূল। পয়ার-ত্রিপদী-প্লাবিত বাংলা কাব্যে অমিত্রাক্ষরের প্রবর্তন এবং রাম-লক্ষ্মণকে ছেড়ে রাবণ-মেঘনাদে অধিকতর মহত্ত্ব-আরোপের মূল মাইকেলের এই মনোধর্ম। উপমা-প্রয়োগে বা অলংকার-বিন্যাসেও মাইকেল প্রচলিত প্রসিদ্ধির অনুসরণ করেন নি। আগাগোড়া ধার করেছেন পাশ্চাত্য থেকে। এক কথায় ইউরোপীয় রস-দৃষ্টি এবং চিন্তা-ধারার সংযোজনায় তিনিই প্রথম বাংলা ভাষায় ওজোগুণসম্পন্ন

উচ্চাঙ্গের কাব্য-ধারা এনেছেন। আমাদের দেশে ইউরোপীয় আদর্শের মহাকাব্য, বিয়োগান্তক নাটক, প্রহসন, সনেট, নাট্যধর্মী খণ্ডকাব্য, সবই মাইকেলের সৃষ্টি, একথা আজ ভাবলে বিস্ময়বোধ হয়।

আধুনিক সমালোচনার নিরিখে বিচার করলে অবশ্য মাইকেলের কাব্যে আজ সব চেয়ে বড় যে খুঁত পাওয়া যায়, তা হচ্ছে তাঁর আবেদনের স্থূলতা। কি চরিত্র-সৃষ্টিতে, কি ঘটনা-বিন্যাসে, আর কি হৃদয়াবেগ-ব্যাখ্যায়, সর্বত্র মাইকেলের হাতে মোটা তুলি। উপমার পর উপমা, শব্দের পর শব্দ বসিয়ে তিনি গেয়ে চলেন, কিন্তু তাঁর কাব্য আসলে চলে কম, চলার আয়োজন করে বেশী। রচনার এই স্থূলতার জন্যে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলো যেমন হয়েছে মোটা মোটা তাঁর ভাষাও তেমনি ব্যঞ্জনা-গম্ভীর হতে পারে নি। মেঘনাদে ত নয়ই, তাঁর বীরাঙ্গনাতেও কদাচিৎ আবেদনের অন্তর্মুখিতা দেখা যায়। এর একটা কারণ অবশ্য এই যে, মাইকেল ক্ল্যাসিকাল সাহিত্যকে আদর্শ নিয়ে রোমান্টিক কাব্য লিখতে বসেছিলেন। কিন্তু আসল কারণ বোধহয় এই যে, বাংলা ভাষার 'জানে'র সঙ্গে মাইকেলের সত্যিকার পরিচয় হয় নি। অসামান্য অধ্যবসায়ে তিনি তাকে আয়ত্তে এনেছিলেন, কিন্তু আত্মসাৎ করতে পারেন নি। তাই তিনি সবই করেছেন, কিন্তু তাঁর কাব্য-শরীরে সব জায়গায় সুগভীর প্রাণ-রস সঞ্চার করতে পারেন নি। এমন কি সনেটে বা একান্ত ব্যক্তিগত 'আত্ম-বিলাপে'ও না।

হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র

মাইকেল-প্রবর্তিত মহাকাব্যের ধারা তাঁর পর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নবীনচন্দ্র সেনের হাত দিয়ে অন্য দিকে মোড় ফিরল। হেমচন্দ্র আসলে 'জাত কবি' ছিলেন না, অধ্যবসায় তাঁকে দিয়ে কিছু কাব্য লিখিয়ে নিয়েছে। তাঁর খণ্ড-কবিতা বা লিরিকের আলোচনা পরের অধ্যায়ে করব। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ বই 'বৃত্রসংহারে'ই বর্তমান প্রসঙ্গ সীমাবদ্ধ থাকবে। বৃত্রসংহারের নাম থেকে সুরু করে ভেতরকার চরিত্র পর্যন্ত আগাগোড়া মেঘনাদবধের অনুকরণ। উভয় ক্ষেত্রেই দৈবশক্তির সঙ্গে দানবশক্তির সংঘর্ষ এবং শেষ পর্যন্ত দানবশক্তির পরাজয়। একে রাম আর রাবণ, অন্যে ইন্দ্র আর বৃত্র। তারপর মেঘনাদ ও প্রমীলা, রুদ্রাপীড় ও ঐন্দ্রিলা, সীতা ও সরমা, শচী ও ইন্দুবালা। ঘটনা-সংস্থানেও হেমচন্দ্র মাইকেলের ছায়া অনুসরণ করেছেন,

শুধু দধীচির আত্মত্যাগ এবং বিশ্বকর্মার কর্মশালা-বর্ণনাটুকু ছাড়া। কিন্তু কল্পনার অজস্রতায়, বর্ণনার তেজস্বিতায়, শব্দযোজনার গাঢ়তায় মেঘনাদবধে যে জমজমাট ভাবটি আছে, বৃত্রসংহারে তা নেই। নানা ছন্দের ব্যবহার যেমন এক দিকে কাব্যের অব্যাহত গতিকে খোঁড়া করেছে, অন্য দিকে তেমনি কবি কোথাও কোন উচ্চ চিন্তা বা জীবন-বোধকে ভাষা দিতে পারেন নি।

বৃত্রসংহারের আরম্ভ এবং শেষ সত্যিই ভালো এবং সমগ্র কাব্যের মধ্যে ঐ দুটি জায়গাতেই তাঁর লেখনীর কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে। আরম্ভটা প্যারাডাইস্ লস্টের প্যাণ্ডিমনিয়ম মনে করিয়ে দেয়, আর বিশ্বকর্মার কর্মশালাও সুন্দর, দান্তের নকল হওয়া সত্ত্বেও।

নকল মাইকেলও করেছেন। ইলিযাডের হেক্টর-এণ্ড্রোমেকি তাঁর হাতে এসে মেঘনাদে-প্রমীলায় রূপান্তর লাভ করেছে। কোমসের স্যাব্রিনার বিবরণ থেকে তিনি জল-তল-নিবাসিনী বারুণীর কাহিনী সংগ্রহ করেছেন। ইউলিসিজের নরক-যাত্রা থেকে নিয়েছেন রামের প্রেতপুরী-ভ্রমণের বিষয়। ভার্জিল, দান্তে, ট্যাসো প্রভৃতি থেকে টুকরো অংশ আরো যে কত নিয়েছেন মেঘনাদে, তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু তাঁর নিজের ছিল এমনই একটি প্রাণবন্ত সৃজনী-শক্তি যে বহিরুপাদান তিনি যেখান থেকেই আহরণ করুন, তাকে নিজের করে নিতে পেরেছেন। হেমচন্দ্রের সৃজনী-প্রতিভা ছিল সীমাবদ্ধ, ভাষা ছিল অতিশয় অপটু, তাই তাঁর রচনায় ভালো মাল-মসলা প্রচুর থাকলেও, সবসুদ্ধ জড়িয়ে বড় জিনিস কিছু হয়ে ওঠে নি।

নবীনচন্দ্র প্রাক-রবীন্দ্র কবিদের মধ্যে বিহারীলাল ছাড়া আর সকলের চেয়েই বড়। তাঁর লেখায় একটি সত্যিকার বেগবান কবি-হৃদয়ের স্পর্শ পাওয়া যায়। সে পলাশীর যুদ্ধের মতো কাঁচা লেখাতেই হক, আর প্রভাস, কুরুক্ষেত্র, ও রৈবতকের মতো সুলিখিত এবং সুপরিণত কাব্যেই হক। পলাশীর যুদ্ধ সত্যিই তাঁর খুব কাঁচা লেখা। বাইরনের সুরা, শোণিত ও স্বাধীনতার উন্মাদনায় উচ্ছ্বসিত 'চাইল্ড হেরল্ড' কাব্যকে উমিচাঁদ, মিরজাফর, আর গোটা কয়েক শয়তানের চক্রান্তে রাজ্যচ্যুত নাবালক নবাবের নিধন-কাহিনীর ভেতর রূপান্তরিত করবার চেষ্টা করেছিলেন তিনি এই কাব্যে। কিন্তু বাইরনের কাব্য হচ্ছে বর্ণনাত্মক, আর নবীনচন্দ্র লিখেছেন ঐতিহাসিক উপাখ্যান-কাব্য। তবে যুদ্ধ-বর্ণনায়, সিরাজের স্বপ্ন-বর্ণনায় এবং সর্বশেষে তাঁর হত্যা-

বর্ণনায় পলাশীর যুদ্ধেও যে ঔজ্জ্বল্যের পরিচয় আছে, তা বাংলা সাহিত্যে আর কোথাও ছিল না।

'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র', 'প্রভাস' আসলে একখানাই কাব্য। কৃষ্ণ-লীলার তিনটি পর্যায় নিয়ে পৃথক পৃথক তিন খণ্ড লিখিত হলেও, তিনের মধ্যে তাই আখ্যানগত একটি যোগসূত্র অক্ষুণ্ণ আছে। নবীন সেনের এই Trilogy মাইকেলোত্তর এবং প্রাক্-রবীন্দ্র পর্বের এক অপূর্ব বই। ছোট ছোট কয়েকটা নিদর্শন নেওয়া যাক। রৈবতক পর্বতে অন্তরীণ অর্জুনের কাছে শ্রীকৃষ্ণের শৈশবকাহিনী-বর্ণনা, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মৃত্যু-কণ্টকিত মুহূর্তে সুলোচনার সেবাব্রত ও উত্তরার স্বপ্ন, শ্রীকৃষ্ণের ধর্মরাজ্য-পরিকল্পনার বিরুদ্ধে দুর্বাসার বিদ্রোহ, নাগজাতির অভ্যুত্থান এবং তাদের পুরোভাগে থেকে অশিববুদ্ধি দুর্বাসার কপট যজ্ঞানুষ্ঠান···কাব্যের অধ্যায় হিসাবে যেমন মহত্ত্বব্যঞ্জক, বাংলা কাব্যের ঐতিহ্যে তেমনি অনাস্বাদিতপূর্ব। পরিকল্পনায় এবং ভাব-ব্যঞ্জনায় বৃত্রসংহারের চেয়ে ত বটেই, মেঘনাদবধের চেয়েও এরা উন্নত রুচির নির্দেশক। আমরা নবীনচন্দ্রেই সর্বপ্রথম দেখলাম, লাঞ্ছিত মানবতাব বিদ্রোহ-অভিযান। বর্ণ-হিন্দুর সযত্ন প্রসারিত ভেদবুদ্ধিব বেড়া-জাল ছিঁড়ে তারা বেরিয়েছে ভেড়েফুঁড়ে, বর্ণাশ্রমের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে বিপ্লবারক্ত চোখে, যার মুখে শ্রীকৃষ্ণের ধর্মরাজ্য স্থাপনের মহৎ পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত পর্যবসিত হল প্রভাসের প্রসন্ন সমাপ্তিতে। এই রসঘনতা রবীন্দ্রযুগেরই পূর্বাভাস সূচনা করে। অমিত্রাক্ষর-লক্ষণাক্রান্ত পয়ার যা রবীন্দ্রনাথের হাতে পূর্ণতা পেয়েছে, নবীন সেনে তারও সূত্রপাত। বিসর্জন, চিত্রাঙ্গদা, কর্ণকুন্তী-সংবাদ, কচ ও দেবযানী প্রভৃতির পাশে প্রভাস, কুরুক্ষেত্র, রৈবতক রেখে পড়লে, সহজেই বোঝা যায়, এরা ওদের অব্যবহিত পূর্বপুরুষ।

নবীন সেনের Trilogy-র আর একটি উল্লেখযোগ্য জিনিস শৈলজার চরিত্র। শৈলজার মোটামুটি পরিকল্পনাটা রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা চরিত্রেরই অপ্রস্ফুট রূপ, যেমন রঘুপতির বিদ্রোহ নাগবিদ্রোহেরই পূর্ণতর রূপ। অবশ্য রবীন্দ্র-প্রতিভার প্রসঙ্গে প্রভাবের কথাটা অবান্তর, তবু ইতিহাস-লেখকের একটা ব্যবহারিক হিসাব ত চাই। নবীন সেনের Trilogy-র প্রধান দোষ তার ভাষা। যথেষ্ট গতিশীল এবং চিত্রধর্মী ভাষাতেই অবশ্য কবি লেখনী চালনা করেছেন, কিন্তু শব্দ-ভাণ্ডার তাঁর খুব সীমাবদ্ধ। তাই থেকে তাঁর লেখা পড়ে

যায়। হৃদয়াবেগের প্রাচুর্যে কাব্য-বস্তু যখন খুব জমে ওঠে, ভাষা তার থৈ না পেয়ে বাইরে মাথা ঠুকে মরে।

মাইকেলোত্তর কবিতা

নবীন সেন থেকেই মহাকাব্যের ইতিহাস শেষ। মাইকেলে এর জন্ম এবং নবীন সেনে শেষ, মধ্যে হেমচন্দ্র। বলা বাহুল্য, বাংলা ভাষায় মহাকাব্য জিনিসটা এ যুগের দান। পুরানো মঙ্গলকাব্যগুলো কাব্যাকার উপাখ্যান। প্যারাডাইস লস্ট যে জাতের মহাকাব্য, সেই জাতের মহাকাব্য প্রাচীন বাংলায় ছিল না, তার প্রবর্তন করেন এঁরা। উপাখ্যান-কাব্যের সঙ্গে মহাকাব্যের তফাৎ শুধু আকারে নয়, প্রকারেও। একটি দ্বন্দ্বময় বিষয়-বস্তুকে কেন্দ্র করে পরস্পর-বিরোধী কতকগুলো চরিত্রের ঘাত-প্রতিঘাত সৃষ্টি করা এবং তা থেকে একটি সুগভীর পরিণামের নির্দেশ দেওয়াই হল মহাকাব্যের প্রধান লক্ষ্য। তাই তার আঙ্গিক এবং ভাষা হয় গুরুগম্ভীর। উপাখ্যানের লক্ষ্য হল গল্প বলা এবং তা থেকে মধুর একটা রসের সন্ধান দেওয়া। তাই তাতে দরকার হয় লালিত্যের। অর্থাৎ মহাকাব্যের প্রাণ-ধর্মে আছে নাটক, আর উপাখ্যানে আছে লিরিক। মাইকেল-যুগের অন্তে বাংলা কাব্যে আবার লিরিক ফিরে এল এবং সে-ও এল পাশ্চাত্য প্রবর্তনা থেকেই।

মহাকাব্যের ভাঙা আসরে অনুবৃত্তি চলেছিল অবশ্য অনেকদিন। আনন্দচন্দ্র মিত্রের 'হেলেনা কাব্য', হরগোবিন্দ লস্কর চৌধুরীর 'দশাননবধ,' বলদেব পালিতের 'কর্ণার্জুন,' সর্বশেষ যোগীন্দ্রনাথ বসুর 'পৃথ্বীরাজ,' 'শিবাজী' এক সময় অনেকের আনন্দ বর্ধন করেছে। এঁরা মহাকাব্যের ক্ষয়িষ্ণু ধারাকে কিছুকাল বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পারেন নি। মহাকাব্য জিনিসটা হচ্ছে অতি-কায় জীবের মতো। সংস্কৃতি-প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে তার ক্ষয় অনিবার্য।

উপাখ্যান-কাব্যের বিলুপ্তি আগেই হয়েছিল। এ যুগে তাকেও আর একবার ফেরাবার চেষ্টা হয়। হেমচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন 'যোগেশ' নামে একখানি সামাজিক কাব্যকাহিনী। দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী নারীর আকর্ষণ-বিকর্ষণের মধ্যে ফেলে নায়ক যোগেশের হৃদয়-দ্বন্দ্ব এবং তার অনিবার্য ট্র্যাজেডি-বর্ণনাই হল এই কাব্যের বিষয়। মনস্তত্ত্বের খেলা এতে চমৎকার, ভাষাও দিব্যি ঝরঝরে। তার ওপর গল্পাংশে কোথাও অলৌকিকতার

বালাই নেই, নীতি-উপদেশের উৎপাত নেই। বরং আখ্যায়িকার স্বাভাবিক পরিণতিকে কবি অসঙ্কোচে এবং বেশ অকপটেই ফোটাতে চেষ্টা করেছেন। মাইকেলোত্তর বাংলা সাহিত্যে একাধিক দিক থেকে উল্লেখযোগ্য এই কাব্যটির কিন্তু দেশে যথোচিত সমাদর হয় নি। হয়ত অগ্রজ হেমচন্দ্রের অতি-খ্যাতির আড়ালে ঈশানচন্দ্র ঢাকা পড়ে গিয়েছিলেন। তবে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র এবং নবীন সেন তাঁকে বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন। যোগেশ কাব্যখানি সবল অমিত্রাক্ষর ছন্দে এবং সম্ভবত টেনিসনের Enoch Arden-জাতীয় কাব্যের অনুকরণে লেখা।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্বপ্ন-প্রয়াণ' কাব্য ও উপাখ্যান-পর্যায়ের আর একটি উল্লেখযোগ্য বই। এ একখানি রূপক কাব্য। কল্পনার অনায়াস লীলায়, বহু বিচিত্র চিত্রের অজস্রতায় অপরূপ এই কাব্যখানিও বাংলা সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ। কত হাল্কা হাতে লেখনী চালালে, তবে এই মায়াময় স্বপ্নের আবহাওয়াটি বজায় থাকে তা অনুমান করা সহজ নয়। সবচেয়ে বিস্ময়কর এর ছন্দ। সে যেন নেচে চলেছে ঝর্ণার মতো, কোথাও তার পথে এতটুকু বাধা নেই।

> কোথায় মহাবট, শিরে জট, অতি নিবিড়,
> পালিছে চুপে চাপে, খোপে খোপে, অযুত নীড়।

কিংবা,

> গবজন সুবিকট হইল সন্নিকট
> গোগণ ঝটপট খোঁজে আড়াল,
> কভু বা ঝোপ-ঝাড়, করিয়া তোলপাড়
> পালায় দুদ্দাড় মৃগের পাল।

পড়তে পড়তে নেশা লাগে। যুক্তাক্ষরের স্বর-তরঙ্গের ওপর নির্ভর করে ছন্দের যতি-নির্ণয় করার পদ্ধতিও বোধ হয় বাংলা ভাষায় এসেছে স্বপ্ন-প্রয়াণ থেকেই, যা মাইকেল, হেমচন্দ্র, নবীন সেন, কারুর লেখাতেই পাই না। কেবল-মাত্র অক্ষরের হিসাব থেকে তাঁরা ছন্দের তাল ঠিক করতেন, তাই আজকের বিচারে তাঁদের পয়ারাতিরিক্ত মিত্রাক্ষরে পদে পদে ছন্দঃপতন দেখা যায়। এটা দূর হয়েছে দ্বিজেন্দ্রনাথে এসে। তিনিই প্রথম স্বরপ্রধান ছন্দে অক্ষরের হিসাব ছেড়ে মাত্রার হিসাবকে মান-রূপে গ্রহণ করেছেন।

বিহারীলাল ও সুরেন্দ্রনাথ

এরপর বিহারীলাল। আধুনিক লিরিকের পুনরুজ্জীবনে বিহারীলালের দান স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছে। বিহারীলালকে তিনি তাঁর কবি-জীবনের প্রারম্ভিক প্রবর্তনা দেওয়ার জন্যে গুরু বলে স্বীকার করেছেন। বিহারীলালের প্রভাব রবীন্দ্রনাথ অবশ্য অল্প বয়সেই কাটিয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু বিহারীলালের দৃষ্টি বাংলা কবিতার মোড় যেদিকে ফিরিয়ে দিয়েছিল, সেই পথ ধরেই তার পরবর্তী বিকাশ হয়েছে।

আধুনিক কালে যে লিরিক আমরা পড়তে অভ্যস্ত, রবীন্দ্রনাথ যে বিচিত্র সুখ-দুঃখ, মিলন-বিরহের অনুভূতি-সমৃদ্ধ কবিতা দেশকে উপহার দিয়েছেন, তা বাংলা কাব্যে আগে ছিল না। মাইকেল-যুগ পর্যন্ত পুরানোরই জের চলেছে। মাইকেলের 'আত্ম-বিলাপে' বা মুষ্টিমেয় সনেটে ব্যক্তিগত অনুভূতির সুর পাই। হেমচন্দ্রের 'আবার গগনে কেন' বা নবীন সেনের 'অবকাশ-রঞ্জিনী'র কোন কোন কবিতাতেও পাই। কিন্তু সে অনুভূতি ব্যক্তিগত দুঃখ-বেদনার গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ। ব্যক্তিগত অনুভূতিকে সার্বজনিক করা তাঁদের দ্বারা সম্ভব হয় নি। এটা করলেন বিহারীলাল। বাংলা কাব্যে তিনিই প্রথম বাহ্য প্রকৃতির এবং অন্তঃপ্রকৃতির রহস্য-লোকের সন্ধান পান। তাঁর আগে মাইকেলে, হেমচন্দ্রে, নবীনচন্দ্রে কোন ভাব বা চিন্তা বা ঘটনার জড়-উপাদনকে সরাসরি ছন্দে রূপায়িত করা হয়েছে। উপাদানের গুণে বা লিপি-চাতুর্যের বৈশিষ্ট্যে সময় সময় তা সুখপাঠ্য হলেও, আসলে সার্থক কবিতা হয়নি। প্রাণ-ধর্মের বিচারে সে সব কবিতার বেশির ভাগই দেউলে।

বিহারীলালেই প্রথম উপাদানের বদলে অনুভূতিকে, ভাবের বদলে রসকে লিরিক কবিতার উপজীব্য হিসাবে নেওয়া হল। 'সারদা-মঙ্গলে'র গোড়ার কবিতাটাই ধরা যাক,

কিবা মনোবিমোহন মূরতি তোমার,
সদা যেন হাসিতেছে আলয় আমার।
সদা যেন ঘরে ঘরে,
কমলা বিরাজ করে,
ঘরে ঘরে দেব-বীণা বাজে সারদার।

ধাইয়ে হরষভরে, কোলাহল করে করে
হাসি মুখে ঘুরে ফেরে কুমারী-কুমার।
মরুময় ধরাতল,
তুমি শুভ শতদল,
করিতেছ ঢল ঢল সমুখে আমার।
হয়ে কত জ্বালাতন,
করি অন্ন আহরণ,
ঘরে এলে উবে যায় হৃদয়ের ভার।
ক্ষুধা-তৃষ্ণা দূরে রাখি, ভোর হয়ে বসে থাকি,
নয়ন-পরাণ দিয়ে দেখি অনিবার।
তুমি লক্ষ্মী সরস্বতী,
আমি ব্রহ্মাণ্ডের পতি,
হকগে এ বসুমতী যার খুসী তার।

প্রসিদ্ধ 'হিমালয়' কবিতা থেকেও একটু উদ্ধৃত করা যেতে পারে,

পদে পৃথ্বী, শিরে ব্যোম, তুচ্ছ গিরি সূর্য সোম,
নক্ষত্রে নখাগ্রে যেন গণিবারে পারে।
সম্মুখে সাগরাম্বরা, ছড়ায়ে রয়েছে ধরা,
কটাক্ষে কখনো যেন চাহিছে উহারে।

প্রিয়াকেই হক, আর প্রকৃতিকেই হক, এই যে বিশেষ একটা দৃষ্টিতে দেখা, একে বলা যাবে গীতি-কবিতার মেজাজ। সারদা সরস্বতীই হন, আর কবির মানসীই হন, আর কোন বাস্তবী নারীই হন, আসলে তিনি কাব্যলক্ষ্মী। শেলীর Spirit of Eternal Beauty বা রবীন্দ্রনাথের জীবন-দেবতারই তিনি স্বজাতীয়।

অবশ্য এ কথা মনে করলে ভুল হবে যে, বিহারীলালের হাতেই বাংলা লিরিক সম্পূর্ণতা লাভ করেছে। বিহারীলাল বাংলা কবিতাকে ভাবী সম্ভাবনার পথে মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছেন বটে, কিন্তু তাঁর অধিকাংশ কবিতা কালের পরীক্ষায় টেকে নি। তাতে নূতন দৃষ্টি আছে, কিন্তু সেই দৃষ্টি সংহত হয়ে ওঠে নি। মাঝে মাঝে অসাধারণতার চমক আছে, কিন্তু আগাগোড়া জড়িয়ে তা সত্যিকার মহৎ সৃষ্টি হয়ে ওঠে নি। ঘূর্ণমান নীহারিকার মতো তা

শুধু আবর্তিতই হয়েছে, দানা বাঁধতে পারে নি। তাঁর কবিতায় অবোধ্যতার মূলও এইখানে।

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার সম্পূর্ণ অন্য জাতের কবি। তিনি আপন কবিধর্ম ব্যাখ্যা করে বলেছেন,

হে কবি-কল্পনা-মায়া, সত্যের সোনালী ছায়া,
কাব্য-ইন্দ্রজাল-ভানুমতী,
সুখে তুমি যথা ইচ্ছা যাও রূপবতী।
চড়িয়া কল্পনা-রথে, ভ্রম গিয়া ছায়াপথে,
কর ইন্দ্রচাপ বিরচন,
কিংবা কর পরী সাথে চন্দ্রিকা ভোজন।
আমি না করিব দেবী তব আরাধন।
বিধাতার এ সংসারে, যারে না তুষিতে পারে,
যে কবির মহতী কামনা,
তাহারা করিবে শুধু তব আরাধনা।
তত লোকাতীত নয় বাসনা আমার,
লক্ষ্য মম সামান্য এ সত্যের সংসার।

'মহিলা' কাব্যের মঙ্গলাচরণেও তিনি প্রায় এই কথারই প্রতিধ্বনি করেছেন,

না চাই বর্ণিতে নদ, নদী, সরোবর,
শৈল, সিন্ধু, মরুভূ, প্রান্তর।
গাব গান খুলি হৃদি-দ্বার,
মহীয়সী মহিমা, মোহিনী মহিলার।

আশ্চর্যের বিষয়, বিহারীলাল কল্পনার অনুরঞ্জনে বাস্তবকে অতি-বাস্তবে রূপায়িত করছিলেন যে সময়, ঠিক সেই সময় তাঁর সমসাময়িক কবি সুরেন্দ্রনাথ কল্পনাবাদ পরিহার করে 'সত্যের সংসার'কে চিত্রিত করবার জন্যে লেখনী ধরেছিলেন। অর্থাৎ দু-জনে রসাদর্শের পরস্পর-বিরোধী দুটি সীমানা ধরে অগ্রসর হচ্ছিলেন। এক সমসাময়িকতা ছাড়া দু-জনের মধ্যে তাই আর কোন দিক থেকে কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের এই বাস্তবতা বস্তু-সংসারকে যথাযথ অঙ্কিত করা নয়, বস্তুকে তত্ত্বের মধ্যে দিয়ে বোঝানো এবং সেই কারণেই তা অতিমাত্রায় intellectual।

এই প্রজ্ঞাস্বভাব আতিশয্যে মহিলা কাব্যের পাঠককে বারংবার হোঁচট খেতে হয়।

প্রত্যক্ষ সংসারে মাতা, ভগিনী, জায়া, কন্যা, নানারূপে নারী মানুষের জীবনকে ঘিরে আছেন। আসলে এ হল প্রাণ-শক্তিরই বহু বিচিত্র পথে আত্ম-প্রকাশ এবং সৃষ্টির ধারা বজায় রাখাই এর লক্ষ্য। আর এ-ই হল মহিলা কাব্যের মূলতত্ত্ব। বইটি কবি শেষ করে যেতে পারেন নি। কিন্তু যতটা পাওয়া গেছে, তাতেই সমগ্রভাব যে পরিচয় পাই, তা বিস্ময়কর।

কিন্তু একটা জিনিস লক্ষণীয়। সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের মতো কবি রবীন্দ্র-নাথের ওপর কোন প্রভাব বিস্তার করেন নি।

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের বা বিহারীলাল চক্রবর্তীর সমগ্র রচনা নিয়ে আলোচনা করার স্থান বা অবকাশ নেই। দু-জনের দুটি শ্রেষ্ঠ রচনা নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে। এ ছাড়া সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের অসমাপ্ত কাব্য 'সবিতা-সুদর্শন' এবং 'সন্ধ্যার প্রদীপ', 'বর্ষ-বিবর্তন' প্রভৃতি কবিতা যে-কোন পাঠকের মনোহরণ করবে। বিহারীলালের 'বঙ্গসুন্দরী', 'সাধের আসন', 'বন্ধু-বিয়োগ', 'নিসর্গ-দর্শন' ইত্যাদিও কম আনন্দদায়ী হবে না।

বিহারীলাল ও সুরেন্দ্রনাথের সমসাময়িক আর একজন শক্তিমান কবি হলেন গোবিন্দচন্দ্র রায়। এঁর অল্প কয়েকটি মাত্র রচনা হাতে পাওয়া যায়। গোবিন্দ রায় প্রাক-রবীন্দ্র যুগের একজন বিশিষ্ট কবি। এমন কি বিহারীলাল, সুরেন্দ্রনাথের চেয়েও এঁর লেখনীর ধার বেশী। গোবিন্দ রায়ের সবচেয়ে স্মরণীয় কবিতা 'যমুনালহরী' আজকের পাঠক অনেকেই হয়ত পড়ে থাকবেন। এই কবিতায় মিলহীন মিত্রাক্ষরে কেবল মাত্র স্বর-তরঙ্গের সাহায্যে ছন্দ-সঙ্গীত সৃষ্টি করা যেমন লক্ষ্য করার মতো, তেমনই এর অন্তর্নিহিত সত্যানুভূতিও অনুপেক্ষণীয়। সুরেন্দ্রনাথ-প্রসঙ্গে যে নিরাসক্ত তত্ত্বদৃষ্টির উল্লেখ করেছি, গোবিন্দ রায়ে সেই দৃষ্টিরই পূর্ণতর প্রকাশ দেখতে পাই। হিন্দু ও মুসলীম ভারতের বিলুপ্ত কীর্তির মহাশ্মশান ধৌত করে বইছে যে যমুনা-লহরী, তাকে কবি দেখছেন একটি ধ্বংসশীল চৈতন্যধারা-রূপে, যা কেবল একের পর এক করে নূতন খেলার ছক পেতে চলেছে এবং চোখ ফেরাতে না ফেরাতেই সব ভেঙে-চুরে আবার নূতনের পত্তন করে যাচ্ছে। ধ্বংস ও সৃষ্টির এই অবিশ্রাম প্রবাহের মাঝে ছেদ রচনা করে দাঁড়িয়ে আছে যে

তাজমহল, তার কাছে আসতেই কবির দৃষ্টির সামনে একটি নূতন চিন্তা-লোকের দরজা খুলে গেছে। তিনি বলছেন,

ঐ তব তীরে, শুভ্র শরীরে, দণ্ডায়িত গৃহরাজ ও,
যার সমৃদ্ধে, দিক দিক হইতে, কর্ষে মনুজ-সমাজ ও।
অহো কত কাল, রবে এ বিরাজিত, তটিনী তব তট ভূষি ও,
ভূষণ হইয়া, তব তটনীরে, ব্যঞ্জিতে মনো অভিলাসে ও!
কত নব-পঞ্জরে, নির্মিল উহারে, শোষি শোণিতধারা কোষে ও,
দর্শাইতে সব দর্শক জনে, প্রমদা-গৌরব শেষে ও!

প্রমদা-গৌরব-প্রতিষ্ঠার জন্যে এবং তার ভেতর দিয়ে আসলে আপন অহংকার-প্রতিষ্ঠার জন্যে কোটি কোটি দরিদ্রের বক্ষ-পঞ্জরে নির্মিত তাজমহল নামক বিরাট শোক-নাট্যের অন্তর্নিহিত প্রহসনকে এমন করে আর কেউ উদ্ঘাটিত করেছেন কিনা সন্দেহ।

গোবিন্দচন্দ্রের আর একটি প্রসিদ্ধ কবিতা প্রায় সকলেরই কণ্ঠস্থ। কিন্তু তার রচয়িতার নাম অনেকের জানা নেই। সে হচ্ছে 'হিন্দুমেলার' গান,

কতকাল পরে বলো ভারত রে,
দুখ-সাগর সাঁতারি পার হবে।
অবসাদ-হিমে ডুবিয়ে ডুবিয়ে,
ও কি শেষ নিবেশ রসাতল রে।
পরো দীপমালা নগরে নগরে,
তুমি যে তিমিরে, তুমি সে তিমিরে॥

মনে রাখতে হবে, কংগ্রেসের তখন শৈশব, দেশের জনসাধারণের মনে জাতীয়তা-বোধ তখনো স্পষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে নি। শিক্ষিত সমাজের জাতীয় আন্দোলন তখন সীমাবদ্ধ রয়েছে আবেদন-নিবেদনে। শুধু মুষ্টিমেয় শিক্ষিত যুবক ইতস্তত মরচে-পড়া তলোয়ার নিয়ে ছোট ছোট গোপন সভা করছেন এবং প্রকাশ্যে করছেন হিন্দুমেলার অনুষ্ঠান! সেই অবসাদ-হিমের অস্বচ্ছ অন্ধকারে কবি কেঁদেছিলেন অকপট প্রাণের কান্না, যার সমান আন্তরিকতা হেমচন্দ্রের 'ভারত ভিক্ষা'য় বা নবীন সেনের 'পলাশীর যুদ্ধে' পাওয়া যাবে না।

হিন্দুমেলাকে কেন্দ্র করে অপরাপর কবির লেখাতেও অবশ্য স্বাদেশিকতার সুর বেজেছিল। ঢাকার কবি দীনেশচরণ বসুর 'কবিকাহিনী'তে, শিবনাথ শাস্ত্রীর স্বদেশী গানে, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মিলে সব ভারত-সন্তান' গানে

ক্ষীণভাবে একটা জাতীয় চেতনার আগমনী শোনা গিয়েছিল। পরবর্তী কালের বন্দেমাতরম্‌-আন্দোলনে হঠাৎ যখন সমগ্র ভারত জুড়ে দেশাত্মবোধের বন্যা এসেছিল, তখন এই সব প্রাথমিক কলকাকলী ছাড়া দেশের প্রাণ-বাণী-প্রকাশের আর কোনো ভাষা ছিল না।

রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্র-কাব্যের বিস্তারিত আলোচনা এত অল্প পরিসরে করা সম্ভব নয়। মাইকেলী কাব্যের বহির্বঙ্গিকতা বিহারীলাল প্রমুখ কবির হাত দিয়ে ক্রমে ক্রমে অন্তর্মুখিতার দিকে মোড় ফিরেছে, এ আমরা আগেই দেখিয়েছি। তবু সে রবুদয়ের পূর্ববর্তী একটি অরুণালোকিত মুহূর্ত মাত্র। রবির পরিপূর্ণ কিরণ-সম্পাতের পর তা দিগন্তে বিলীন হয়ে গেছে।

তারপর থেকে সুদীর্ঘ অর্ধশতাব্দী কাল বাংলার সাহিত্য-ভুবন আলোকিত, উদ্ভাসিত ও সঞ্জীবিত হয়ে রয়েছে শুধু রবীন্দ্রনাথের একক জ্যোতিতে। রবীন্দ্রনাথের মতো অতি-মানুষী প্রতিভার আবির্ভাব বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি আকস্মিক ঘটনার মতো। দেশের প্রচলিত সাহিত্য-ধারার ক্রমপরিণতি হিসাবেই এত বড় প্রতিভার বিকাশ হয় নি।

অবশ্য রবীন্দ্রনাথে পুরানো ঐতিহ্যের প্রভাব নেই এমন নয়। তাঁর গানে বাংলা বৈষ্ণব ও বাউল গানের ছায়া আছে। কান্তাপ্রেমের কবিতায় ও গানে আছে মধ্যযুগীয় মরমিয়াদের রচনার প্রতিধ্বনি। শব্দালংকারময় স্বভাবোক্তির কবিতায় ক্ল্যাসিকাল সংস্কৃতের অনুসরণ আছে। পারমার্থিক কবিতায় উপনিষদের স্পর্শ আছে। কিন্তু সবচেয়ে যেটা বড় কথা, রবীন্দ্রকাব্যে প্রকৃতির সঙ্গে হৃদয়-সম্পর্কের যে লীলা, তা কবি দেশীয় ঐতিহ্য থেকে পান নি, পেয়েছেন পাশ্চাত্য কাব্য থেকে। যে Creative-Evolution তাঁর জগৎ, জীবন ও প্রেম-সম্বন্ধীয় কবিতার প্রধান অবলম্বন, তা-ও তিনি পেয়েছেন পাশ্চাত্য দর্শন থেকে। তাঁর গাথা-কবিতায় এবং বর্ণনাত্মক কবিতায় টেনিসনেরও প্রভাব দেখা যায় অল্প-বিস্তর।

অবশ্য রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে প্রভাবের কথা অবান্তর। নানা দিগ্‌দেশের নানা ধারা তাঁতে এসে মিশলেও, সব কিছুর সমবায়ে তাঁর মনোধর্ম এবং জীবন-দর্শন অপূর্ব একটি স্বকীয়তা আহরণ করেছে। শুধু একটা কথা বলে রাখা দরকার যে, রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ লিরিক কবিতার আবেদনই নৈর্ব্যক্তিক।

ব্রাউনিঙ বা শেলীর তীব্র আত্মকেন্দ্রিকতা তাতে নেই। রবীন্দ্র-কাব্যের শাব্দিক ব্যঞ্জনাই সব চেয়ে বড় জিনিস এবং এ বিষয়ে তাঁর সমকক্ষ কবি আর দেখা যায় নি।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য সাহিত্যকে মোটামুটি চার অধ্যায়ে ভাগ করা যায়। 'মানসী' ও 'সোনার তরী'র অধ্যায়, 'চিত্রা', 'চৈতালী' ও 'নৈবেদ্য'র অধ্যায়, 'বলাকা', 'পূরবী' ও 'মহুয়া'র অধ্যায় এবং 'জন্মদিনে', 'রোগশয্যা' ও 'আরোগ্যে'র অধ্যায়। প্রথম অধ্যায়ে কবি প্রকৃতি ও প্রেমের পূজারী। দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিনি নিঃশেষে নিবেদন করেছেন নিজেকে জীবন-দেবতার কাছে। তৃতীয় অধ্যায়ে তিনি অনুভব করেছেন এক আনন্দময় অভিব্যক্তির লীলা। আর শেষ অধ্যায়ে বঞ্চিত মানুষ ও পার্থিব বেদনা তাঁকে নাড়া দিয়েছে।

রবীন্দ্র-সমসাময়িক কবি

রবীন্দ্র-সমসাময়িকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কবির অভাব ছিল না। তাঁদের মধ্যে প্রথম হচ্ছেন ভাওয়ালের কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস। তাঁর কবিতায় বল্গাহীন আবেগে অন্তর উজাড় করে দেবার অনায়াসতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বাছাই করা ভাব ও শব্দ নিয়ে ভদ্র, পরিচ্ছন্ন ও সংহত রীতির কবিতা রচনা তাঁর ধাতুতে ছিল না। সেই জন্যেই তিনি এমন সমস্ত উজ্জ্বল পঙ্‌ক্তি নিয়ে এত অবাধে খেলা করে গেছেন,

আয় বালিকা খেলবি যদি এ এক নূতন খেলা।
তোমার সঙ্গে গেলে ছাই,
সকাল আসতে ভুল হয়ে যায়,
ভয়ে মরি ফিরতে একা, সবুজ সন্ধ্যে বেলা।
চুপ চুপ চুপ, কসনে কারেও, এ এক নূতন খেলা।

নয়ত,

তরুলতা ঘুম যায়, ঘুম যায় ফুল,
পল্লবের কোলে কোলে ঘুমায় মুকুল।
আকাশে হেলান দিয়া ঘুমায় পর্বত,
সম্মুখে সমুদ্র পাতা মহাশয্যাবৎ।
নিরাশার নিষ্পেষিত মহা মরুভূমে,
কত বক্ষ অস্থি-চূর্ণ আছে ঘোর ঘুমে।

ঘাসে ঘাসে ঘুম যায় কত অশ্রুজল,
সৈকতে শোকের শ্বাস ঘুমেতে বিহ্বল।
দিকবদ্ধ শ্যাম মাঠ, অনিবদ্ধ নীবি,
স্খলিত অঞ্চল অঙ্গে ঘুমায় পৃথিবী।

অনেক ক্ষেত্রে অবশ্য উপযুক্ত সংযম ও মাত্রা-জ্ঞানের অভাবে তাঁর কবিতা খুব শিষ্ট হয় নি। কবি সাংসারিক জীবনে শান্তি লাভ করেন নি। ব্যক্তিগত জীবনের সেই বিষাক্ত বাস্তবতা কবিকে এত বেশী অভিভূত করেছিল যে, তাঁর সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গিই যেন কেমন একটা অসুস্থ আতিশয্যে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল। তাঁর রচনায় স্বতঃস্ফূর্ত বাস্তবতার সঙ্গে সহজ প্রশান্তি নেই, বিদ্রোহের সঙ্গে তাতে বিকৃতির সংযোগ হয়েছে, তাই তিনি এত বড় কবি হয়েও জনপ্রিয় হতে পারেন নি।

অক্ষয় বড়ালে ভাবের ঐশ্বর্য এবং ভাষার শুচিতা অসাধারণ, যদিও তাঁর লেখায় অনুভূতির উত্তপ্ততা নেই। অক্ষয় বড়াল হলেন সংযত আবেগের কবি। তাঁর ভাষা পরিচ্ছন্ন, ভাব নির্মল, কিন্তু রসাবেশ খুব জীবন্ত নয়। গোবিন্দ দাস বে-পরোয়া যৌবনের কবি, স্থৈর্য ও শান্তির ধার ও ধারেন না। তাঁর প্রতি লাইনে আবেগের প্রমত্ত নৃত্য। পত্নী-বিয়োগে ব্যথিত হয়ে উভয়েই কবিতা লিখেছেন। কিন্তু অক্ষয় বড়ালের 'এষা' এবং গোবিন্দ দাসের 'কস্তুরী'র সনেটগুলি পাশাপাশি রেখে পড়লেই বোঝা যাবে, দু-জনে তফাৎ কোথায়। অবশ্য অক্ষয় বড়ালও সাধারণ কবি নন, রবীন্দ্র-সমসাময়িকদের মধ্যে তাঁর একটা নিজস্ব উঁচু স্থান আছে। একটু দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক,

এসো এ হৃদয়ে মম, অস্ফুট চন্দ্রিকা সম,
এসো প্রেমে, স্নিগ্ধ করুণায়,
ঢেকে দাও সব ব্যথা, অসমতা অক্ষমতা,
ছড়ায়ে জড়ায়ে মমতায়।
লয়ে প্রেমসুধা হাসি, এসো দেবী এসো দাসী,
এসো সখী, এসো প্রাণপ্রিয়া,
সব সুখ-দুঃখ ঘুরে, জন্ম-মৃত্যু ভেঙে চুরে,
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় ব্যাপিয়া।

অক্ষয় বড়ালের রচনার এই শান্ত শুচিতা ও গার্হস্থ্য ভাবের সহজ অভিব্যক্তি সকলেরই ভালো লাগে। বিহারীলালের মন্ত্রশিষ্য হয়েও রচনাভঙ্গিতে তিনি

খানিকটা ক্ল্যাসিকাল, আবার রবীন্দ্রনাথ থেকেও এই খানেই তাঁর স্বাতন্ত্র্য। প্রিয়াকে তিনি বিশ্ব-মানবী বা আদর্শনারী-রূপে দেখেন নি। এষা কাব্যের সূচনায় তিনি বলেছেন, 'মানবীর তরে কাঁদি, চাহিনা দেবতা' এবং প্রিয়ার লোকান্তর-প্রাপ্তিতে তিনি মৃত্যুর নির্বিশেষ রূপ দেখেন নি, তার মাধুর্যও অনুভব করেন নি। তিনি ভেবেছেন,

পতি নাই, পুত্র নাই, অতি অসহায়,
সকল বন্ধন ছিঁড়ে, পাগলিনী কোথা ফিরে,
অনলে অনিলে শূন্যে, কোথায় কোথায়!

পদ্মাতীরে বেল কাঠ মাথায় চিতা-শয্যায় শায়িতা প্রিয়ার স্মৃতিতে উদ্‌ভ্রান্ত গোবিন্দ দাসের উচ্ছ্বসিত কান্না এ নয়, আবার মৃত্যু-মহোৎসবের ভেতর দিয়ে চিরন্তন অমরত্বে অভিষিক্তা প্রিয়ার স্মৃতিতে আশ্বস্ত রবীন্দ্রনাথের নৈর্ব্যক্তিক তত্ত্বদৃষ্টিও এ নয়। এ হল সেই সুগভীর বেদনার অভিব্যক্তি, যা সর্বজনের সহজ অনুভূতি।

এর পর উল্লেখযোগ্য কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন। দেবেন্দ্রনাথ সেনে গোবিন্দ দাসের বাঁধন-ছেড়া আবেগ নেই, অক্ষয় বড়ালের সমাহিত স্নিগ্ধতা নেই, তার স্থানে আছে প্রবীণতার প্রসন্ন পীতাভা। অক্ষয় বড়ালের মতো শব্দপ্রয়োগের জহুরীপনা তাঁর নেই। গোবিন্দ দাসের মতো ভাব ও ছন্দ নিয়ে ছিনিমিনি-খেলার অজস্রতাও নেই। ভক্তিবিনম্র আন্তরিকতার গুণেই তিনি রবীন্দ্র-সমসাময়িকদের মধ্যে একজন বিশিষ্ট কবি। দেবেন্দ্রনাথকে 'সোনার তরী' উৎসর্গ করে রবীন্দ্রনাথও এই সিদ্ধান্তই অনুমোদন করেছেন। একটু নিদর্শন নেওয়া যাক,

অপূর্ব রূপসী মরি তোমার মুখর চাহনিতে
থাকে সুপ্ত হৃদয়ের কথা,
প্রথম ফাল্গুনে যথা থাকে চাপা চাঁপার কলিতে
বসন্তের পূর্ণ মাদকতা।
বাল বিধবার যথা অতি মৃদু মলিন হাসিতে
থাকে চাপা ঘোর আকুলতা,
শেফালী ইঙ্গিতে যথা বলি যায় ঝরিতে ঝরিতে
আপনার সৌরভ বারতা!

সুন্দর নয় কি? এই রকম সুন্দর পঙ্‌ক্তি দেবেন্দ্র সেনের কবিতায় রাশি রাশি পাওয়া যাবে। ঠিক এমনি সুন্দর,

মুক্ত মেঘ-বাতায়নে বসি,
এলোকেশী কে ঐ রূপসী,
জল-যন্ত্র ঘুরায়ে ঘুরায়ে
জলরাশি দিতেছে ছড়ায়ে।
নীলবর্ণ শাড়ীখানি পরি
অপূর্ব মল্লার রাগ ধরেছে সুন্দরী।
স্রস্ত কেশদাম হ'তে বেলফুল চৌদিকে ঝরিছে,
কালোরূপ ফাটিয়া পড়িছে।
যাই বলিহারী।

দেবেন সেনের কতকগুলি সনেটও চমৎকার। বাংলা ভাষায় সনেট প্রবর্তন করেন মাইকেল। তাঁর পর রবীন্দ্রনাথ, গোবিন্দ দাস, চিত্তরঞ্জন, অনেকেই সনেট লিখেছেন। কিন্তু খাঁটি ইটালীয়ান ঢঙে Octave এবং Sestet বজায় রেখে লম্বিত পর্বের সনেট প্রথম দেবেন সেনই লিখেছেন। আর তাঁর পর লিখেছেন মোহিতলাল মজুমদার এবং আরো কোন কোন আধুনিক কবি। দেবেন সেনের সনেটগুলির মধ্যে 'নয়নে নয়নে কথা ভালো নাহি লাগে,' 'চাহি না আনার যেন অভিমানে ক্রুর' প্রভৃতি যে-কোন কাব্যরসিকেরই মনোহরণ করবে। 'ডায়মণ্ডকাটা মল,' 'বিধবার আরশি' প্রভৃতি কবিতাগুলোকে তাঁর কবি-কীর্তির নিদর্শন-রূপে খাড়া করে না তুলে, এই সনেটগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে কবির প্রতি অনেক বেশী সুবিচার করা হবে।

গোবিন্দচন্দ্র দাস, অক্ষয়কুমার বড়াল, দেবেন্দ্রনাথ সেন, এই তিনজন কবির কাব্য-ধর্ম নিয়ে সংক্ষেপে একটু আলোচনা করা হল। প্রথমের 'কুঙ্কুম', 'কস্তুরী', 'বৈজয়ন্তী,' 'ফুলরেণু,' দ্বিতীয়ের 'শঙ্খ,' 'এষা,' কনকাঞ্জলি,' 'প্রদীপ,' তৃতীয়ের 'অশোকগুচ্ছ,' 'গোলাপগুচ্ছ', 'শেফালীগুচ্ছ,' 'অপূর্ব নৈবেদ্য' প্রভৃতি রবীন্দ্র-সমসাময়িক কবিতা-সংগ্রহগুলির বিস্তৃততর আলোচনা প্রয়োজন। দুঃখের বিষয় আজো রসিকজন সেদিকে বিশেষ মনোনিবেশ করেন নি।

এই তিনজনের পর আসেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। দ্বিজেন্দ্রলালও প্রথম শ্রেণীর কবি। কিন্তু তাঁর বেশির ভাগ শক্তিই নিয়োজিত হয়েছিল নাটক, গান

এবং হাসির গান-রচনায়, যা নিয়ে পরে আলোচনা করা হবে। 'মন্দ্র', 'আলেখ্য', 'ত্রিবেণী' প্রভৃতি বইয়ে তাঁর যে লিরিক কবিতাগুলো সংগৃহীত হয়েছে, তার ভেতর ভালো কবিতার অভাব নেই। গম্ভীরের সঙ্গে তরল সুরের মিশাল দিয়ে, তিনি আশ্চর্য রসসৃষ্টি করেছেন অনেক কবিতায়। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ যে মুক্ত-ছন্দ (Vers libre) 'বলাকা'য় প্রথম ব্যবহার করেন, ভাঙাচোরা ভাবে তার প্রাথমিক আভাস দিয়েছিলেন দ্বিজেন্দ্রলালই। যেমন,

এসেছো তুমি,
বসন্তের মতো স্নিগ্ধ,
... ...
কভু ভাবি মনে, তুমি নহ শীত ধরণীর।
কোন স্বর্গলোকে হতে খসা,
নন্দন কিরণে
লালিত ললিত এক অমর স্বপন।

দ্বিজেন্দ্রলালের 'ঘুমন্ত শিশু', 'হাসি ও অশ্রু', 'সমুদ্র', 'বাইবেলের প্রতি' প্রভৃতি কবিতা বা পত্নী-বিয়োগের কবিতাগুলি এক সময়ে বিশেষ জনপ্রিয় ছিল সারা দেশে।

অন্যান্য কবি

রবীন্দ্র-সমসাময়িক কবিদের মধ্যে নিত্যকৃষ্ণ বসু, অক্ষয়কুমার চৌধুরী, 'অবসর' কাব্য-রচয়িতা বরদাচরণ মিত্র, 'বেলা', 'পরিমল' প্রভৃতির কবি গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়, 'মন্দির' কাব্যের লেখক কিরণচাঁদ দরবেশ, 'যজ্ঞ-ভস্ম'-রচয়িতা বিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রভৃতির কবিতায় বেশ একটু স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় পাওয়া যায়। গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'প্রতিধ্বনি' বা রজনীকান্ত সেনের 'বাণী' ও 'কল্যাণী'কেও এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। উল্লিখিত কবিদের মধ্যে গিরিশচন্দ্রের 'ধুতুরা ফুল', 'অন্ধকার', বরদাচরণ মিত্রের 'আলোক', 'অন্ধকার', 'সুপ্তোত্থিতা', দরবেশের 'উর্বশী ও পুরূরবা', গিরিজানাথের 'মধ্যাহ্ন', 'হে মরণ', বিজয়চন্দ্রের 'লক্ষ্যপথে' প্রভৃতি কবিতা রবীন্দ্রনাথের কবিতার পাশে আজ হয়ত নিষ্প্রভ দেখায়। কিন্তু মনে রাখতে হবে, রবীন্দ্রনাথের প্রভাব দেশের সাহিত্যে সর্বাঙ্গীণ ভাবে বিস্তার লাভ করার আগেই এদের

জন্ম। সে হিসাবে এই সব কবির সৃষ্টিকে একেবারে উপেক্ষা করা সঙ্গত নয়। নিত্যকৃষ্ণ বসু এবং অক্ষয় চৌধুরীরও বহু প্রথম শ্রেণীর কবিতা আছে। অক্ষয় চৌধুরীর,

ডাগর ডাগর ফুটেছে টগর
গোলাপ প্রলাপ বাড়ায় মনে,
কামিনীর ফুল, হেসেই আকুল,
কেতকী কত-কি ছলনা জানে।
আমার হৃদয় আমারি হৃদয়,
বেচিনি ত তাহা কারুর কাছে,
ভাঙা-চোরা হক, যা হক তা হক,
আমার হৃদয় আমারি আছে!

ইত্যাদি কবিতা এক সময় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের আদর পেয়েছিল। দুঃখের বিষয়, নিত্যকৃষ্ণ বসু বা অক্ষয় চৌধুরীর রচনা মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠা থেকে সংগৃহীত হয় নি। নিত্যকৃষ্ণ বসুর 'সাহিত্যসেবকের ডায়েরী' বইখানিও আজ বিলুপ্ত। অথচ এই বইটি সমসাময়িক জীবন ও সাহিত্য সম্বন্ধে নানা প্রয়োজনীয় তথ্যে পূর্ণ। প্রিয়নাথ সেন এবং বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতাও সুখপাঠ্য, কিন্তু তাঁরা প্রধানত গদ্য-লিখিয়ে এবং গদ্যেই তাঁদের শক্তির পূর্ণতর বিকাশ হয়েছে।

এর পর থেকে ক্রমে রবীন্দ্র-ধারার অনুসরণই বাংলা কবিতার একমাত্র অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায়। এক নিঃশ্বাসে নাম করে যাওয়া যায়—ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী, রমণীমোহন ঘোষ, জগদিন্দ্রনাথ রায়, প্রমথনাথ রায়চৌধুরী, চিত্তরঞ্জন দাশ, দেবকুমার রায়চৌধুরী, নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য এবং আরো অনেকে। এঁদের ভাষা, ভঙ্গি, বক্তব্য, সবই রবীন্দ্রনাথ থেকে আহৃত। ভুজঙ্গধরের কয়েকটি বৈষ্ণব কবিতা, প্রমথ রায়চৌধুরীর 'তাজমহল', চিত্তরঞ্জনের 'সাগর-সঙ্গীতে'র দু-চারিটি ছত্র বা 'মালঞ্চে'র কোন কোন সনেট এবং নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের ছেলেদের জন্যে লেখা 'টুকটুকে রামায়ণ' ছাড়া এই পর্যায়ের আর কোন রচনার কোন উচ্চ সাহিত্যিক মূল্য আছে কিনা সন্দেহ।

রবীন্দ্র-সমসাময়িকদের মধ্যে কয়েকজন মহিলা-কবির এবং কয়েকজন মুসলমান কবির নামও উল্লেখযোগ্য। স্বর্ণকুমারী দেবীর 'মধ্যাহ্ন', 'প্রভাত' প্রভৃতি হাল্কা সুরের বর্ণনাত্মক কবিতা বা কয়েকটি গাথা-কবিতা বেশ সুখপাঠ্য। কামিনী রায়ের 'আলো ও ছায়া'য়, গিরীন্দ্রমোহিনীর 'অশ্রুকণা'য়, মানকুমারী

বসুর 'কাব্য-কুসুমাঞ্জলি'তে কিছু কিছু উপভোগ্য কবিতা পাওয়া যাবে। এঁদের বা প্রসন্নময়ী দেবীর, তাঁর কন্যা প্রিয়ম্বদা দেবীর, বা প্রমীলা নাগ, ইন্দিরা দেবী প্রভৃতির কবিতা এক সময় অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এক প্রিয়ম্বদা দেবী ছাড়া এঁরা সকলেই হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রকে আদর্শ-রূপে গ্রহণ করেছিলেন। কায়কোবাদ কবির 'মহাশ্মশান' এবং সৈয়দ হোসেনের 'শিবমন্দির', 'যমজ ভগিনী' প্রভৃতি কাব্য অবশ্যই বিস্তৃততর আলোচনার অপেক্ষা রাখে।

আধুনিক কবি ও কবিতা

রবীন্দ্রশিষ্য-রূপে পরিচিত কবিরাই ধীরে ধীরে কাব্যের বিষয় ও আঙ্গিক উভয় দিকে নূতনত্ব-আমদানির প্রয়োজন অনুভব করেন। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কালিদাস রায় প্রমুখ কবির নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত দেশ-বিদেশের কবিতার অনুবাদ করেই সব চেয়ে বেশী খ্যাতিমান হয়েছেন। তাঁর 'তীর্থসলিল' ও 'মণি-মঞ্জুষা' দু-খানি উল্লেখযোগ্য বই। বিভিন্ন ছন্দের ব্যবহারে এবং রকমারি তথ্যবস্তুকে কাব্যায়িত করায় তাঁর অসামান্য দক্ষতা। করুণানিধান মিষ্টি সুরের স্বপ্নবিহ্বল কবিতা লিখেছেন। 'ঝরা ফুল', 'শান্তিজল' তাঁর উল্লেখযোগ্য বই। যতীন্দ্রমোহন বাগচী এবং কুমুদরঞ্জন উভয়েই প্রধানত পল্লীকবি। বঙ্গপল্লীর সুখ-দুঃখ, শোভা-সৌন্দর্য তাঁদের রচনায় মনোরম হয়ে রূপ পেয়েছে। প্রথমের 'লেখা,' 'রেখা', 'নাগকেশর' এবং দ্বিতীয়ের 'উজানী', 'বন-তুলসী', 'অজয়' প্রশংসনীয় লেখা। কালিদাস রায় পুরানো ক্ল্যাসিক্‌সের আদর্শে লিখেছেন 'ঋতুমঙ্গল', বৈষ্ণব কবিতার আদর্শে 'ব্রজবেণু' এবং এই দুই দিকের কবিতাই তাঁর সব চেয়ে বিশেষত্বপূর্ণ। এছাড়া আধুনিক সুরের কবিতাসংগ্রহ 'হৈমন্তী'ও তাঁর উল্লেখযোগ্য বই।

এঁরা কিন্তু সকলেই ভাষা ও শব্দপর্যায় গ্রহণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ থেকে। জীবন-দর্শনও এঁদের আলাদা নয়। নূতন দর্শন ও নূতন কাব্য-ভাষা নিয়ে দেখা দিলেন অন্য তিনজন কবি, মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও নজরুল ইসলাম। এঁরাই বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার প্রথম ভিত্তি স্থাপন করেন।

মোহিতলাল রবীন্দ্রনাথের দেহাতীত কল্প-কামনার পরিবর্তে রক্তমাংসময় বাস্তবের ক্ষুধা-তৃষ্ণাকেই বলিষ্ঠ ভাষায় প্রকাশ করেছেন। তাঁর 'বিস্মরণী' ও

'স্মরগরল' বিখ্যাত বই। যতীন্দ্র সেনগুপ্ত রবীন্দ্রসাহিত্যের আনন্দবাদকে কঠিন হাতে আঘাত করেছেন। সৃষ্টির স্তরে স্তরে যত বেদনা, যত বঞ্চনা, তাকেই তিনি ব্যক্ত করেছেন তাঁর ইঞ্জিনীয়ার-সুলভ গ্রন্থিবহুল ভাষায়। এই সঙ্গেই তাঁর লেখায় আছে শাণিত বিদ্রূপের ছোঁয়া। 'মরুশিখা', 'মরীচিকা', 'মরুমায়া' ও 'সায়ম্' কাব্যে তাঁর সর্বোত্তম কবিতাগুলি গ্রথিত হয়েছে। এ দু-জনের তুলনায় নজরুলে কবি-প্রতিভা অগভীর, যদিও যৌবনবেগ ও জীবনোত্তাপে তাঁরই অগ্রগণ্য আসন।

এই কবিত্রয়ের, বিশেষত শেষ দু-জনের দৃষ্টি সমাজের সর্বাধিকার-বঞ্চিত সাধারণ মানুষদের দিকে প্রথম আকৃষ্ট হয়েছে, যার মধ্যে মমতার্দ্র কল্পনা-বিলাস নেই, আছে বিদ্রোহের বাণী। নজরুলের 'অগ্নিবীণা', 'দোলন চাঁপা', 'ফণী-মনসা' প্রসিদ্ধ বই।

এই সঙ্গে কিরণধন চট্টোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রলাল রায়, সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, অপরাজিতা দেবী, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, জসিমউদ্দীন প্রভৃতি কবির নামও বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে বাংলা কাব্য সাহিত্যে এল নূতন একটি যুগ-চেতনা। কাব্যের বিষয়বস্তু ও প্রকাশ-ভঙ্গি উভয় ক্ষেত্রেই প্রচলিত ঐতিহ্যের বিরোধী হয়ে উঠলেন কতক কবি এবং এক দিকে যেমন তাঁরা গদ্য ও পদ্যের মাঝখানকার ভাষাগত দূরত্ব মুছে ফেলার জন্যে চেষ্টা করতে লাগলেন, অন্যদিকে তেমনি আবেগ-প্রাধান্যের স্থানে আনতে চাইলেন বুদ্ধি-প্রাধান্য। কতক কবি অবশ্য যুগ-চেতনাকে স্বীকার করে নিয়েও ঐতিহ্য-বিরোধী হলেন না।

এই দুই পর্যায়ের কবিরাই সাধারণ ভাবে আধুনিক কবিতা নামে পরিচিত। এঁদের মধ্যে জীবনানন্দ দাশ (মহাপৃথিবী ও ধূসর পাণ্ডুলিপি), প্রেমেন্দ্র মিত্র (প্রথমা, ফেরারী ফৌজ), বুদ্ধদেব বসু (বন্দীর বন্দনা, কঙ্কাবতী), অজিত দত্ত (পাতাল-কন্যা) এক দিকের এবং সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (ক্রন্দসী, সংবর্ত), অমিয় চক্রবর্তী (খসড়া, পালাবদল), বিষ্ণু দে (চোরা-বালি), সুভাষ মুখোপাধ্যায় (পদাতিক), সুকান্ত ভট্টাচার্য (ছাড়পত্র) অন্য দিকের প্রশংসিত কবি। এছাড়া মনীশ ঘটক, বিমলচন্দ্র ঘোষ, দিনেশ দাস, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, অশোকবিজয় রাহা, হরপ্রসাদ মিত্র, নীরেন চক্রবর্তী, মণীন্দ্র রায়, শুদ্ধসত্ত্ব বসু প্রমুখ কবিও প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন।

চতুর্থ অধ্যায়

গান

ইতিপূর্বে বহু শাখায় বিভক্ত প্রাচীন গীতি-সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করেছি এবং তাতে দেখিয়েছি যে, এক-একটা ধর্ম সম্প্রদায়ের আওতায় তাদের এক-একটি শাখার উদ্ভব হয়েছে। সেই সঙ্গে এ কথাও বোঝাতে চেষ্টা করেছি যে, সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ মিলন-বিরহকে ধর্মের রূপকে আড়াল করে প্রকাশ করাই ছিল তখনকার রীতি। কিন্তু শিক্ষিত সমাজের বাইরে জনসাধারণের ভেতর যে সব গান জন্মেছে, বাউল, ভাটিয়ালী, মুর্শিদা প্রভৃতি পল্লীসঙ্গীত, তাতে এই প্রচলিত প্রসিদ্ধির অনুসরণ দেখা যায় না। রচনা-পদ্ধতিতেও সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের বাঁধা বুলি আবৃত্তি করার চিহ্ন নেই সে সব গানে। এছাড়া অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাশেষি মানবিক প্রেমকে স্বীকার করে নেবার একটা প্রয়াস এসেছিল রাম বসু, নিধুবাবু প্রভৃতিতে; কিন্তু তা পূর্ণতা লাভ করে নি।

ইংরেজী আমলে দেশের শিক্ষা-সংস্কৃতি ও জীবন-নীতি যখন আমূল পরিবর্তিত হয়ে গেল, তখন দেশের সাহিত্যাদর্শও প্রাচীন সাহিত্যের ধারা অস্বীকার করে নবযুগের প্রেরণায় রূপান্তরিত হতে লাগল। এযুগের গীত-সাহিত্যে যুগধর্মের এই প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীন ধর্মসঙ্গীতের স্থানে এযুগে এল ব্রহ্ম-সঙ্গীত, দেব-দেবী-সঙ্গীতের স্থানে এল স্বদেশী সঙ্গীত, প্রকৃতি ও প্রেম নিয়ে রচিত হল নূতন প্রেম-সঙ্গীত। এছাড়া এল কৌতুক-সঙ্গীত, নৃত্য-সঙ্গীত, আরো রকমারি গান।

রামমোহন রায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিবনাথ শাস্ত্রী, মনোমোহন বসু, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, বহু কবির সম্মিলিত দানে আধুনিক বাংলা গানের ইতিহাস সমৃদ্ধ হয়েছে। এঁদের পরও গানের ধারা অব্যাহত বেগে চলেছে। তার মধ্যে নজরুল ইসলাম ও অতুলপ্রসাদ নিজস্বতার পরিচয় দিয়ে যশস্বী হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল ও রজনীকান্তের স্বদেশী গান, দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান, রবীন্দ্রনাথের প্রেমের

গান এবং নজরুল ইসলামের গজল গান ঘরে ঘরে প্রচার লাভ করেছে। আজকের গীতকারদের ওপর এঁদের, বিশেষত রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অসাধারণ। দ্বিজেন্দ্রলাল বাংলা গানে প্রথম ইংরেজী সুর সংযোজন করেছেন। রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত করেছেন নানা মিশ্রসুর। দেশী কীর্তন ও বাউল এবং ক্ল্যাসিকাল সুরের সঙ্গেই তিনি বিদেশী সুরও এনেছেন প্রচুর।

রামমোহন রায়

আধুনিক বাংলা গান প্রাচীন গান থেকে বিষয়, বিন্যাস এবং সুর, তিন দিক থেকেই সম্পূর্ণ আলাদা। এই পার্থক্যের প্রথম নিদর্শন হল ব্রহ্ম-সঙ্গীত। উপধর্ম-প্রপীড়িত বাংলা সাহিত্যে ভগবৎ-সঙ্গীত নূতন জিনিস নয়, কিন্তু ভগবৎ-স্বরূপ উপলব্ধি করার যে নূতন দৃষ্টি দেশে আসে ব্রাহ্মধর্ম থেকে, ব্রহ্ম-সঙ্গীতে তাকেই পাওয়া গেল নূতন করে। ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামমোহন রায়ই প্রথম ব্রহ্ম-সঙ্গীত রচনা করে বাংলা গানের স্রোতকে এই দিকে ফিরিয়ে দেন। রামমোহন রায়ের গানের কোথাও কাব্য-সুষমা নেই। নিছক নির্বিশেষ তত্ত্বকথাকে তিনি রূঢ় বৈদান্তিক ভাষায় ছন্দোবদ্ধ করেছেন। যেমন,

একদিন হবে যদি অবশ্য মরণ।
এত দম্ভ অহংকার কর কি কারণ।
এই যে মানবদেহ,
যারে এত কর স্নেহ,
ভস্মসার হবে তার মস্তক চরণ॥

কিংবা,

মন রে মনে কর শেষের সেদিন ভয়ংকর।
অন্যে কথা কইবে কিন্তু তুমি রৈবে নিরুত্তর।

বলা বাহুল্য, রসিক মনের পক্ষে এ সব সঙ্গীত নিতান্তই গুরুপাক। সৌভাগ্যের বিষয়, ঠাকুর-ভ্রাতৃবৃন্দ, চিরঞ্জীব শর্মা, বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ কবিরা পরবর্তী কালে রামমোহন-প্রবর্তিত এই তত্ত্বসঙ্গীতের কঙ্কালে রস-রক্ত সংযোজন করে তাকে সজীব করে তোলেন। সত্যিকার ব্রহ্ম-সঙ্গীতের জন্ম এই সময় থেকে এবং এঁদের পর খ্যাত-অখ্যাত বহু কবিই ব্রহ্ম-সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। 'ব্রহ্ম-সঙ্গীত' বইয়ে এই সব গান সংগৃহীত হয়েছে।

'এই বিশ্ব-মাঝে যেখানে যা সাজে', 'মন চলো নিজ নিকেতনে,' 'অন্তর-দেবতা তিনি', 'গাও রে তাঁহার গুণগান', 'তুমি আমাদের পিতা' প্রভৃতি গান নিশ্চয় অনেকে শুনেছেন। কিন্তু এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, সাহিত্য-সম্পদে এরা প্রাচীন সঙ্গীত থেকে অনেক বেশী পশ্চাদ্বর্তী। তার কারণ বোধ হয় এই যে, রচয়িতারা যত বড় ব্রাহ্ম ছিলেন, তত বড় কবি ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবে সেই অসম্পূর্ণতা দূর হল। তাঁর হাত দিয়ে যে ব্রহ্ম-সঙ্গীত এল, তা প্রথমত সঙ্গীত, তারপর ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা।

গীতাঞ্জলি, গীতালী, গীতিমাল্য ইত্যাদি গানের বইয়ে রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্ম-সঙ্গীত সংকলিত হয়েছে। কিন্তু একটা কথা এই প্রসঙ্গে বলে রাখা দরকার যে, রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্ম-সঙ্গীতকে প্রেম-সঙ্গীত বা প্রকৃতি-সঙ্গীত রূপে নিতেও বাধা হয় না। জ্ঞান-পন্থা এবং ভক্তি-পন্থা দুইয়ের সঙ্গেই তাতে মিশ্রণ হয়েছে জাগ্রত কবি-কল্পনার।

স্বদেশী আন্দোলন

স্বদেশীয়ানা বাংলা সাহিত্যে এসেছিল ঈশ্বর গুপ্ত দিয়ে এবং মাইকেল, রঙ্গলাল, বঙ্কিম, দীনবন্ধু, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রমুখ বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিকরা প্রধানত দেশপ্রেমকেই তাঁদের সাহিত্য-সৃষ্টির প্রধান প্রেরণা-রূপে নিয়েছিলেন। বঙ্কিম লিখেছিলেন বন্দেমাতরম্ গান এবং এই গানে বাংলা ও বাঙালীর কামনাকে ভাষা দিয়েছিলেন। শস্যশ্যামলা সুজলা সুফলা বাংলা দেশের ওপর হিমালয়-দুহিতা অন্নদাত্রী জগন্মাতা দুর্গার রূপক আরোপ করে বঙ্কিম এই গান রচনা করেছেন। এ গান হিন্দু বাঙালীর গান, তাতে আর সন্দেহ নেই। রাজনৈতিক কারণে পরে বন্দেমাতরম্ সর্বভারতীয় জাতীয়-সঙ্গীত হয়েছে এবং জাতি, ব্যক্তি ও সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ ভাবে সকলের কাছে এর প্রতি বশ্যতা দাবী করা হয়েছে। কিন্তু সে অনেক পরের কথা। বঙ্কিম-যুগের মধ্যপর্বে হিন্দুমেলার উদ্যোগ হয় এবং তার উদ্দীপনা থেকে বাংলায় প্রথম স্বদেশী গানের প্রবল ঢেউ আসে।

এদিকেও ঠাকুর-ভ্রাতৃবৃন্দের নামই সর্বাগ্রে স্মরণীয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ সত্যেন্দ্র-নাথ ঠাকুরের,

মিলে সব ভারত-সন্তান,
এক তান মন প্রাণ,
গাওরে ভারতের যশোগান…

অথবা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের,

জ্বল জ্বল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ
পরাণ সঁপিবে বিধবা বালা…

এক সময়ের উল্লেখযোগ্য গান।

কবি মনোমোহন বসুর 'দিনের দিন হয়ে দীন', কবি গোবিন্দ রায়ের 'কত কাল পরে বল ভারত রে', দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'না জাগিলে সব ভারতললনা', শিবনাথ শাস্ত্রীর 'চাহি না সভ্যতা, চাষা হয়ে থাকি' ইত্যাদি গানও এই সময়ের। আনন্দচন্দ্র মিত্র, দীনেশচরণ বসু, সেদিনকার অনেক কবিই হিন্দুমেলার অন্তপ্রেরণায় দেশাত্মবোধক গান লিখেছিলেন।

এই সমস্ত গানের দু-একটি ছাড়া (যেমন, 'কত কাল পরে' বা 'মিলে সব ভারত সন্তান') অধিকাংশ রচনাই সাহিত্যের দিক থেকে অপাংক্তেয়। একটা সাধারণ জাতীয় চেতনা এবং আত্মমর্যাদা-বোধের প্রকাশ ভিন্ন অন্য কিছু পাওয়া যায় না এদের ভেতর। অর্থাৎ এই সব গানের রচয়িতারা কেউ সত্যিকার কবি ছিলেন না। তাছাড়া দেশের আবহাওয়ায় সেদিন সত্যিকার দেশাত্মবোধের উদ্দীপনাও ছিল না। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রেরণা থেকে এসেছিল একটা স্বাধীনতার স্পৃহা, সেই প্রেরণার ফলে দেশের সত্য এবং কল্পিত ইতিহাসের ভেতর দিয়ে দেশবাসীর মন আত্ম-প্রকাশের পথ খুঁজছিল। তারি কিছুটা অভিব্যক্তি হয়েছে এইসব অপটু রচনায়।

স্বদেশী আন্দোলনের যুগে দেশে হঠাৎ যে রাজনৈতিক আন্দোলন দেখা দিল, তার প্রেরণায় সাহিত্যেও এল নূতন উদ্দীপনা। যে চেতনা ছিল অস্ফুট, ইতিহাসের পাতায় আবদ্ধ, বাস্তব জীবনের সংঘাতে তা উঠল সজীব হয়ে এবং বাংলার চতুঃসীমা ছাড়িয়ে তা সর্বভারতে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ল। সে আন্দোলন আমাদের মনের মাটিকে বিশেষ ভাবে উর্বর করে দিয়ে গেছে। নাটকে-উপন্যাসে, কাব্যে-গানে, বাংলা ভাষায় সেদিন এক নূতন সৃষ্টির জোয়ার এসেছিল।

রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল এবং রজনীকান্তের প্রসিদ্ধ গানগুলির জন্ম এই সময়ে। এক বন্দেমাতরম্ ছাড়া আমাদের দেশে স্বদেশী সঙ্গীত বলতে যে সমস্ত গান বুঝি, তার সবই এই তিন কবির লেখা। এঁদের পেছনে আরো অনেক কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন, তাঁরাও দেশপ্রেমাত্মক গান লিখেছিলেন।

কিন্তু সাধারণ স্বদেশী প্রোপাগ্যাণ্ডার স্তর ছাড়িয়ে তার বেশির ভাগই সাহিত্যের কোঠায় ওঠে নি। কাব্য-বিশারদের,

বন্দে মাতরম্ বলে,
যায় যাবে যাক প্রাণ চলে।
বেত মেরে কি মা ভুলাবি,
আমি কি মার সেই ছেলে?
দেখে রক্তারক্তি বাড়বে শক্তি,
কে পালাবে মা ফেলে?

কিংবা অশ্বিনী দত্তের,

তব দ্বারদেশে এসেছে ভিখারী
দেহ কৃপা করি কি দিবে তাহায়,
স্বদেশসেবক এ সব যাচক,
তুষ্ট হবে তব সুমিষ্ট কথায়···

ইত্যাদি গান গানই, সাহিত্য নয়।

রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল

রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশী গান ভাষার ঐশ্বর্যে, অলংকারের প্রাচুর্যে, সুরের বৈচিত্র্যে বাংলা ভাষার চিরস্থায়ী সম্পদ। রবীন্দ্রনাথের 'অয়ি ভুবন-মনোমোহিনী', 'দেশ দেশ নন্দিত করি', 'জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে' বা দ্বিজেন্দ্রলালের 'ধনধান্যে পুষ্পে ভরা', 'যেদিন সুনীল জলধি হইতে', 'বঙ্গ আমার জননী আমার' প্রভৃতি গান শোনেননি বা গাননি, এমন বাঙালীই কেউ আছেন কিনা সন্দেহ। দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশী গানে আছে পৌরুষের প্রদীপ্ত হুংকার, রবীন্দ্রনাথে তার স্থানে আছে শান্তির প্রোজ্জ্বল মহিমা। কিন্তু এই দু-জন কবির কেউ দেশের প্রত্যক্ষ অবস্থার দিকে তাকাননি। দ্বিজেন্দ্রলালের,

ভায়ের মায়ের এত স্নেহ, কোথায় গেলে পাবে কেহ,
ওমা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমি ধরি,
আমার এই দেশেতে জন্ম যেন, এই দেশেতে মরি···

এবং রবীন্দ্রনাথের,

আঁখি মেলে তোমার আলো
প্রথম আমার চোখ জুড়াল,
সেই আলোতে নয়ন রেখে
মুদব নয়ন শেষে ··

প্রভৃতি মনোরম রচনা সন্দেহ নাই। কিন্তু স্বাস্থ্যহীন, অন্নহীন, দীন দরিদ্র বাঙালীর প্রত্যক্ষ অবস্থা থেকে এই অন্তিম প্রার্থনা উৎসারিত হয় কি?

এদিক থেকে রজনীকান্ত দেশবাসীর অনেক কাছের মানুষ। দেশের দীন-দুঃখীদের সঙ্গে এক হয়ে তিনি পরাধীনতার দুঃখকে ভাষা দিয়েছেন,

নেহাৎ গরীব আমরা, আমরা নেহাৎ ছোট,
তবু ত্রিশ কোটি ভাইবোন জেগে ওঠো···

কিংবা,

ও চাষী ভাই, ও তাঁতী ভাই, আজকে সুপ্রভাত···

দুঃখের বিষয়, রজনীকান্তের দৃষ্টি এবং দরদ যত গভীর, কবিত্ব ছিল তার অনুপাতে কম। তাই তাঁর এই সব গান অনেক স্থানেই বিবৃতির আকার ধরেছে, কাব্যের সুষমা লাভ করতে পারে নি।

ব্রহ্ম-সঙ্গীত ও স্বদেশী গানের আলোচনা-প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, এই শ্রেণীর গান অনেকটা উদ্দেশ্যমূলক। বড় প্রতিভার হাতে বিশেষত্ব লাভ করলেও, সত্যিকার সাহিত্যরস তাই এই সব গানে খুব বেশী জমে উঠতে পারে না। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, আধুনিক গান এই উদ্দেশ্যের স্তর অতিক্রম করে প্রকৃত সাহিত্যই হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল এবং রজনীকান্ত, এই তিন জন প্রসিদ্ধ গীতকারের মধ্যে প্রথম দু-জনের গানে বিষয়, রস ও সুরের যে বৈচিত্র্য দেখা যায়, বাংলা গানের ইতিহাসে তার তুলনা হয় না। রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গান এবং দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান যদিও জনসমাজে সব চেয়ে বেশী আদৃত এবং এ দুই কবির প্রকৃত শক্তির বিকাশও হয়েছে যদিও এই দুই বিভাগে, তবু উভয়ের অন্যান্য পর্যায়ের গানগুলিরও উৎকর্ষ কম নয়।

রবীন্দ্রনাথের ধর্ম-সঙ্গীত নিয়ে আগেই আলোচনা করেছি। প্রেম-সঙ্গীত সম্বন্ধেও দু-এক কথা বলা দরকার। এখানে মনে রাখতে হবে, কবির ধর্ম-সঙ্গীত আর প্রেম-সঙ্গীতের মাঝখানে কোন সীমারেখা টানা যায় না। ভগবৎ-প্রেম

ও মানব-প্রেম তাঁর গানে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে গেছে। প্রকৃতির নানা অবস্থান্তর নিয়ে তাঁর যে সমস্ত গান, এক হিসাবে তা-ও তাঁর ধর্ম এবং প্রেম-সঙ্গীতেরই শ্রেণীভুক্ত। প্রকৃতির বিচিত্র ভাঙা-গড়ার ভেতর তিনি অনির্বচনীয় সুন্দরের, লোকাতীত অরূপের লীলা প্রত্যক্ষ করেছেন এবং তার সঙ্গে মানবাত্মার যোগসূত্রটি আবিষ্কার করেছেন, এ লক্ষ্য করবার মতো।

দ্বিজেন্দ্রলালের প্রেম-সঙ্গীতও চমৎকার এবং রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে তার পার্থক্য এই যে, তার আবেদন প্রত্যক্ষ। 'এ-জীবনে পূরিল না সাধ ভালোবাসি' প্রভৃতি গান দ্রষ্টব্য। দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান অসামান্য। তার শব্দ-যোজনার কায়দা, বিষয়-সমাবেশের নূতনত্ব, সর্বোপরি প্রকাশভঙ্গির অনায়াস স্বচ্ছতা যেমন, তার অন্তর্নিহিত অনাবিল ও অনাক্রমণাত্মক কৌতুকপ্রবণতা তেমনি উপভোগ্য। ব্যক্তি বা সম্প্রদায়-বিশেষের সম্ভ্রমহানি না করেও যে নির্মল হাস্যরস সৃষ্টি করা যায়, এই গানগুলি তার উজ্জ্বল নিদর্শন। 'নন্দলাল', 'আমরা বিলাত-ফেরতা ক-ভাই', 'আমরা Reformed Hindus', 'তারেই বলে প্রেম', 'আধুনিক রাধাকৃষ্ণ' ইত্যাদি গানের যে-কোনটা দৃষ্টান্তস্বরূপ নেওয়া যেতে পারে। দৃষ্টিভঙ্গির এই ঔদার্যই গানগুলিকে সর্বজনের প্রিয় করেছে। সেই,

নন্দলাল ত একদা একটা করিল ভীষণ পণ,
স্বদেশের তরে যে করেই হক, রাখিবে সে জীবন···

অথবা,

দেখো হতে পার্তাম আমি একটা মস্ত বড় বীর,
কিন্তু গোলাগুলির শব্দে কেমন মাথা রয় না স্থির···

কিংবা,

তারেই বলে প্রেম,
যখন থাকে না ফিউচারের চিন্তা, থাকেনাক শেম···

কে না পড়েছেন, কার না ভালো লেগেছে? বাংলা সাহিত্যে এরা নূতন এবং আজ পর্যন্ত এর সমকক্ষ গান কেউ লিখতে পারেননি।

রজনীকান্ত

রজনীকান্ত কবি হিসাবে রবীন্দ্র-দ্বিজেন্দ্র-স্তরের নন, কিন্তু তাঁর রচনাতেও নিবিড় আর্তি ও আকুলতার একটি মনোরম আবেদন শোনা যায়।

প্রাণের পথ বয়ে গিয়েছে সে গো,
চরণ চিরবেখা আঁকিয়া যে গো…

কিংবা,

ফুটিতে পারিত গো, ফুটিল না সে,
মরমে মরে গেল, মুকুলে ঝরে গেল,
বুকভরা আশা সমাধি-পাশে…

হৃদয়গ্রাহী রচনার আদর্শ হিসাবে আজো সমাদরে গৃহীত হবার যোগ্য। ভক্তিমূলক গানে রজনীকান্ত অনেকটা যেন রামপ্রসাদের ধারা অনুসরণ করেছিলেন। যেমন,

আমায় সকল রকমে কাঙাল করেছ গর্ব করিতে চূর।
যশ, অর্থ, মান, স্বাস্থ্য, সকলি করেছ দূর!
ভাবিতাম আমি লিখি বুঝি বেশ,
আমার সঙ্গীত ভালোবাসে দেশ,
তাই কি দয়াল ব্যাধি দিলে মোরে, বেদনা দিলে প্রচুর?

থিয়েটারে গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রাজকৃষ্ণ রায়, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রমুখ নাট্যকারের বহু গানও এককালে দেশে সমাদৃত ছিল। কিন্তু সে সমস্ত রচনা নিয়ে এখানে আলোচনার সুযোগ হবে না।

অতুলপ্রসাদ

এঁদের পর সঙ্গীত-রচয়িতা হিসাবে নাম করতে হয় কবি অতুলপ্রসাদের, যিনি রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল ও রজনীকান্তের মতো একই সঙ্গে গীতস্রষ্টা এবং গায়করূপে প্রসিদ্ধ।

অতুলপ্রসাদের 'দোলে দোলে ফুল,' 'যদি তোর হৃদ-যমুনা,' 'মিছে তুই ভাবিস ওরে,' 'ওগো সাথী মম সাথী,' 'নিদ নাহি আঁখিপাতে' ইত্যাদি গান সুপরিচিত এবং কৌতুকের বিষয়, অনেক ক্ষেত্রে এগুলি রবীন্দ্রনাথের রচনা বলে চলে। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, রবীন্দ্রোত্তর যুগের সমস্ত কবির মতো অতুলপ্রসাদের গানেও পদ-বিন্যাস এবং শব্দ-যোজনার ওপর রবীন্দ্রনাথের বিশেষ প্রভাব দেখা যায়। কিন্তু রবীন্দ্র-সঙ্গীতের প্রাণ-ধর্ম যাঁরা হৃদয়ঙ্গম করেছেন, তাঁরা অবশ্যই স্বীকার করবেন যে, এই সমস্ত গানে শুধু রবীন্দ্রনাথের ভঙ্গিটাই অনুসরণ করা হয়েছে। অতুলপ্রসাদের অধিকাংশ গানই সুর থেকে বিচ্ছিন্ন হলে বিশেষ উপভোগ্য থাকে না।

অবশ্য বিশুদ্ধ সাঙ্গীতিক দিক থেকে গানের 'কথা' হল সুরের বাহন। সুরটাই লক্ষ্য, কথা তার উপলক্ষ্য। কিন্তু বাংলা গানে বাণীকে লাউ-এর বোঁটার মতো ধরে আনার উপায় মাত্র মনে করা হয়নি কোন দিন। প্রাচীন হক, আর আধুনিক হক, বাংলা গীত-সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন যেগুলো, 'কথা'র দিক থেকে তা বরাবর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এইজন্যেই বাংলা ভাষায় হয়ত খাঁটি রাগ-সঙ্গীত গড়ে ওঠেনি। কিন্তু এতেই বাংলা গান তার নিজস্বতা লাভ করেছে। সে সে-কালেও, এ-কালেও।

অতুলপ্রসাদের গানের ভাষা স্নিগ্ধ, ভঙ্গি পেলব, আবেদন করুণ ও কমনীয়। যেমন,

গগনে বাদল, নয়নে বাদল
বাদলে পরাণ ছাইয়া,
এসো হে আমার বাদলের বঁধু,
চাতকিনী আছে চাহিয়া।
এ জীবনভার হয়েছে অবহ,
সঁপিব তোমারি হাতে।
নিদ নাহি আঁখিপাতে।

সমসাময়িক কবিদের মধ্যে হেমেন্দ্রকুমার রায় এবং কাজি নজরুল ইসলাম গান লিখে প্রসিদ্ধ। উভয়ের, বিশেষত নজরুলের গান বাংলা দেশের তরুণ-মনে অল্পদিন আগেও কল্লোল তুলেছিল। হেমেন্দ্রকুমার রায়ের গানে চটুল শব্দ ও লঘু সুরের অনায়াস লীলা লক্ষ্য করার মতো।

নজরুল ইসলাম

নজরুল ইসলাম রবীন্দ্রোত্তর যুগের বিশিষ্টতম গীতকার। তাঁর গীত-সাহিত্যের বৈচিত্র্য এবং বিশিষ্টতা দুইই অসাধারণ। তাঁর,

ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল, নিম্নে উতলা ধরণীতল
অরুণ প্রাতের তরুণদল, চল রে চল রে চল···

অথবা,

দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার,
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুঁশিয়ার!···

শ্রেণীর ওজোগুণ-বিশিষ্ট গান তাঁর আগে আমরা কমই পেয়েছি। বাঙালী সামরিক জাত নয়, তার সাহিত্যে সত্যিকার শৌর্য কোন দিন ভালো করে প্রকাশ পায় নি। নজরুল বাংলা গানের আসরে সামরিক পৌরুষের সুর প্রথম এনেছেন। আবার গজল গানের লীলায়িত কোমলতাও তাঁরি একক সৃষ্টি। যেমন,

আমারে চোখ-ইসারায় ডাক দিলে হায়,
কে গো দরদী,
খুলে দাও রঙমহলার তিমির-দুয়ার,
ডাকিলে যদি।

কিংবা,

রুম ঝুম রুম ঝুম
কে এলে নূপুর পায়?
ফুটিল শাখে মুকুল
ও রাঙা চরণ-ঘায়।

ভাবী দিনে নজরুল হয়ত তাঁর সমস্ত কবিতা ও গান অপেক্ষা এই মনোরম গজলের জন্যেই বেশী স্মরণীয় হবেন।

পঞ্চম অধ্যায়

নাটক

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে নাটক ছিল না। ইংরেজ আমলে ইংরেজী নাটকের আদর্শে প্রথম বাংলা ভাষায় নাটক লেখা সুরু হয়। আধুনিক পর্বের প্রথম নেতা ঈশ্বর গুপ্ত এদিকে অল্প একটু হাত চালিয়েছিলেন, কিন্তু সাফল্য লাভ করতে পারেননি। তাঁর পর নাটুকে রামনারায়ণ তর্করত্ন লেখেন 'কুলীনকুল-সর্বস্ব'। এইটি হল বাংলা ভাষায় প্রথম অভিনীত নাটক। এর পর মাইকেল, দীনবন্ধু, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, মনোমোহন বসু একাদিক্রমে ঐতিহাসিক, পৌরাণিক ও সামাজিক নাটক লিখে বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ভিত্তি স্থাপন করেন। এঁদের মধ্যে দীনবন্ধুই হলেন সত্যি জাতের নাট্যকার, যাঁর অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র প্রশস্ত, অনুভূতি সূক্ষ্ম এবং রসজ্ঞান সজাগ।

তাঁর আগের বা সমকালের লেখকেরা নাটক লিখতেন, হয় কোন মহৎ-চরিত্রের আদর্শ দেখাবার জন্যে, নয় কোন দেশাচারের ত্রুটি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার জন্যে। তাঁদের দৃষ্টি তাই সীমাবদ্ধ থাকত কতকগুলি নির্দিষ্ট টাইপ ও নীতির গণ্ডিতে। দোষে গুণে, ভালোয় মন্দয় যে জীবন নিত্য-প্রবাহিত, তাকেই নাটকের বিষয়রূপে গণ্য করেন দীনবন্ধু। দীনবন্ধুর পর দেশে প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হয় এবং নাট্যাভিনয় চলতে থাকে ব্যবসা হিসাবে। এই সময় যাঁরা নাট্যকার-রূপে দেখা দেন, তাঁদের নাম বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, অমৃতলাল বসু, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রভৃতি এই দলের অন্তর্গত। এঁদের মধ্যে গিরিশচন্দ্র পৌরাণিক এবং ক্ষীরোদপ্রসাদ ও দ্বিজেন্দ্রলাল ঐতিহাসিক নাটকে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। অমৃতলালের কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে সামাজিক প্রহসনে।

গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রমুখ কবির নাটক রঙ্গমঞ্চে বেশ জমে। রবীন্দ্রনাথের নাট্য-সাহিত্যে আভিনয়িক গুণের অভাব, কিন্তু সাহিত্য-রূপে সেগুলি মনোরম। একালে বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ধারা ক্রমশ

ক্ষীণ হয়ে এসেছে। আজকের দিনে সামাজিক নাটকের চাহিদা বেশী, কিন্তু নাট্যালয়গুলিতে আজো চলছে পুরাণেতিহাসের প্রতিপত্তি। সমসাময়িক লেখকরা কেউ কেউ সামাজিক নাটকে হাত দিয়েছেন, কিন্তু স্থায়ী সাহিত্য খুব বেশী সৃষ্টি হয়নি।

বাংলাদেশে নাটক এবং নাট্যালয় দুইয়েরই জন্ম ইংরেজ আমলে। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে নাটক নেই। এদেশে অভিনয়ের আসর জমত মঙ্গল গান, পাঁচালি, কীর্তন এবং কথকতা দিয়ে। একজন গায়ক বা কথক পৌরাণিক কোন কাহিনী গদ্যে, পদ্যে বা গানে বিবৃত করে যেতেন, দোহারেরা মৃদঙ্গ ও মন্দিরা-সহযোগে তাঁর সঙ্গে করতেন সঙ্গত। আর ছিল কবি ও তরজা গান। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের যাঁরা খবর রাখেন, তাঁরা অবশ্যই জানেন যে, বৈষ্ণব কবিতা, মঙ্গলকাব্য, কবির গান, এক কথায় যা আমাদের সাহিত্যের পুঁজি, তার কোনটাই প্রথমে সাহিত্যসৃষ্টির উদ্দেশ্যে লেখা হয়নি, হয়েছে আসরে গাইবার জন্যে। তাই সাধারণের মধ্যে এ সমস্তই ছিল পালা নামে পরিচিত।

এই সব পালার ভেতর দিয়ে দেশকে ধর্ম-কর্ম, আচার-অনুষ্ঠান যেমন শেখানো হত, তেমনি আনন্দ, বেদনা, প্রীতি, ভক্তি, হাসি-তামাসার খোরাকও জোগানো হত। অর্থাৎ এই ছিল তখনকার অভিনয়। সে-কালের নাট্যরুচি তৃপ্ত হত এতেই।

এরপর আসে যাত্রা। গোপাল উড়ের 'বিদ্যাসুন্দর' গানই বোধ হয় পুরানো যাত্রার প্রথম উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। 'কমলে কামিনী', 'উষা-হরণ' প্রভৃতি যে সমস্ত পুরানো পালা ছিল, তা অধিকারীদের খাতায় লেখা থাকত এবং পুরুষানুক্রমিক সম্পত্তিরূপে হস্তান্তরিত হয়ে চলত। এই সব যাত্রাগানের অনুসরণে উনবিংশ শতাব্দীতে একখানা নাটক লেখা হয়েছিল। সে হল তারাচাঁদ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন' নাটক। বাংলা ভাষায় এটিই প্রথম নাটক। শহরে রঙ্গমঞ্চের প্রথম অভিনীত নাটক হল রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুল-সর্বস্ব'। আশ্চর্যের বিষয়, ভগবৎ-মহিমাত্মক পৌরাণিক আখ্যান ছেড়ে, সামাজিক সমস্যা নিয়ে বইটি লেখা।

রামনারায়ণ

টেকচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল' যেমন বাংলা ভাষার প্রথম উপন্যাস, 'কুলীনকুল-সর্বস্ব' তেমনি প্রথম নাটক এবং দুইয়েরই অবলম্বন সমসাময়িক

জীবন। টেকচাঁদ প্রথম ইংরেজী শেখার নেশায় উদ্‌ভ্রান্ত 'ইয়ং বেঙ্গল'কে বিদ্রূপ করেছিলেন, আর রামনারায়ণ করেছিলেন প্রাচীনপন্থী হিন্দুদের গোঁড়ামিকে বিদ্রূপ। তদানীন্তন কুলীন সমাজে বহু-বিবাহের উৎপাতে কি ধরনের কদাচার প্রবেশ করেছিল, তা দেখানোর জন্য এই বই লেখা এবং সে লেখায় বেশ মুন্সিয়ানা আছে।

একটি বিবাহ-ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ বহু বর্ষ পূর্বে এক কুমারীর পাণিগ্রহণ করেছিলেন। দারিদ্র্যের দায়ে অনেক কাল পরে প্রণামী নেবার প্রয়োজনে সেই পত্নীর সন্ধানে তিনি শ্বশুরবাড়ী আসছেন। পথে পুকুরঘাটে এক বর্ষীয়সী মহিলাকে দেখলেন। তাঁকে মাতৃ-সম্বোধন করে শ্বশুর-ভবনের ঠিকানা জিজ্ঞাসা করলেন। পরে শ্বশুরবাড়ী এসে সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন, ঐ মহিলাই তাঁর একদা-বিবাহিতা পত্নী! মোটের ওপর কাহিনীটি এই। এর ভেতর ফলার-মহিমা আছে, ধর্মাধর্মের বিবাদ আছে, তদানীন্তন সামাজিক রীতি-নীতির অনেক কৌতুকপ্রদ চিত্র আছে। অবশ্য উচ্চাঙ্গের নাটকীয় বৈশিষ্ট্য বেশী কিছু নেই এতে। এ একটি হাল্কা প্রহসন। 'রুক্মিণীহরণ' এবং 'নব নাটক' ইত্যাদি আরো কয়েকখানি নাটক আছে তাঁর।

মাইকেল

তর্করত্নের অল্প পরে মাইকেল। মাইকেল সর্বপ্রথম নাট্যকার-রূপেই বাংলা সাহিত্যে দেখা দিয়েছিলেন এবং ঐতিহাসিক নাটক, বিয়োগান্ত নাটক, প্রহসন, সবই বাংলা ভাষায় প্রবর্তিত করেন তিনি। সুপণ্ডিত মাইকেল গ্রীক, রোমান, ইংরেজী, ফরাসী, জার্মান এবং সংস্কৃত নাট্য সাহিত্য মন্থন করেছিলেন। বাংলা নাটকে তাই তিনি নূতন জিনিস অনেক এনেছেন। কিন্তু নাট্য-সাহিত্যে তিনি প্রাণ-সঞ্চার করতে পারেন নি। হয়ত স্পষ্ট সমাজ-চেতনা ও লোকচরিত্র-জ্ঞানের অভাবেই তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি সব হয়েছে পুতুলনাচের পুতুল। সাজানো-গোজানো, কিন্তু জীবন্ত নয়। শর্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী, কৃষ্ণকুমারী, তিনেরই অবস্থা এক।

এর ওপর নাটকে মাইকেলের ভাষাও দুর্বল। বাংলা গদ্য স্টাইল বা ভঙ্গি তিনি ভালোভাবে আয়ত্ত করতে পারেন নি। তাই নাটকগুলিতে তিনি চালিয়ে-ছিলেন চলতি ক্রিয়াপদ ও সর্বনামের সঙ্গেই দীর্ঘ সমাস-সন্ধি-সম্বলিত বিদ্যাসাগরী ভাষা, যা কথাবার্তার ক্ষেত্রে অচল!

কিন্তু মাইকেলের প্রহসন দুটি চমৎকার। একটিতে হিন্দুয়ানির নামাবলী-ঢাকা চরিত্রহীন গ্রাম্য জমিদারের এবং অপরটিতে সংস্কৃতির গিল্টি-করা বয়াটে ইয়ং বেঙ্গলের চরিত্র চিত্রিত হয়েছে। ঘটনার অভিনবত্বে, ভাষার কারুকার্যে, সর্বোপরি কৌতুকরসের অজস্র পরিবেষণে বই দুটি পদে পদে দীনবন্ধুকে মনে করিয়ে দেয়।

দীনবন্ধু

দীনবন্ধুর অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র ছিল অনেক বড়। সরকারী চাকরির খাতিরে তাঁকে নানা স্থানে বেড়াতে হয়েছে, ছোট-বড় নানা স্তরের লোকের সঙ্গে মিশতে হয়েছে। এই প্রত্যক্ষ সংস্রব তাঁকে দিয়েছিল সৃষ্টির প্রেরণা এবং এখান থেকেই তিনি আহরণ করেছিলেন রচনার উপকরণ। এক দিকে বঙ্কিম যখন রাজা-বাদশা, যোদ্ধা ও সাধু-সন্ন্যাসীদের মহিমান্বিত কাহিনী নিয়ে উপন্যাস লিখছেন, আর মাইকেল লিখছেন দেব-দেবীদের এবং তাঁদের কৃপাপ্রাপ্ত নর-নারীদেব জীবন নিয়ে কাব্য, দীনবন্ধু সেই দিনে নিরন্ন চাষার দুঃখে বিগলিত হয়ে 'নীলদর্পণ' লিখেছিলেন, এ ঘটনা উপেক্ষা করার মতো নয়।

সাহিত্য হিসাবে নীলদর্পণে অসঙ্গতিব অভাব নেই। বহু জিনিস এতে আছে, যা নাটকীয় সংস্থান-জ্ঞানের প্রতিকূল। তা সত্ত্বেও 'নীলদর্পণে' সত্যিকার জীবন আছে, তার বেদনা আছে। তবে দীনবন্ধুর সর্বোত্তম রচনা 'সধবার একাদশী'।

'সধবার একাদশী' সম্বন্ধে শুধু এইটুকু বলে রাখা দরকার যে, এই বইয়ের সূচনায় তদানীন্তন রুচি অনুযায়ী ইয়ং বেঙ্গলকে নিয়ে ঠাট্টা করার জন্যেই দীনবন্ধু কলম ধরেছিলেন। কিন্তু তাঁর অজ্ঞাতসারেই তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলো জীবন্ত হয়ে তাঁর মমতার ওপর দাবী করে বসেছে। যে নিমে দত্তকে তিনি বয়াটে রূপে আসরে নামিয়েছিলেন, সেই শিক্ষিত এবং আদর্শ-বিভ্রান্ত ইয়ং বেঙ্গলের ট্র্যাজেডিটাই শেষ পর্যন্ত এই বইয়ে মহান্ হয়ে উঠেছে। বাইরে হাস্য-পরিহাস, মদ্যপান এবং কবিতার আবৃত্তি দিয়ে এই ট্র্যাজেডিটা দীনবন্ধু আড়াল করে রেখেছেন। কিন্তু এখানেই এ বইয়ের অসাধারণতা।

মাইকেলের 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনটিই 'সধবার একাদশী'র আদি প্রেরণা জুগিয়েছিল। সেখানেও দেখি, ইয়ং বেঙ্গল নববাবু এবং তার শিক্ষিত মোসাহেবরা ফ্যাশনের নামে বেয়াড়া পথে পা বাড়িয়েছে এবং 'জ্ঞান-তরঙ্গিণী

সভা'র আড়ালে মদ্যপান ও যথেচ্ছাচার চালাচ্ছে। দীনবন্ধুর আখ্যানাংশও প্রায় তাই, কিন্তু উভয়ের বিন্যাসের কত তফাৎ!

'বিয়ে পাগলা বুড়ো'তে বগী-বিন্দীর লড়াই, 'জামাই বারিকে' জামাইদের খোঁয়াড়ে মাণিক পীরের গান, 'নবীন তপস্বিনী'তে হোঁদল কুঁতকুঁতের অভিসার, বিচ্ছিন্ন দৃশ্য হিসাবে উপভোগ্য। কিন্তু সমগ্রভাবে বইগুলো ঠিক রসোত্তীর্ণ নয়। তাছাড়া রুচির বিচারেও স্থানে স্থানে আপত্তিকর। কিন্তু মনে রাখতে হবে, তাঁর অবলম্বিত চরিত্র ও তাদের কার্য-কলাপ নিখুঁতভাবে আঁকতে হলে, অশ্লীলতা ষোল-আনা এড়ানোর উপায় ছিল না।

অন্যান্য নাট্যকার

রামনারায়ণ তর্করত্ন, মাইকেল এবং দীনবন্ধুর সমস্ত নাটকই অভিনীত হয়েছিল ঘরোয়া রঙ্গমঞ্চে। গিরিশচন্দ্র ঘোষের উদ্যোগে বাংলা দেশে প্রথম পাব্লিক স্টেজ বা পেশাদার রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হয় এবং নাট্যাভিনয় ব্যবসা হিসাবে সুরু হয়। রঙ্গমঞ্চের প্রসার হলেই, নাটকেরও চাহিদা বাড়ে। তাই প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চ জন্মানোর পরই গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রাজকৃষ্ণ রায়, অমৃতলাল বসু, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, বাংলা দেশে যাঁরা নাট্যকার-রূপে প্রসিদ্ধ, তাঁদের সকলেরই আবির্ভাব হয়। কিন্তু এঁদের ঠিক আগে এবং মাইকেল-দীনবন্ধুর ঠিক পরে মনোমোহন বসু, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি কয়েকজন জনপ্রিয় নাট্যকার ছিলেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'পুরুবিক্রম,' 'সরোজিনী,' 'অশ্রুমতী' প্রভৃতি প্রথম আমলের ঐতিহাসিক নাটক হিসাবে কিছু মূল্য দাবী করে। সরোজিনী নাটকের 'জ্বল জ্বল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ' গানটির এক সময় বিশেষ খ্যাতি ছিল। যদিও শোনা যায় গানটি রবীন্দ্রনাথের লেখা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'অলীক প্রকাশ' বাংলা কমিক-নাট্যের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য বই। ভাঁড়ামির পরিবর্তে শুভ্র সুরুচিসম্মত হাসি এর বৈশিষ্ট্য।

মনোমোহন বসুর 'সতী' নাটক বা 'হরিশচন্দ্র' নাটক হিন্দু মেলার যুগে লেখা। সতী নাটকের একটা গান 'দিনের দিন হয়ে দীন' একদা বাংলা দেশে বিশেষ প্রচার লাভ করেছিল। এই গানের জন্যে ঐ নাটকের অভিনয় সরকার থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। পৌরাণিক কাহিনীর ভেতর আধুনিক রাজনীতির সমস্যা সংযোজনা করে, কবি সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন।

উপেন্দ্রনাথ দাসের 'শরৎ-সরোজিনী' এবং 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' নামে আর দু-খানা নাটকেরও এই সময় প্রচার ছিল।

গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলাল

এর পর বাংলা নাট্য-সাহিত্যের আধুনিক অধ্যায় এবং এই অধ্যায়ের প্রথমে আসেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ। গিরিশচন্দ্র এদেশে বাংলা নাট্য-সাহিত্যের সেক্সপীয়ার এবং বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের গ্যারিক বলে সম্মানিত হয়ে থাকেন। এ উক্তি অতিশয়তা-দুষ্ট সন্দেহ নেই। কিন্তু একাধারে নাট্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা, নট ও নাট্যকার-রূপে গিরিশচন্দ্র কৃতিত্ব কম দেখাননি। পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও সামাজিক তিন শ্রেণীর অজস্র নাটক লিখেছেন তিনি। 'জনা', 'পাণ্ডব-গৌবব', 'বুদ্ধদেবচরিত,' 'শংকরাচার্য,' 'চৈতন্যলীলা,' 'রাণাপ্রতাপ,' 'সৎনাম,' 'সিরাজউদ্দৌল্লা,' 'প্রফুল্ল', 'বলিদান,' অধিকাংশ বই-ই তাঁর মঞ্চাভিনয়ে বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। কিন্তু সাহিত্য হিসাবে তাঁর বচনা সর্বত্র সুন্দর নয়, ভাষা দুর্বল এবং জীবন-বোধও অস্পষ্ট। পুবানো যাত্রার কাঠামোতে নাটক লিখেছেন তিনি, তাই তাতে ভক্তিমিশ্রিত অলৌকিকভার প্রাধান্য হয়েছে। সামাজিক নাটক 'প্রফুল্ল' তাঁব উৎকৃষ্ট রচনা।

গিবিশচন্দ্রের নাটকে অসম অমিত্রাক্ষব ছন্দের ব্যাপক ব্যবহাব লক্ষ্য করার মতো। বাক্যের গুরুত্ব-লঘুত্ব অনুযায়ী ছেদ ব্যবহাবেব কৃতিত্ব অবশ্য প্রথম দেখান অমিত্রাক্ষর ছন্দের স্রষ্টা মাইকেলই। তাঁর পদ্মাবতী নাটকে দেখি,

আমি কলি,
কে না কাঁপে প্রতাপে আমার ?

গিরিশচন্দ্রের অনূদিত নাটক 'ম্যাকবেথ,' গীতিনাট্য 'আবুহোসেন' এবং ঐতিহাসিক নাটক 'কালাপাহাড়'ও তাঁর বিশিষ্ট বচনা।

দ্বিজেন্দ্রলাল রঙ্গমঞ্চের প্রিয় লেখক। চলতি ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম-সহযোগে ধ্বনিমুখর অলংকৃত গদ্য প্রবর্তন করে, বাংলা ভাষার প্রকাশ-শক্তিকে তিনি যথেষ্ট বাড়িয়ে দিয়েছেন। বিচিত্র ধরনের বিশেষণ ও ক্রিয়াবিশেষণ-প্রয়োগে, উপমা, উৎপ্রেক্ষা ও যমকের ব্যবহারে তাঁর রচনার ঐশ্বর্য অসীম। দ্বিজেন্দ্র-লালের নাটকের সত্যিকার বৈশিষ্ট্য যদি কিছু থাকে ত সে এই জায়গায়।

তাঁর নাটকের প্রধান ত্রুটি, তাঁর সৃষ্ট প্রত্যেকটি চরিত্রের ভেতর দিয়ে

কবির ব্যক্তি-রূপটি ফুটে ওঠে, কোন চরিত্রই নিজের স্বাতন্ত্র্য নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়ায় না।

তাঁর সর্বোৎকৃষ্ট তিনখানা বই 'শাজাহান', 'চন্দ্রগুপ্ত,' আর 'পাষাণী' নিয়ে আলোচনা করলেই এটা পরিষ্কার হবে। আলেকজেণ্ডার যে ভাষায় ভারতের শোভা-সৌন্দর্য বর্ণনা করছেন, চাণক্য সেই ভাষাতেই করছেন মাতৃ-মাহাত্ম্য কীর্তন। দাবা যে ভাষায় অত্যাচারিত মানবতার অভিযোগ ঘোষণা করছেন, শাজাহান সেই ভাষাতেই করছেন আপনার বন্দী-দশা নিয়ে বিলাপ। ইন্দ্র যে ভাষায় করছেন অহল্যাকে প্রলুব্ধ, গৌতম সেই ভাষাতেই বলছেন তাঁর জন্যে ক্ষমামিশ্রিত বেদনার বাণী! অর্থাৎ সব ক-টি চরিত্রকে আশ্রয় করেই প্রকটিত হচ্ছে একটি ব্যক্তির রূপ এবং সে ব্যক্তিটি স্বয়ং কবি।

ভাষাবিন্যাসে দ্বিজেন্দ্রলালের নূতনত্ব প্রশংসনীয় ঠিকই। কিন্তু এই নূতনত্বের মোহে কবি কতকগুলি মুদ্রাদোষের আবর্তে পড়েছিলেন, যা তাঁর সামাজিক নাটকের ক্ষতি করেছে। ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক নাটকে পাত্র-পাত্রীরা আমাদের কাছ থেকে দূরের মানুষ। তাদের কার্যকলাপ ও কথাবার্তায় অবাস্তবতা বা অতি-রোমান্টিকতা থাকলে, সব সময় সেটা অসহনীয় ঠেকে না। কিন্তু সামাজিক নাটকে এ টেকনিক একেবারেই চলে না। দ্বিজেন্দ্রলালের 'পরপারে' সামাজিক নাটকটি এই ভাষাগত কৃত্রিমতার জন্যেই উপভোগ্য হয় নি।

দ্বিজেন্দ্রলাল প্রধানত গদ্যেই নাটক লিখেছেন। 'সীতা' এবং 'পাষাণী' কেবল অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা। 'পাষাণী'তে তিনি যে পূর্ণ পর্বের অমিত্রাক্ষর ব্যবহার করেছেন, রাজকৃষ্ণ রায়ের 'লৌহ-কারাগার' এবং রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রাণী' এবং 'বিসর্জনে'ও তা-ই ব্যবহৃত হয়েছে। মাইকেল, কালীসিংহ বা গিরিশ ঘোষের অসম ছন্দ এঁরা নেননি।

রাজকৃষ্ণ রায়, অমৃতলাল বসু, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এক সময়ে রঙ্গমঞ্চের প্রিয় লেখক ছিলেন। রাজকৃষ্ণ রায়ের পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক অসংখ্য নাটক আছে। 'লৌহ কারাগার' নাটকের আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া 'অনলে-বিজলী', 'বনবীর', 'ঋষ্যশৃঙ্গ' প্রভৃতি নাটকও বেশ সুলিখিত। কয়েকখানি প্রহসনও তাঁর আছে বেশ ঝরঝরে। 'পাঁচ ঝাঁটা', 'ষোল বছরের পেত্নী', 'এ মেয়ে পুরুষের বাবা' প্রভৃতি। দুঃখের বিষয়, দেশ এই সাহিত্য-কর্মীকে ভুলে গেছে!

অমৃতলাল

অমৃতলালের 'হরিশ্চন্দ্র,' 'যাজ্ঞসেনী' ইত্যাদি পৌরাণিক নাটক বা 'হীরক-চূর্ণ' ঐতিহাসিক নাটক গিরিশ-প্রভাবিত রচনা। সামাজিক নাটক 'তরুবালা'ও তাই। অমৃতলাল বাংলা দেশে প্রহসন-রচয়িতারূপেই পরিচিত এবং এ বিভাগে তাঁর যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে। 'কৃপণের ধন', 'সাবাশ আটাশ', 'চাটুজ্যে-বাঁড়ুজ্যে,' 'তাজ্জব ব্যাপার,' প্রত্যেকটি বই-ই অপূর্ব। 'কৃপণের ধন' এবং 'চাটুজ্যে-বাঁড়ুজ্যে' অবশ্য মলেয়ারের ছায়ায় লেখা, কিন্তু তাতে যায় আসে না। পরের বিষয়বস্তু নিজের করে নিতে পারেন তিনিই, নেবার শক্তি আছে যাঁর।

কিন্তু অমৃতলালের প্রহসনের বিষয়বস্তু বড় বেশী সাম্প্রতিক। সময়াতিক্রান্ত হয়ে যাবার পর তাদের আবেদন শেষ হয়েছে। অবশ্য প্রহসন, প্যাবড়ি, স্যাটায়ার ইত্যাদির ধর্মই এই। কিন্তু সাম্প্রতিক উপকরণকে চিরন্তন রসে অভিষিক্ত করা যায় এবং সেই ভাবেই করতে হয় সাহিত্য। নইলে মলেয়ারের 'বুর্জোয়া', 'ডাক্তার' বা 'কৃপণ' আজও বেঁচে আছে কি জন্যে? 'সধবার একাদশী'ই বা ভালো লাগে কেন?

তাছাড়া অমৃতলালের রসিকতা মোটা ধরনের। দীনবন্ধুতেও এ জিনিস আছে। কিন্তু দীনবন্ধুর রচনার যে স্রোতস্বিনী গতি, তার মুখে এরা আবর্জনা সৃষ্টি করে দাঁড়াতে পারে নি। অবশ্য তা সত্ত্বেও বাংলা নাটক ও নাট্যশালা অমৃতলালের কাছে ঋণী কম নয়। তিনিও একাধারে ছিলেন নট, নাট্যকার ও নাট্য-ব্যবস্থাপক।

ক্ষীরোদপ্রসাদের 'আলমগীরে' বা 'প্রতাপাদিত্যে' দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকগুলির মতো ভাষায় ঔজ্জ্বল্য নেই। ক্ষীরোদপ্রসাদের 'আলিবাবা' গীতিনাট্য বোধ হয় বাংলা রঙ্গমঞ্চে সব চেয়ে বেশী অভিনীত বইয়ের অন্যতম। এই বইযে কিছুটা গিরিশচন্দ্রের 'আবুহোসেন' নাটকের কাঠামো নকল করা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ

নাটকরচনা রবীন্দ্রনাথের অসামান্য প্রতিভার একটি গৌণ দিক মাত্র হলেও, তার বৈচিত্র্য এবং সম্পদ বড় কম নয়, বাংলা সাহিত্যের ক্রম-পরিণতির ওপর তার প্রভাবও অসামান্য। রবীন্দ্রনাথ যত নাটক লিখেছেন, তাকে মোটামুটি এই কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়: কাব্য-নাট্য, 'রাজা ও রাণী',

'বিসর্জন', 'চিত্রাঙ্গদা', রঙ্গনাট্য 'চিরকুমার সভা,' 'গোড়ায় গলদ' ('শেষরক্ষা'), 'বৈকুণ্ঠের খাতা,' সঙ্কেত-নাট্য, 'রক্তকরবী', 'অচলায়তন,' 'ডাকঘর', 'মুক্তধারা'। 'বিদায়-অভিশাপ,' 'কর্ণকুন্তী-সংবাদ,' 'গান্ধারীর আবেদন' প্রভৃতি নাট্যাকার কবিতা এবং 'মায়ার খেলা' প্রভৃতি গীতি-নাট্য আসলে কাব্য সাহিত্যের অন্তর্গত, কাজেই ওগুলোকে নাটক-পর্যায়ভুক্ত করার প্রয়োজন নেই।

এতদিন পর্যন্ত আমাদের নাটক প্রধানত তিনটি বিশেষ ধারা অবলম্বন করে লেখা হত। পৌরাণিক কাহিনীর ভেতর দিয়ে কোন ভক্তি বা নীতিমূলক আদর্শ দেখানো, নয়ত ঐতিহাসিক কাহিনীর ভেতর দিয়ে দেশাত্মবোধ-প্রচার, নয়ত সামাজিক আখ্যায়িকার ভেতর দিয়ে কোন দেশাচারের বিরুদ্ধে জনমত-গঠন, কিংবা তা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ। পৌরাণিকে গিরিশচন্দ্র, ঐতিহাসিকে দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ এবং সামাজিকে দীনবন্ধু, অমৃতলালেব লেখনী সব চেয়ে বেশী খুলেছে। রবীন্দ্রনাথই প্রথম এই ত্রি-ধারা পরিহাব করে বিশুদ্ধ সাহিত্য-রসাশ্রিত নাট্যরীতি প্রবর্তন করেছেন। চিত্রাঙ্গদায় তিনি পৌরাণিক এবং বিসর্জনে ঐতিহাসিক কাহিনী নিলেও, উভয়ক্ষেত্রে দৃষ্টি রেখেছেন ভাব-ব্যঞ্জনাব প্রতি। চিরন্তন সত্যের দেশ, কাল ও পাত্র-নিরপেক্ষ যে আবেদন রবীন্দ্র-সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য, রবীন্দ্রনাথের নাটকেও তারই প্রতিফলন হয়েছে। এমন কি, সামাজিক নাটকেও তাঁর পদ্ধতি এক। তা-ও সমাজ-প্রচলিত কোন সমস্যা বা দাবীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে নি, মানুষের যে সমস্ত খেয়াল, বুদ্ধি-বৈকল্য বা বোকামি চিরকালের, তার ওপরই তাদেব প্রতিষ্ঠা।

রাজা ও রাণী, চিত্রাঙ্গদা, বিসর্জন, গোড়ায় গলদ, চিরকুমার সভা, বৈকুণ্ঠের খাতা প্রভৃতি বই যাঁরা মনোযোগ দিয়ে পড়েছেন, তাঁরাই লক্ষ্য করেছেন যে, এদের চরিত্রগুলো কোন বিশেষ দেশের বা সময়ের গণ্ডিতে বাঁধা নয়, তারা বিশ্ব-মানবের প্রতিনিধি। পরস্পর-বিরোধী ভাবের প্রতীকরূপে কতকগুলি চরিত্র সৃষ্টি করে, তাদের মধ্যে দিয়ে এক-একটা তত্ত্বকে রূপায়িত করাই হল কবির লক্ষ্য এবং এই লক্ষ্যের পরিপূরক হিসাবে তাঁর নাটকে আসে নানা শ্রেণীর নর-নারী, যারা আসলে এক-একটি মানবায়িত ভাব। এই নৈর্ব্যক্তিকতার ফলে রূপক-নাট্যগুলোর ব্যঞ্জনা পর্যন্ত অনেক সময় পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে না। তা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথই বাংলা ভাষার একমাত্র লেখক, যাঁর নাটক রঙ্গমঞ্চের বাইরে অধ্যয়নে উপভোগ্য। কেননা, তা মহৎ সাহিত্য।

সাম্প্রতিক নাটক

মঞ্চ-সাফল্যের দিক থেকে বাংলা ভাষায় অনেক উল্লেখযোগ্য নাটক আছে। যেমন 'রিজিয়া' (মনোমোহন রায়), 'মিশরকুমারী' (বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত), 'বঙ্গে বর্গী' (নিশিকান্ত বসু), 'পৃথ্বীরাজ' (মনোমোহন গোস্বামী), 'মোগল-পাঠান' (সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়), 'ক্ষত্রবীর' (ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়), 'জয়দেব' (হরিপদ চট্টোপাধ্যায়), 'কর্ণার্জুন' (অপরেশ মুখোপাধ্যায়), 'রাতকানা' (নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়) এবং অন্যান্য অনেক বই। গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল ও ক্ষীরোদপ্রসাদের অনুকরণে লেখা অসাহিত্যিক এবং অসার্থক এই সব রচনা নিছক অভিনয়ের জাঁক-জমকে বাজার মাত করে।

কিন্তু বাংলা নাট্য-সাহিত্যের এইখানেই সমাপ্তি। সমসাময়িক কালের সাহিত্যিকরা কেউ উল্লেখযোগ্য নাটক লেখেন নি। লেখার কাজ সাহিত্যিকদের হাত থেকে এখন থিয়েটার-কর্তাদের হাতে চলে গেছে। তাঁরা হয় পুরানো নাটকের ছকে ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক নাটক লেখান, নয় জনপ্রিয় উপন্যাসকে নাটকে রূপান্তরিত করিয়ে মঞ্চস্থ করেন।

ইদানীন্তন লেখকদের মধ্যে শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মন্মথ রায়, রবীন্দ্রনাথ মৈত্র, জলধর চট্টোপাধ্যায়, মহেন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি কোন মতে নাট্য-সাহিত্যের ক্ষীণ ধারাটি জীইয়ে রাখার চেষ্টা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের 'মানময়ী গার্লস স্কুল' এবং প্রমথনাথ বিশীর 'ঋণং কৃত্বা' কৌতুকনাট্য হিসাবে উপভোগ্য। শচীন সেনগুপ্তের 'গৈরিক পতাকা', 'সিরাজউদ্দৌল্লা' এবং মন্মথ রায়ের 'কারাগার' পুরানো ধারার নাটক। কিন্তু দু-জনেই নূতন যুগের নাটকও লিখেছেন কিছু কিছু। শচীন সেনগুপ্তের 'ঝড়ের রাতে' ভালো লেখা।

মন্মথ রায়ের একাঙ্ক নাটকগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শিবরাম চক্রবর্তী, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রভৃতি লেখকরাও এই বিভাগে অল্পস্বল্প সম্পদ সংযোজন করেছেন। কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য দেশে অধ্যয়নযোগ্য একাঙ্ক নাটক যে রকম আদৃত, আমাদের দেশে তা নয়। বোধহয় এই জন্যেই একালীন সাহিত্যের এই প্রকাণ্ড দিকটি এখনো উপেক্ষিত হয়ে রয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

উপন্যাস

নাটকের মতো উপন্যাসও বাংলা ভাষায় জন্মেছিল ইংরেজী সাহিত্যের অনুপ্রেরণা থেকে। এ দেশের ক্ল্যাসিক্যাল সাহিত্যে এক শ্রেণীর কাব্যধর্মী আখ্যায়িকা লেখার রীতি ছিল। 'কাদম্বরী' ও 'বাসবদত্তা' তার প্রমাণ। কিন্তু আজকের দিনে নভেল বলতে আমরা যা বুঝি, তা এসেছে ইউরোপ থেকে। বাংলা ভাষার সত্যিকার প্রথম নভেলিস্ট হলেন বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁর আগে বিদ্যাসাগর, তারাশংকর তর্করত্ন প্রমুখ লেখক বাংলায় ক্ল্যাসিক্যাল রোমান্সের পুনর্লিখন করেছিলেন, আর টেকচাঁদ, ভবানীচরণ প্রভৃতি করেছিলেন সমসাময়িক সমাজ নিয়ে এক শ্রেণীর স্যাটায়ার রচনা। এঁরা সম্ভবত মুসলীম কিস্সা-সাহিত্য থেকে আদর্শ আহরণ করেছিলেন।

বঙ্কিম যখন সাহিত্যিক-রূপে আবির্ভূত হন, তখন দেশের সমাজ ইংরাজী শিক্ষার মোহে উদ্‌ভ্রান্ত। দেশের ধর্ম-কর্ম ও আচার-সংস্কৃতির ওপর শ্রদ্ধা হারিয়ে যুবকরা হয় খৃষ্টান, নয় ব্রাহ্ম হচ্ছিলেন। তাই বঙ্কিমচন্দ্র সেই উন্মার্গগামী সমাজকে জাতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্যে উদ্দীপ্ত করা তাঁর জীবনের ব্রত করলেন। এই জন্যেই তাঁকে লিখতে হল প্রধানত ঐতিহাসিক উপন্যাস এবং সামাজিক উপন্যাসেও তিনি নৈতিক আদর্শকে প্রাধান্য না দিয়ে পারলেন না। বঙ্কিমের এই সংস্কারক বুদ্ধি তাঁর শিল্পের গরিমা কিছুটা ক্ষুণ্ণ করেছে হয়ত। কিন্তু দেশের সাহিত্যে তাঁর প্রভাব অসামান্য। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে গোড়ার দিকে বঙ্কিমের প্রভাব দেখা যায়। বঙ্কিমের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' আর রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' পাশাপাশি রেখে পড়লেই এ কথার যাথার্থ্য বোঝা যাবে।

বঙ্কিম-সমসাময়িক ঔপন্যাসিকদের অনেকের লেখাই সেদিন বিশেষ সমাদৃত ছিল। এঁদের মধ্যে দামোদর মুখোপাধ্যায়, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। সঞ্জীবচন্দ্রের 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট' এবং দামোদরের 'মা ও মেয়ে' সুখপাঠ্য উপন্যাস। এঁদের সামান্য পরে তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় একজন বিশিষ্ট লেখক। তাঁর 'স্বর্ণলতা'তেই বাংলা গার্হস্থ্য

উপন্যাসের রূপ সর্বপ্রথম পূর্ণতা লাভ করল। যোগেন্দ্র বসু, ত্রৈলোক্য মুখোপাধ্যায়, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি তাঁর সমসাময়িক লেখকরাও একদা খ্যাতিমান ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ বাংলা উপন্যাসে যে মনস্তাত্ত্বিকতা প্রবর্তন করলেন, তা তাঁর সমসাময়িকদের তেমন বেশী প্রভাবিত করে নি। বরং তাঁর তাত্ত্বিকতা পরিহার করারই চেষ্টা হয়েছে বিশেষ করে। রবীন্দ্রনাথের পর এলেন শরৎচন্দ্র। তিনিই বাংলা উপন্যাসকে সম্পূর্ণতা দিলেন। মানুষের দুঃখ-ব্যথা, স্খলন-পতনকে সুগভীর সহানুভূতির রঙে চিত্রিত করে, তিনি বঙ্কিমের নীতি-নিষ্ঠা এবং রবীন্দ্রনাথের মননশীলতা দুটিকেই অতিক্রম করে গেলেন। তাঁর আদর্শই আজও দেশে বিশেষভাবে অনুসৃত হচ্ছে। শরৎচন্দ্রই প্রথম তথা-কথিত ছোটলোককে সম্মানিত রূপে আঁকলেন, তাদের দুঃখ-দুর্দশাকে সমবেদনা দিয়ে ফোটালেন। শরৎচন্দ্রের পর নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবোধকুমার সান্যাল, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উপন্যাসকার হিসাবে উল্লেখযোগ্য।

ভবানীচরণ ও টেকচাঁদ

বঙ্কিমচন্দ্রই যদিও বাংলার প্রথম সত্যিকার ঔপন্যাসিক এবং বাংলা উপন্যাসের আধুনিকতম অধ্যায়ের ঠিক আগে পর্যন্ত যদিও তাঁর প্রভাবই দেশে বিশেষ ভাবে কাজ করেছে, তবু তাঁর পূর্বেও বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস লেখা হয়েছে এবং ঐতিহাসিক দিক থেকে তাদের মূল্য কম নয়। তবে অবশ্য প্রাক্-বঙ্কিম উপন্যাসগুলো খাঁটি জাতের উপন্যাস নয়, স্যাটায়ার-জাতের রচনা। তখনকার সমাজের তরুণ ও প্রবীণদের দোষ-ত্রুটি, অন্যায়-অনাচার নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করার এবং তাঁদের সুপথের সন্ধান বাতলে দেওয়ার জন্যেই এদের সৃষ্টি। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নববাবু বিলাস' এবং টেকচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল' এই সময়ের উল্লেখযোগ্য বই।

সময়টা আমাদের মনে রাখতে হবে। আচকান, পাগড়ি ও ফরসির সঙ্গে ফারসী পড়া যেমন হিন্দুদের মধ্যে আভিজাত্যের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তেমনই হিন্দুয়ানির আঁটুনিও বেড়ে গিয়েছিল অত্যন্ত বেশী। বাইরে মুসলমানী ও ভেতরে হিন্দুয়ানির ধাক্কায় সমাজ-জীবন প্রাণ-শক্তি হারিয়ে

জীর্ণ হয়ে পড়েছিল। এই দুর্বল স্বাস্থ্যের ওপর মহামারীর মতো এসে পড়ল ইংরেজী শাসন এবং ইংরেজী সভ্যতা।

এই বিক্ষোভ জুড়িয়ে থিতিয়ে প্রথম নব সংস্কৃতির সুগঠিত রূপ প্রকাশ পেল বঙ্কিম, মাইকেল, দীনবন্ধু প্রভৃতির সাধনায়। কিন্তু তার আগে এই ভাঙনের মধ্যে দিয়ে জাতিকে গঠনের দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন যাঁরা, তাঁদের মধ্যে প্রথম হলেন রামমোহন, দ্বিতীয় বিদ্যাসাগর।

এই ভাঙা-চোরা সমাজে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের অবসর ছিল ঢের, সে প্রাচীন-পন্থীদের নিয়েও, আধুনিকপন্থীদের নিয়েও। ভবানীচরণ ও টেকচাঁদ উভয়েই লক্ষ্য হিসাবে নিয়েছিলেন 'এডুকেটেড ইয়ং বেঙ্গল'কে। তাদের উচ্ছৃঙ্খলতা, উদ্দামতা, আতিশয্য, সব কিছুর ভেতরই ঠাট্টা, এমন কি আক্রমণের জিনিস ছিল প্রচুর। নানা বইয়ে এই পুঁজি ভাঙানো হয়েছে। আর 'ওল্ড স্কুল'দের কথা ত বলারই নয়। এই আমলের নক্সায়, নাটকে, উপন্যাসে, সর্বত্র সেই ক্ষয়িষ্ণু সমাজের চিত্র পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, এই সব বইয়ের অধিকাংশই খেলো জাতের রচনা। সবই পরিবর্তনশীল সমাজ ও সংস্কৃতির সমসাময়িক আলেখ্য মাত্র। তবে এই বইগুলোর সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব হল সাধারণ মানুষের মুখের ভাষায় তাদের সুখ-দুঃখ আঁকার প্রয়াস। সেদিন এ জিনিস অনেকের শ্রদ্ধার উদ্রেক করেনি। তাই এদের পাশাপাশি বিদ্যাসাগরী রচনাই দেশকে করেছে বেশী আকর্ষণ।

এই শ্রেণীর স্যাটায়ার ছোকরা-মহলে হয়ত আদর পেত। কিন্তু দেশের ভদ্র সমাজে আদর পেত পৌরাণিক ধরনের আখ্যায়িকা, 'সীতার বনবাস', 'শকুন্তলা', 'ভ্রান্তিবিলাস', 'কাদম্বরী', 'রাসেলাস', 'টেলিমেকস', 'রামের রাজ্যাভিষেক' ইত্যাদি। এই সব বইয়ের বিষয়, রচনা-রীতি, প্রতিপাদ্য, সর্বত্র ছিল সংস্কৃত কৌলীন্য এবং সেটাই বিবেচিত হত ভদ্র সাহিত্যের আদর্শ বলে। বলে রাখা দরকার যে, শেষোক্ত বইগুলো মৌলিক সাহিত্য নয়, হয় অনুবাদ, নয় অনুসরণে লেখা।

বঙ্কিমচন্দ্র

বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা উপন্যাসকে আঁতুড় ঘর থেকে প্রাত্যহিক সংসারে নিয়ে এলেন। হিন্দু কলেজের প্রথম গ্র্যাজুয়েট বঙ্কিম স্কটের উপন্যাস পড়েছিলেন এবং স্কটকে অনুসরণ করেই তিনি প্রথম ঐতিহাসিক রোমান্স লেখা শুরু

করেন। 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা', 'সীতারাম', 'মৃণালিনী', 'রাজসিংহ', 'চন্দ্রশেখর', সব বইয়ের পেছনেই একটা করে সত্য বা কল্পিত ইতিহাসের কাঠামো আছে এবং আখ্যায়িকার ব্যবস্থাপনায় Ivanhoe, Kenilworth, Quintin Durward ইত্যাদির ছায়াও সুস্পষ্ট। অবশ্য পরে বঙ্কিম সমাজের দিকে দৃষ্টিপাত করেন এবং 'বিষবৃক্ষ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল' বা 'রাধারাণী'তে রাজা-বাদশা-নাইট প্রভৃতির কাহিনী বর্জন করেন। কোঁৎ, মিল ও বেন্থামের প্রভাব তাঁকে দার্শনিক ভিত্তিতে সমস্যামূলক উপন্যাস লিখতে প্রণোদিত করে। আর এখানেই হয় আধুনিক বাংলা উপন্যাসের সূচনা।

বঙ্কিম যে সময়ের মানুষ, জাতির জীবনে সে একটা বিপর্যয়ের আমল। দেশের যুব-শক্তি সেদিন নিজের দেশ এবং জাতিকে অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর ভাবতে সুরু করেছে। এমন দিনে জাতির মনে আত্মসম্মান-জ্ঞান জাগান, তাঁর বিশ্বাস ও কর্ম-শক্তি উদ্দীপ্ত করা, তাকে গরিমাময় জাতীয় ঐতিহ্যে অনুপ্রাণিত করা বিশেষ দরকার হয়ে পড়েছিল। এই প্রয়োজনের তাগিদেই বঙ্কিমের লেখনীধারণ এবং এ দিক থেকে তাঁর লেখনীর সাফল্যও অসাধারণ।

এই প্রয়োজনের তাগিদেই বঙ্কিম দেশের ইতিহাস অনুসন্ধান করেছিলেন এবং যথেষ্ট পরিমাণ ইতিহাস না পাওয়ায়, প্রয়োজন-মতো ইতিহাস গড়ে নিয়ে উপন্যাস লিখেছিলেন। সমসাময়িক জীবনকে বঙ্কিম প্রথমটা আমল দেন নি এই জন্যে যে, আদর্শসৃষ্টির বা রসসৃষ্টির পক্ষে দূরত্ব যতটা সহায়ক, নৈকট্য তা নয়। কিন্তু বঙ্কিমের অবাধ কল্পনার মুখে ছিল উদ্দেশ্যের শক্ত লাগাম। তাই দূরে গিয়েও তিনি রসের গভীরে উধাও হতে পারেন নি।

সামাজিক উপন্যাসে এসেও বঙ্কিম গল্পকে যে সম্ভাবনীয়তা দিয়ে রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত করেছেন, ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে তা যে পরিণতিতে যেতে পারত তা হতে দেননি। রোহিণী বা শৈবলিনীর চরিত্রে যে বীজ বপন করা হয়েছে, তারা তার অনিবার্য ফসল রূপে গড়ে ওঠেনি। গল্পকে উজান হাঁটিয়ে আদর্শকে জয়যুক্ত করার দিকেই যেন তাদের গতি। এ ত্রুটি ঘটেছে শুধু এই কারণে যে, সামাজিক উপন্যাসেও তিনি বেশী নজর রেখেছিলেন সমাজ-গঠনের দিকে, রস-সৃষ্টির দিকে নয়।

জাতীয়তাবাদের প্রবর্তক রূপে বঙ্কিম বাংলায় চিরস্মরণীয়। তাঁর 'দেবী চৌধুরাণী', 'সীতারাম', 'আনন্দমঠ' জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে প্রেরণা দিয়েছে। বন্দে মাতরম্ গৃহীত হয়েছে সারা ভারতের মর্মবাণীরূপে। যদিও তাঁর সাহিত্যে

অহিন্দু এবং অনুন্নত হিন্দু সম্বন্ধে বিশেষ শ্রদ্ধা বা সহানুভূতি নেই, তবু তিনি যে দেশপ্রেমিক, তা নিঃসন্দেহ।

বঙ্কিম-সমসাময়িক উপন্যাস

বঙ্কিম-সমসাময়িকদের মধ্যে রমেশচন্দ্র দত্ত এবং দামোদর মুখোপাধ্যায় একদা উপন্যাসকার রূপে সমাদৃত ছিলেন। রমেশ দত্তের 'বঙ্গ-বিজেতা', 'মাধবী-কঙ্কণ', 'রাজপুত-জীবনসন্ধ্যা', 'মহারাষ্ট্র-জীবনপ্রভাত' বঙ্কিমী আদর্শে লেখা ঐতিহাসিক উপন্যাস। 'সংসার' ও 'সমাজ' নামে দু-খানি সামাজিক উপন্যাসও আছে তাঁর। ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি উদ্দীপনাপূর্ণ। সামাজিক উপন্যাসে তাঁর হাত খোলেনি।

কিন্তু বঙ্কিম-সমসাময়িকদের মধ্যে দামোদর মুখোপাধ্যায়ের বেশ একটু বিশিষ্টতা ছিল; দামোদরের 'মা ও মেয়ে' বই কোন কোন দিক থেকে আধুনিক বাংলা উপন্যাসের অগ্রদূত-স্বরূপ। সমাজবহির্ভূত সম্পর্ক এবং সেই সম্পর্ককে কেন্দ্র করে জটিল জীবন-দ্বন্দ্ব তিনি যতটা সাহসের সঙ্গে ফুটিয়েছেন, সে যুগের আর কারুর লেখাতেই তা পাওয়া যায় না। তাঁর দৃষ্টির ঔদার্যও লক্ষ্য করার মতো। দীন দরিদ্র, চাষা, ইতরলোক, খুনী, অন্যায়কারী, এমন কি ব্যভিচারিণীকেও তিনি উপেক্ষা করেননি। এটাও আধুনিকতারই পূর্বাভাস-স্বরূপ। সঞ্জীবচন্দ্রের 'জাল প্রতাপচাঁদ', 'মাধবীলতা', 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট' প্রভৃতি উপন্যাসও এই সময়ের রচনা হিসাবে উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করে শেষ বইটি।

বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত আসতে, মাঝখানে যে ছোট্ট যুগটি পড়ে, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তার দাম কম নয়। প্রত্যেক যুগেই সেই যুগের নেতৃস্থানীয় লেখকদের প্রবর্তিত ধারা ধরে অজস্র বই লেখা হয়, যা সমসাময়িক রুচির বিচারে সমাদরও পায়। কিন্তু পরবর্তী কালে সে সব রচনার কোনই কদর থাকে না। বঙ্কিমচন্দ্র-প্রবর্তিত উপন্যাস-ধারার অনুকরণেও বাংলা সাহিত্য ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল অসার উপন্যাসে। এই আওতা থেকে উপন্যাসকে নূতন দিকে মোড় ফিরিয়ে দেবার দরকার ছিল। তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা' সেই কাজ করল।

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

এক সময় 'স্বর্ণলতা' বই দেশে খুব সমাদৃত ছিল। কিন্তু এখনকার পাঠক অনেকে এই উপন্যাসটির খবরই রাখেন না। মাইকেল থেকে রবীন্দ্রনাথে বাংলা কাব্যের বিবর্তনে যেমন বিহারীলালের মধ্যস্থতা সবচেয়ে বেশী কাজ করেছে, উপন্যাসের ক্ষেত্রেও তেমনি তারক গাঙ্গুলী বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মাঝখানে অববাহিকার মতো থেকে দুটি বিশিষ্ট ধারাকে গ্রন্থিবদ্ধ করেছেন। বিহারীলালের ঋণ কবি স্বীকার করেছেন, কিন্তু তারক গাঙ্গুলী সম্বন্ধে তাঁর মতামত আমাদের জানবার সুযোগ হয়নি।

তারক গাঙ্গুলী এবং বিহারীলাল একই সময়ের লেখক। ১৮৭১-৭২ সালে 'আর্যদর্শনে' বিহারীলালের সারদামঙ্গল এবং 'জ্ঞানাংকুরে' তারক গাঙ্গুলীর স্বর্ণলতা ছাপা হয়। রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে এই পত্রিকা দুটি পড়তেন এবং তাঁর প্রথম বয়সের রচনার ওপর এই দুটি লেখকেরই প্রভাব কিছু কিছু দেখতে পাওয়া যায়। তারক গাঙ্গুলীর রচনার বিশেষত্ব হল, বাংলার সুপরিচিত প্রাত্যহিক জীবনকে রূপ দিয়েছেন তিনি নিপুণ চিত্রকরের মতো। গৃহস্থ-জীবনের ছোট ছোট সুখ-দুঃখ, ছোট ছোট ঈর্ষা-দ্বেষ, ছোট ছোট দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, বাইরে থেকে যাদের রং অত্যন্ত ফিকে, তাকেই তিনি তাঁর স্বচ্ছন্দ ভাষা ও সুললিত লিপি-চাতুর্যে সুষমান্বিত করে তুলেছেন। মোটা কথা তাঁর হয়ত একটা ছিল। ভ্রাতৃ-বিরোধ জিনিসটা ভালো নয়, তাতে একান্নবর্তী পরিবারের ধ্বংস অনিবার্য, এমনি একটা কিছু হয়ত বলতেও চেয়েছিলেন তিনি এই উপন্যাসে। কিন্তু সেটা এতে বড়ও নয়, বিশিষ্টও নয়।

এর মূল গল্পের টানে যে সমস্ত উপ-চরিত্র বা খণ্ড-ঘটনা এসে পড়েছে, তার সমবায়ে গল্পটি যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। বেহালাওয়ালা নীলকমল, তোতলা গদাধরচন্দ্র বা ডাকসাইটে শ্যামা চরিত্র হিসাবে নিখুঁত এবং ডিকেন্সের চেয়ে তাদের অঙ্কনে কম শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না। কালীঘাটের ভিখারীর মিছিল বা পল্লীগ্রামের যাত্রার আসর শরৎচন্দ্রের লেখনীতেও আর বেশী উজ্জ্বল হত না। অবশ্য প্রধান নারীচরিত্র প্রমদা অস্বাভাবিক। তাকে নির্জলা দুর্বৃত্ত করেই আঁকা হয়েছে, যা বাস্তবে হয় না। যথেষ্ট পরিমাণ বাস্তব-পন্থী হয়েও, তারক গাঙ্গুলী এই জায়গায় সাবেকী ধারার অনুসরণ করেছেন।

তারক গাঙ্গুলীর পর আরো কয়েকজনের নাম এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন,

যাঁদের রচনা কালক্রমে অপ্রচলিত হয়ে এলেও, বাংলা সাহিত্যের আধুনিক পরিণতির মূলে তার প্রভাব কম-বেশী কাজ করেছে। 'বঙ্গবাসী'-গোষ্ঠীর ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় এবং যোগেন্দ্র বসুর লেখা বাংলা দেশের ঘরে ঘরে এক সময় সাগ্রহ কৌতূহলে পঠিত হত। তাঁদের গল্প বানাবার নৈপুণ্য এবং সেই গল্প বলার কলা-কৌশল অপূর্ব। তখনকার শহুরে সমাজের ন্যাকামি-বোকামিব নিখুঁত আলেখ্য পাওয়া যায় এই সব বইয়ে।

ইন্দ্রনাথের 'কল্পতরু'তে চীৎপুর অঞ্চলের বাসিন্দাদের যে ছবি পাওয়া যায়, তা হুতোমের পাঠকদের অচেনা নয়। কিন্তু হুতোমের চেয়ে ইন্দ্রনাথের নজর ধারাল ছিল। তিনি যাদের এঁকেছেন, তারা নিছক ঠাট্টার প্রয়োজনে জন্মায় নি। তারা সত্যিকার রক্ত-মাংসের মানুষ। ত্রৈলোক্যনাথের 'কঙ্কাবতী' এই সময়ের আর একখনি মনোরম কাহিনী। অবশ্য কিশোরপাঠ্য কাহিনী এটি। কিন্তু বড়রাও পড়ে সুখী হবেন, যেহেতু ভাষার গতি অত্যন্ত স্বচ্ছ এবং মজলিস জমিয়ে গল্প বলার ধরনটিও মনোজ্ঞ।

যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু এঁদের চেয়ে বড় দরেব লিখিয়ে ছিলেন। তাঁর 'মডেল ভগিনী' বা 'কালাচাঁদ' বা 'রাজলক্ষ্মী' প্রভৃতি সত্যিকার সুরচনা। মডেল ভগিনীর ঠাট্টা-বিদ্রূপেব ভেতর বিদ্বেষেব বিষ আছে, তিলকে তাল করে দেখানর আতিশয্য যে নেই, তা-ও নয়। তবু তার চরিত্রগুলো যথার্থ। এই যাথার্থ্য থেকে ভ্রষ্ট হয় নি বলেই, স্যাটায়ার হিসাবে মডেল ভগিনী আজো সুখপাঠ্য। একটা বিশেষ শ্রেণীর বাড়াবাড়ি এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির নামে ভণ্ডামিকে লেখক আক্রমণ করেছিলেন। তাই তাঁর কৌতুকের তলায় আগাগোড়া থেকে গেছে আক্রোশের একটা ধারাল চাবুক। তবু গল্পের গাঢ়তা ও লিপিচাতুর্যে জিনিসটা মানিয়ে নিতে পেরেছেন তিনি।

'কালাচাঁদে' তাঁর হাসি অনেকটা প্রাণ-খোলা, পরবর্তী কালের প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের মতো। কিন্তু কালাচাঁদের হাসির পেছনে একটু অশ্রুর ছোঁয়া আছে, যাতে এই বাহির-গুণ্ডা ভিতর-কোমল মানুষটির জন্যে পাঠকের মমতা জাগে। আর 'রাজলক্ষ্মী' ও বাংলা ভাষার একখানা প্রথম শ্রেণীর বই। ঘটনার ঘনঘটা, গল্পের গাঁথুনি, সর্বোপরি বহু বিচিত্র ছোট-বড় চরিত্রের অবতারণায় এই বিরাটকায় উপন্যাসটি সত্যিই খুব বিশিষ্টতার পরিচয় দেয়। সেই রঘুদয়াল এবং শিয়াল মারা, সেই নায়িকা রাজলক্ষ্মী, কার না বাল্যে মনোহরণ করেছে?

রবীন্দ্রনাথ

এবার রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস-সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন। নিছক গল্প বলা বা তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করা যে উপন্যাস সাহিত্যের এক মাত্র লক্ষ্য নয় এবং আদর্শ নর-নারী সৃষ্টি করে, তাদের কার্যকলাপের মাধ্যমে জাতিকে মতের সন্ধান ও পথের নির্দেশ দেওয়াও যে ঔপন্যাসিকের সব চেয়ে বড কাজ নয়, এ রবীন্দ্রনাথই প্রথম হাতে-কলমে প্রমাণ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস সাহিত্যকে মোটামুটি তিন পর্বে ভাগ করতে পারি। প্রথম পর্বে 'বৌঠাকুরাণীর হাট', 'রাজর্ষি', 'নৌকাডুবি' প্রভৃতি উপন্যাসে কবি প্রধানত লক্ষ্য রেখেছেন গল্প বলার ওপর। মনোযোগ দিয়ে পড়লেই দেখা যাবে যে, এই উপন্যাসগুলিতে কবি তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিটিকে ষোল-আনা খুঁজে পান নি। কবি নিজেই এসব রচনার উপর বেশী মূল্য আরোপ করেন নি। 'বৌঠাকুরাণীর হাট' এবং 'রাজর্ষি'র আখ্যানাংশ নিয়ে তিনি পরে 'প্রায়শ্চিত্ত' ও 'বিসর্জন' নাটক রচনা করে, প্রকারান্তরে ওদের বরং বাতিলই করে দিয়েছেন।

দ্বিতীয় পর্বেব সুরু 'চোখের বালি'তে এবং 'গোরা'তে তার সম্পূর্ণতা। এই পর্বে কবি এসেছেন সমস্যা-বিচারে। সমস্যা বঙ্কিমও নিয়েছিলেন এবং 'চোখের বালি'তে রবীন্দ্রনাথ যে সমস্যা নিয়েছেন, 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' তিনি ঠিক সেই সমস্যাতেই হাত দিয়েছিলেন। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় যে, শিল্প-সৃষ্টি করতে বসেও বঙ্কিম ভুলতে পারেন নি, সামাজিক শৃঙ্খলারক্ষার দায়িত্ব তাঁর হাতে। তাই তিনি একবারও খোলা চোখে বাস্তব অবস্থার বিচার করেননি। রবীন্দ্রনাথই সেই দুর্লভ সাহস দেখিয়েছেন বিনোদিনীকে বিচিত্র করে। 'গোরা'তে তিনি জাতীয়তাবাদের স্বরূপ বিশ্লেষণ করে দেখালেন যে, যে বিবেচনাহীন অন্ধতায় দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তাকে আমরা সমস্ত শুভ বুদ্ধির ওপর স্থান দিই, অনেক সময়ই তার পেছনের বনিয়াদটা কাঁচা। 'আনন্দমঠের' হিংস্র জাতীয়তাবাদের বিকল্প রূপেই বোধ হয় এই দৃষ্টি 'গোরা'র প্রকাশ পায়।

তৃতীয় পর্ব 'ঘরে বাইরে' থেকে আরম্ভ এবং 'চার অধ্যায়' পর্যন্ত এরই জের চলেছে। শুধু মাঝখানে 'শেষের কবিতা' একটা স্বয়ং-সম্পূর্ণ পর্বরূপে দেখা দিয়েছে, যা রবীন্দ্র-উপন্যাসের ক্রমিক ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন। বুদ্ধিদীপ্ত আধুনিক

নর-নারীর চটুল জীবন নিয়ে সহানুভূতি-মিশ্রিত কৌতুক করার জন্যেই এর সৃষ্টি এবং সেদিক থেকে এ রচনাটি বিশেষ উপভোগ্য। তৃতীয় পবে রবীন্দ্রনাথ তাত্ত্বিকতাকে উপন্যাসের বাহন করেছেন। গল্প ও রসসৃষ্টি তাতে গৌণ হযে গেছে। আধুনিক কালের যে প্রাবন্ধিক উপন্যাস ইউরোপ-আমেরিকায় বিশেষ ভাবে চলিত, এরা তাদেরই সগোত্রীয় এবং উপন্যাস রূপে না হক, সাহিত্য হিসাবে এদের উৎকর্ষ অপ্রতিবাদ শ্রদ্ধাতেই স্বীকার করে নিতে হবে।

রবীন্দ্র-উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে এখানে সংক্ষেপে দু-একটা কথা বলা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে বাস্তব সংসারের রং খুব স্পষ্ট বা উজ্জ্বল নয়। তিনি যেনর-নারীদের উপস্থাপিত করেছেন, তারা ঠিক রক্ত-মাংসের মানুষও নয়, তারা যেন এক-একটি ভাব-বিগ্রহ।

রবীন্দ্র-সমসাময়িক কাল

রবীন্দ্র-সমসাময়িক ঔপন্যাসিকদের মধ্যে কয়েকজন আছেন, যাঁদের দান উপেক্ষার নয়। হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের 'রঙ-মহল' বই যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা জানেন, মোগল হারেমের বিচিত্র কাহিনীগুলি তিনি কি রকম মনোজ্ঞ ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন। সেই সেলিমা বেগমের বা সবিতা-সুদর্শনেব কাহিনী কোনদিন ভোলবার নয়। কি গল্পের গাঁথুনিতে, কি ভাষার ঐশ্বর্যে, এ রকম ঐতিহাসিক রোমান্স বাংলায় আর লেখা হয়নি। এরই পাশে নিতে পারি হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'বেনের মেয়ে'কে। এটি বৌদ্ধ বাংলার পটভূমিতে লেখা একটি কাহিনী। বেনের মেয়ের রচনাপদ্ধতি বঙ্কিমোত্তর লেখকদের পদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এর কাহিনী যেমন সরল, তেমনি স্বচ্ছ। নদীতে তুফান উঠলে বেনেনির বমি বন্ধ করার জন্যে নদীতে পিপে পিপে গর্জন তেল ঢালা, হাতী-ঘোড়া, লোক-লস্কর নিয়ে মহা সমারোহে গুরুর আবির্ভাব, এমনি অনেক কৌতুকপ্রদ চিত্র বেনের মেয়ের সর্বত্র পাওয়া যাবে। এর ভাষাও আশ্চর্যরকম অনলংকৃত ঘরোয়া বাংলার নিদর্শন।

ঐতিহাসিক উপন্যাস-প্রসঙ্গে আর একজনের নাম স্মরণীয়। তিনি হচ্ছেন 'ধর্মপাল', 'শশাঙ্ক' প্রভৃতির লেখক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। মহেঞ্জোদাড়োর আবিষ্কারক এবং বাংলা দেশের ইতিহাস-লেখক রূপেই রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সমধিক প্রসিদ্ধ। কিন্তু সাহিত্যিক রূপেও তাঁর মর্যাদা কম হবার কথা নয়। যে কর্ণসুবর্ণ, গৌড়, সপ্তগ্রাম, তাম্রলিপ্ত ও চম্পা নিয়ে আমাদের গর্ব,

তার আসল পরিচয় আমরা জানি না। এই পরিচয় উদ্‌ঘাটিত করেছেন রাখালদাস তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে। ঐতিহাসিক মাল-মসলার আধিক্যে উপন্যাসের জীবনী-শক্তি ক্ষুণ্ণ হয়নি, এতে বোঝা যায় আহরণী প্রতিভার সঙ্গেই সৃজনী প্রতিভাও ছিল রাখালদাসের প্রচুর পরিমাণে।

এই সময়ের প্রসিদ্ধ গোয়েন্দা-উপন্যাসলেখক পাঁচকড়ি দেব নামোল্লেখ প্রয়োজন। তাঁর 'মায়াবী', 'গোবিন্দরাম' একদিন অনেকে রুদ্ধশ্বাস কৌতূহলে পড়েছেন। পাঁচকড়ি দের সঙ্গে আরো অনেকে গোয়েন্দা-উপন্যাস লিখেছিলেন, যেমন যতীন পাল, সুরেন ভট্টাচার্য প্রভৃতি। কিন্তু এঁদের সব রচনাই কোন-না-কোন বিদেশী গোয়েন্দা কাহিনীর অক্ষম বাংলা সংস্করণ ছাড়া কিছু নয়। আজ বাংলা সাহিত্যের এই দিকটা খুব পূর্ণতা লাভ করেনি। অবশ্য দীনেন্দ্রকুমার রায়ের বৈদেশিক গোয়েন্দা কাহিনীর তর্জমাগুলি চমৎকার।

রবীন্দ্র-সমসাময়িক আমলে গার্হস্থ্য উপন্যাস যথেষ্ট লিখিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে যাঁদের নাম উল্লেখযোগ্য, তাঁদের মধ্যে সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, নারায়ণ-চন্দ্র ভট্টাচার্য, শৈলবালা ঘোষজায়া, হারাণচন্দ্র রক্ষিত, জলধর সেন, প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, স্বর্ণকুমারী দেবী, কুসুমকুমারী দেবী, যতীন্দ্রমোহন সিংহ প্রভৃতির রচনার এখনো কতকটা কদর আছে।

সুরেন্দ্র ভট্টাচার্যের 'বিনিময়' সুখপাঠ্য রচনা, অবশ্য 'স্বর্ণলতা'র ছকে লেখা। তাঁর আধ্যাত্মিক উপন্যাসগুলিতে যোগবলে অলৌকিক কাণ্ডকারখানা করার যে সব বিবরণ আছে, তা আজগুবি হলেও বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। নারায়ণ ভট্টাচার্যের 'মণির বর' সুন্দর রচনা। পল্লী-জীবনের খুঁটিনাটি নানা বিষয় বর্ণনায় যেমন, গল্প গড়ায় তেমনি লেখকের হাত বেশ জোরাল। হারাণ রক্ষিতের 'কামিনী-কাঞ্চন' নীতিমূলক উপন্যাস। নাটকে রূপান্তরিত হয়ে একদা তা বাংলা দেশে খুব সমাদৃত হয়েছিল। শৈলবালা দেবী এবং জলধর সেন গার্হস্থ্য জীবনের ছোটখাটো চিত্রগুলি অত্যন্ত নিপুণ ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রথমের 'মঙ্গলমঠ', 'সেখ আন্দু' এবং দ্বিতীয়ের 'করিম শেখ', 'অভাগী', 'বড়বাড়ী' এক কালে খুব জনপ্রিয় বই ছিল। এঁরা দু-জনেই একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের দিকে দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, সে হল হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের প্রশ্ন।

কুসুমকুমারী দেবীর 'শুভ বিবাহ' এবং স্বর্ণকুমারী দেবীর 'দীপনির্বাণ', 'ছিন্ন মুকুল' প্রথম আমলের মহিলাদের লেখা উপন্যাস হিসাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রভাতকুমারের প্রকৃত খ্যাতি ছোট গল্প লেখক রূপে। তবে 'মনের মানুষ', 'রত্নদীপ', 'সিঁদুর কৌটা' প্রভৃতি উপন্যাসও লিখেছেন তিনি এবং বিচিত্র চরিত্র ও ঘটনার সমাবেশে বইগুলির বৈশিষ্ট্য অল্প নয়।

যতীন্দ্রমোহন সিংহের 'ধ্রুবতারা' উপন্যাস হিসাবে উচ্চতর সম্মান দাবী করে। প্রচলিত সামাজিক সংস্কারের বিরোধী অনেক মতামতকে এই বইয়ে সাহসের সঙ্গে ভাষা দেওয়া হয়েছে। 'সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা' নামক পুস্তিকায় আধুনিক কালের সাহিত্যিকদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালালেও, লেখকের ধ্রুবতারা কিন্তু এক হিসাবে আধুনিক উপন্যাস সাহিত্যের অগ্রদূত-স্বরূপ।

শরৎচন্দ্র

এর পর দেখা দিলেন শরৎচন্দ্র। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে আমরা পেয়েছিলাম মানুষের সংস্কৃতিশুদ্ধ মনের কামনা-কল্পনা ও আঘাত-সংঘাতের রূপ। শরৎচন্দ্রই প্রথম পাপ-তাপ ও স্খলন-পতনের ভেতর দিয়েও মানুষের আত্মিক মহিমাকে উজ্জ্বল করে ফুটিয়ে তুললেন। তিনিই প্রথম বোঝালেন দেশকে যে, সমাজ-পর্যায়ে যারা নীচু, যারা উপেক্ষিত, অবজ্ঞাত, মানুষ হিসাবে তারা তথাকথিত সম্ভ্রান্তদের চেয়ে কোন অংশেই খাটো নয়। যারা অবস্থা-বিপর্যয়ে কিংবা কোন বিশেষ দুর্বলতার আকর্ষণে, অন্যায় বা পাপের পথে পা বাড়িয়েছে, তারা অন্য অনেক সদ্‌গুণের সম্ভাবনীয়তা নিয়েও শুধু ঐ অপরাধের জন্য মনুষ্যত্বের অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে পারে না।

শরৎচন্দ্রের আগে এত স্পষ্ট করে এই কথা আর কেউ বলেননি। এদেশে ব্রাহ্মণ বলে, জমিদার বলে, বড় চাকুরে বলেই মানুষ চিরদিন সম্মানিত হয়েছে। বাইরের এই ঝুটা জৌলুস থেকে মুক্ত, নির্বিশেষ মানুষ বলে তার কোন স্বীকৃতি সমাজেও ছিল না, সাহিত্যেও ছিল না। বঙ্কিমে, মাইকেলে, এমন কি রবীন্দ্রনাথেও মানুষের সর্বাত্মক মানবিক অধিকার অস্বীকৃত হয়েছে। একমাত্র দীনবন্ধুতে, আর তাঁর পর শরৎচন্দ্রে সত্যিকার মানুষ এসেছে, এসেছে তার পাপ-তাপ, স্খলন-পতন, এবং সাহিত্যে তাকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে।

যে সমস্ত জিনিস একদা ঘৃণ্য বলে দূষণীয় বলে, আর্টের রাজ্যে অপাংক্তেয় বলে নিন্দিত ছিল, তার ভেতর দিয়েই শরৎচন্দ্র ফুটিয়ে তুলেছেন মানুষের অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্বকে। লাঠিয়াল আকবর আলি, পতিতা চন্দ্রমুখী, চাপা গোক্ষুর জোলা, জাতিভ্রষ্টা অন্নদাদিদি যে শরৎ-সাহিত্যের আসরে ঠিক সেই

সম্মানের দাবী নিয়েই দেখা দিয়েছেন, যেমন দিয়েছেন রমেশ, জ্যাঠাই মা, গিরিশ বা মহিম, তা 'দেবদাস', 'চন্দ্রনাথ', 'বামুনের মেয়ে', 'শ্রীকান্ত', 'পথের দাবী' প্রভৃতি উপন্যাসের পাঠককে বোঝাতে হবে না।

রবীন্দ্র-শরৎ-অনুগামী উপন্যাস

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এর পর আর এক ধাপ এগিয়ে এসেছেন। স্খলন, পতন ও অধঃপাতকে তিনি বৈজ্ঞানিক নিস্পৃহতার সঙ্গে উদ্‌ঘাটিত করে দেখিয়েছেন। বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষাবাদী নরেশচন্দ্র বলেন, জীবনের সত্য আর সাহিত্যের সত্য পৃথক নয়। ন্যায়ের মতো অন্যায়ের প্রবণতাও মানুষের সহজাত এবং তাকে মেনে নিয়েই মানুষের ইতিহাস। দরদ দিয়ে তাকে মহনীয় করে তুলতে যাওয়া অর্থহীন। বলা বাহুল্য, নরেশচন্দ্রের এই বাস্তবতার মধ্যে আতিশয্য আছে। মানুষ মাত্রেই জন্মগতভাবে 'ক্রিমিনাল' নয়, আবার অবস্থা-বিপর্যয়ে উদ্‌ভ্রান্ত ও বিপথচালিত 'স্বভাবসুজন'ও নয়। তা সত্ত্বেও তাঁর নির্লিপ্ত কঠোরতা, দুঃসাহস, সর্বোপরি জীবন-পর্যায়ের নিম্নতর সোপানগুলির সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ('রক্তের ঋণ', 'শান্তি', 'শুভা') পরবর্তী সাহিত্যের পথ যথেষ্ট প্রশস্ত করে দিয়েছে।

শরৎচন্দ্র ও নরেশচন্দ্রের হাত দিয়ে যখন নূতন উপন্যাসের ইমারত তৈরী হচ্ছে, তখনো সাবেকী গার্হস্থ্য উপন্যাসের ধারায় হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ (প্রিয়া), শচীশ চট্টোপাধ্যায় (কুঞ্জের ঝঙ্কার), ফণীন্দ্রনাথ পাল (স্বামীর ভিটা, সই মা), অনুরূপা দেবী (মা, পোষ্যপুত্র, মন্ত্রশক্তি), নিরুপমা দেবী (অন্নপূর্ণার মন্দির, দিদি) প্রভৃতি অনেক উপন্যাস লিখেছিলেন। এঁদের মধ্যে অনুরূপা দেবী ও নিরুপমা দেবীর লেখা এক সময় খুব জনপ্রিয় ছিল।

সাবেকী ধারাতেও না, আবার শরৎচন্দ্র-নরেশচন্দ্রের ধারাতেও নয়, অথচ নবযুগের দৃষ্টি, দরদ ও জিজ্ঞাসা নিয়েই লেখা হয়েছিল আরো অনেক উপন্যাস। চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রূপের ফাঁদ', 'হেরফের', সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'কাজরী', হেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'জলের আল্পনা' প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর 'বাজীকর', 'অচল পথের যাত্রী', উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'রাজপথ', 'অমূল তরু', মনীন্দ্রলাল বসুর 'রমলা' এই সময়কার অজস্র বইয়ের মধ্যে মাত্র কয়েকখানি। কিন্তু যুগের চিন্তা ও জীবন-বেদনা গভীর ভাবে রূপ পায়নি এই সব লেখায়। ফুরফুরে মেজাজে ও ঝরঝরে ভাষায় লেখা মনোরম মধ্যাহ্ন-পাঠের উপন্যাস এগুলি।

আধুনিক কাল

এর পর আধুনিক যুগ। এযুগের সাহিত্য সুরু হল প্রবল একটা বিদ্রোহের উত্তাপ নিয়ে। ধর্ম, নীতি ও সংস্কারের, সমাজ, সম্পর্ক ও সদাচারেব পুরাতন মূল্যমান নতশিরে মেনে নিলেন না এ যুগের লেখকরা। সব কিছু ভেঙেচুরে বিশ্লেষণ করে যাচাই করে নিতেই অগ্রণী হলেন তাঁরা। ফ্রয়েডীয় বিজ্ঞান ও মার্কসীয় দর্শন থেকে এল এই নূতন যুগ-চেতনা এবং বাংলা উপন্যাস ও গল্প-সাহিত্যে সেই চেতনা প্রকাশ পেল।

নিঃস্ব বিড়ম্বিত সমাজভ্রষ্ট মানুষের কথা এর আগেও লেখা হয়েছে বাংলা ভাষায়। কিন্তু আগেব যুগে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী পরিচ্ছন্ন ছিল না অনেকের। তাছাড়া সুনীতি-দুর্নীতির একট ধ্রুব মান মানতেন তাঁরা। তাই সেদিনেব সাহিত্যে সমবেদনাপূর্ণ মানবতার বাণী পাওয়া যায়। কিন্তু বর্তমান সমাজ ভেঙে নূতন সমাজ গড়াব যে চেতনা এল এ যুগে, তা সম্পূর্ণ নূতন জিনিস।

নূতন বলেই এতে ভালোমন্দ দুটো দিকই ছিল এবং এ সাহিত্যেব নিন্দা-প্রশংসাও হয়েছে অনেক। এই আমলের লেখকরা সাধারণ ভাবে 'কল্লোল' ও 'কালি-কলমে'র দল নামে পরিচিত, যদিও সবাই এই দুই পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন না। এঁদের মধ্যে জগদীশ গুপ্ত, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রবোধকুমার সান্যাল, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

জগদীশ গুপ্তের 'তাতল সৈকতে', 'সুতিনী', বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যাযের 'পথের পাচালী', 'দৃষ্টিপ্রদীপ', 'আরণ্যক', বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'স্বর্গাদপি গরীয়সী', তারাশংকরের 'পঞ্চগ্রাম', 'গণদেবতা', 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা', শৈলজানন্দের 'মহাযুদ্ধের ইতিহাস', প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'উপনায়ন', প্রবোধকুমার সান্যালের 'নদনদী', 'হাসুবানু', অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'কাক-জ্যোৎস্না', 'বিবাহের চেযে বড়', মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দিবারাত্রির কাব্য', 'পুতুলনাচের ইতিকথা' আধুনিক কালের সুপরিচিত উপন্যাস।

তারাশংকরের রচনায় কবিয়াল, লাঠিয়াল, বাউল, বেদে ও বাগ্দী সমাজ সম্বন্ধে গভীর অভিজ্ঞতার পরিচয় মেলে। শৈলজানন্দ এঁকেছেন সাঁওতাল

কুর্মী ও কয়লাখাদের মজুরদের জীবন। প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রবোধ সান্যাল ও অচিন্ত্য সেনগুপ্ত শহরের বস্তিবাসী নিম্নবিত্ত স্খলিতনীতি সাধারণ মানুষদের জীবনকে রূপায়িত করেছেন। মাণিক এঁকেছেন কুলি-মজুর ও নিরন্ন দেহশ্রমী মানুষদের ছবি। জগদীশ গুপ্তের রচনায় পাই দুর্নীতি, অন্যায় ও অনাচারের পঙ্কে আকণ্ঠ মগ্ন মানুষের প্রতি অকপট দরদ। বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় ভাষা দিয়েছেন মানুষের অন্তর্নিহিত সূক্ষ্ম রসানুভূতি ও প্রকৃতি-প্রেমকে।'

সবাই এঁরা কৃতী লেখক। কেউ বাস্তবপন্থী, কেউ রোমান্টিক, কিন্তু প্রত্যেকেই শক্তিমান ও জীবন-দরদী শিল্পী। এঁদের সঙ্গেই আছেন সরোজকুমার রায়চৌধুরী, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী, রামপদ মুখোপাধ্যায়, মনোজ বসু, আশাপূর্ণা দেবী প্রমুখ আরো অনেক লেখক-লেখিকা, যাঁরা সমসাময়িক পাঠকদের প্রিয়।

দিলীপকুমার রায় ('মনের পরশ', 'দোলা') অন্নদাশঙ্কর রায় ('সত্যাসত্য'), ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ('আবর্ত'), বুদ্ধদেব বসু ('যেদিন ফুটল কমল'), গোপাল হালদার ('একদা') প্রমুখ লেখক লিখেছেন বুদ্ধিদীপ্ত আধুনিক নর-নারীর কাহিনী, যাতে বাগ্‌বৈদগ্ধ্য ও বিচার-বিতর্ক গল্পের চেয়ে বেশী প্রাধান্য নিয়েছে। এঁদের উপন্যাসে পাওয়া যায় মানুষের মনোজগতের বিচিত্র ভাঙাগড়ার আলেখ্য। বস্তু সংসার ও বাস্তব জীবন সব জায়গায় জীবন্ত হয়ে ওঠেনি।

একেবারে আজকের লেখকদের মধ্যে সুবোধ ঘোষ ('শতভিষা,' 'তিলাঞ্জলি'), সতীনাথ ভাদুড়ী ('জাগরী'), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ('উপনিবেশ'), অবধূত ('মরুতীর্থ হিংলাজ'), বিমল মিত্র ('সাহেব-বিবি-গোলাম')' হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ('ইরাবতী'), বরেন বসু ('রংরুট'), শচীন বন্দ্যোপাধ্যায় ('এ জন্মের ইতিহাস'), সমরেশ বসু ('গঙ্গা') প্রমুখের লেখাও বিষয়-বৈচিত্র্যে এবং রচনা-নৈপুণ্যে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

সপ্তম অধ্যায়

গল্প

বঙ্কিমচন্দ্র ও বঙ্কিম-সমসামযিক লেখকরাই বাংলায় উপন্যাস সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আগে ছোটগল্প-রচনার দিকে কারো দৃষ্টি পড়েনি। কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম পঁ্যাচার নক্সা'য় এবং বঙ্কিমের 'লোক-রহস্যে'র কতকগুলি রচনায ও 'কমলাকান্তের দপ্তরে' মাঝে মাঝে ছোটগল্পের ধাঁচা পাওয়া যায়। কিন্তু প্রকৃত ছোট গল্প বলা যায না তার কোনটাকেই। সঞ্জীবচন্দ্রের 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট', দীনবন্ধুব 'পোড়া মহেশ্বর', বঙ্কিমের 'যুগল-অঙ্গুরীয়' ছোট আখ্যায়িকা। গল্প বলতে যে শ্রেণীর রচনা বোঝায, তা থেকে এরা স্বতন্ত্র জাতের জিনিস।

সাপ্তাহিক 'হিতবাদী'তে রবীন্দ্রনাথই প্রথম ছোট গল্প লেখা সুরু করেন। তাঁর সমসাময়িক ও অনুগামীরা এ পথে অনুসরণ করেছেন তাঁকেই। সুরেশ সমাজপতি, জলধর সেন, দীনেন্দ্রকুমার রায়, সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে প্রভাত-কুমার বিশিষ্ট গল্পলেখক রূপে যশস্বী। রবীন্দ্রনাথের গল্পে মানব-জীবনের বিচিত্র ভাবানুভূতিগুলি রূপ পেয়েছে। প্রভাতকুমার রূপ দিয়েছেন তাব রৌদ্রোজ্জ্বল কৌতুকের দিকগুলিকে। অবশিষ্টেরা সকলেই লিখেছেন গার্হস্থ্য জীবনের বিবিধ সুখ-দুঃখের কাহিনী।

এই সময় থেকে বাংলায় বিদেশী গল্প-সাহিত্যেরও ব্যাপক অনুশীলন আরম্ভ হয় এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রমথ চৌধুরী ফরাসী সাহিত্যের অনেক বিখ্যাত গল্প বাংলায় অনুবাদ করেন। প্রমথ চৌধুরীর অনূদিত ফরাসী গল্প 'ফুলদানি' এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-কৃত ব্যালজাক, মোপার্সাঁ, গতিয়ে, দোদে প্রমুখ ফরাসী লেখকের গল্পানুবাদ অনেকেই পড়ে থাকবেন। একদিকে রবীন্দ্রনাথের মূল গল্প, অন্যদিকে এই সব অনুবাদ-গল্পই বাংলা সাহিত্যে প্রথম নিয়ে আসে গল্প-রচনার একটি নূতন বেগ। ছোট-বড়-মাঝারি অসংখ্য গল্পলেখকের আবির্ভাব হয়। এই নূতন লেখকদলের মধ্যে সর্বপ্রধান

নাম শরৎচন্দ্রের। সমাজ-জীবনের নানা জটিল সমস্যাকে, নানা কু-অভ্যাস ও কদাচারের দৌরাত্ম্যকে তিনি গল্পের মাধ্যমে ফুটিয়েছেন। অথচ শিল্পগুণ-ভ্রষ্ট হয়ে তাঁর গল্প প্রচারধর্মী হয়নি কোথাও। শরৎ-সমসাময়িক লেখকদের মধ্যে কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, হেমেন্দ্রকুমার রায় প্রভৃতির গল্পও এক সময় বিশেষ লোকপ্রিয় ছিল।

আধুনিক কালের কথাসাহিত্যিকরা প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর পৃথিবীর সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান থেকে নূতন জীবন-দর্শনের দীক্ষা পেয়েছেন। এঁদের গল্পে তাই যেমন মনোবিকলনের জটিলতা এসেছে, তেমনি এসেছে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব। তাছাড়া গল্পের গঠনশৈলী নিয়েও এঁরা প্রভূত পরীক্ষা করেছেন। এঁদের মধ্যে জগদীশ গুপ্ত, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রবোধকুমার সান্যাল, প্রেমেন্দ্র মিত্র, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। হাসির গল্পে পরশুরাম নিজস্ব একটি সমাদরের আসন লাভ করেছেন।

আজ সাহিত্যের আর সব বিভাগের চেয়ে গল্পের বিভাগটিই বেশী সমৃদ্ধ হয়েছে এবং অধিকাংশ লেখকই মন দিয়েছেন গল্প লেখায়। এঁদের মিলিত দানে গল্পের কারুকলা এমন জায়গায় উন্নীত হয়েছে যে, বাংলা গল্প আজ অনায়াসে বিশ্বসাহিত্যে স্থান পেতে পারে। অতি সাধারণ স্তরের লেখকের হাতেও আজ গল্প কোথা থেকে আরম্ভ করতে হয়, কোথায় শেষ করতে হয়, কতটুকু তাতে বলতে হয়, সেই মাত্রাজ্ঞান এসেছে।

রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের গল্প সংখ্যায় যেমন প্রচুর, বৈচিত্র্যে যেমনি অসাধারণ। এক দিকে তিনি যেমন মধ্যবিত্ত বাঙালী জীবনের সুখ-দুঃখের বিচিত্র চিত্র মেলে ধরেছেন তাঁর গল্পের মধ্যে, অন্যদিকে তেমনি দূরবর্তী রোমান্সের পটভূমিতে প্রক্ষেপ করে মানব-জীবনের নানা আশা-আশঙ্কা ও বেদনাকে রূপ দিয়েছেন। 'দিদি', 'ঠাকুর্দা', 'আপদ', 'পোস্ট মাস্টার', 'মাল্যদান', 'কাবুলিওয়ালা' প্রভৃতি গল্প হল প্রথম দিকের এবং 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'নিশীথে', 'দুরাশা', 'মণিহারা', দ্বিতীয় দিকের অনুপম নিদর্শন। নীতিগল্প হিসাবে 'গুপ্তধন,' কৌতুক-গল্প

হিসাবে 'ইচ্ছাপূরণ', 'অধ্যাপক' এবং রোমাঞ্চ-গল্প হিসাবে 'কঙ্কাল' তাঁর স্মরণীয় রচনা। 'মেঘ ও রৌদ্র'ও অদ্বিতীয় প্রেমের গল্প।

রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষায় ছোটগল্পের প্রবর্তক এবং তাঁর স্বকীয় ধারার সর্বশ্রেষ্ঠ লেখকও তিনি। কিন্তু বাংলা গল্প সাহিত্য গত অর্ধশতাব্দীতে এত পথ এগিয়ে এসেছে যে, রবীন্দ্রনাথের গল্প অধুনিক পাঠকের কাছে একটু সাবেকী না লেগে পারে না। প্রথমত তা যতটা কাব্যধর্মী, ততটা বস্তুধর্মী নয়। তাই সর্বত্র সত্যকার জীবন চিত্রিত হয়েছে মনে হয় না। দ্বিতীয়ত তাতে বাগ্‌বিন্যাসের মাধ্যমরূপে সাধু ভাষার ব্যবহার সব সময় রুচিকর ঠেকে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও 'গল্পগুচ্ছে'র গল্পগুলির অসামান্য শিল্পগুণ আজও তাদের বাসি হতে দেয়নি।

প্রভাতকুমার

প্রভাতকুমার প্রধানত কৌতুক-রসের গল্প লিখেই প্রসিদ্ধ। তাঁর 'রসময়ীর রসিকতা,' 'বলবান জামাতা,' 'মাস্টার মশায়,' 'নিষিদ্ধ ফল' প্রভৃতি গল্প বিশুদ্ধ কৌতুক-গল্প হিসাবে ছোট-বড় সবাই উপভোগ করতে পারেন। কৌতুকের আড়ালে শ্লেষ বা বক্র ইঙ্গিত নেই কোথাও। কোথাও নেই কোন দেশাচার বা অন্যায় ও অনৌচিত্যের ওপর কশাঘাতের চেষ্টা। অজস্র অফুরন্ত রঙ্গ ও রসিকতায় ঝলমল-করা তাঁর গল্প। হয়ত গভীরতা তাতে কম, কিন্তু বিচিত্রতার অভাব নেই। অবশ্য গভীর ব্যঞ্জনার গল্পও তিনি লিখেছেন, যেমন 'ফুলের মূল্য,' 'কুমুদের বন্ধু.' যেমন 'আদরিণী'। কিন্তু তাঁর লেখনীর বৈশিষ্ট্য হাল্কা লেখায় যত ফুটেছে, গভীরে তা নয়।

প্রভাতকুমারই একটা জিনিস বাংলা সাহিত্যে নূতন আমদানি করেন। সে হল বিলাত-প্রবাসী বাঙালীর এবং বাঙালীর মাধ্যমে আহৃত বিদেশীর জীবন নিয়ে গল্প। 'ফুলের মূল্য' ও 'কুমুদের বন্ধু' এই দিককারই সর্বোত্তম নিদর্শন। মোটের ওপর 'বলবান জামাতা,' 'রসময়ীর রসিকতা' এবং 'দেশী-বিলেতী,' এই তিনটি সংগ্রহ যাঁরা আজও পড়বেন, তাঁরা যে একই সঙ্গে প্রীত ও পুরস্কৃত হবেন, তাতে আর সন্দেহ নেই। প্রভাতকুমার ছিলেন সত্যকার গল্পী, তিনি গল্প বলতেন। গল্পকে আশ্রয় করে আর কিছু বলতেন না।

অন্যান্য লেখক

প্রভাতকুমারের সমবয়সীদের মধ্যে অনেকেই ছোট গল্প লিখেছেন এবং এক সময় দেশে তাঁদের গল্পের বেশ আদরও ছিল। দীনেন্দ্রকুমার রায়ের 'পল্লীচিত্র', 'পল্লীচরিত্র' ও 'পল্লীবৈচিত্র্যে'র খণ্ড-চিত্রগুলি ঠিক গল্প না হলেও, কতক-গুলিতে বেশ সুগঠিত গল্পের কাঠামো পাওয়া যায়। এছাড়া তাঁর 'সেকেলে-ডেপুটী', জলধর সেনের 'চোখের জল,' 'এক পেয়ালা চা,' সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কাসিমের মুরগী,' সুরেশচন্দ্র সমাজপতির 'ভাগ্যহীনা' প্রভৃতি গল্পগুলিও যে-কোন আধুনিক সংগ্রহে সাদরে গৃহীত হতে পারে। ভাগলপুরের সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের কয়েকটি গল্পও এক সময় উচ্চ প্রশংসায় সম্বর্দ্ধিত হয়েছিল। আজও কিছু ঔজ্জ্বল্য আছে তাদের।

শরৎচন্দ্র

শরৎচন্দ্রের আবির্ভাবে কথাসাহিত্যের রুচি ও অনুরাগ মানুষের এমন ভাবেই বদলে গেছে যে, আগের অধ্যায়ের ভালো লেখাগুলো সম্বন্ধেও তাঁদের আজ মনোযোগ শিথিল হয়েছে। নূতন প্রতিভার আবির্ভাবে এ জিনিস হয় সব দেশেই। নূতনকে গ্রহণের মত্ততায় মানুষ পুরানোকে এক মুহূর্তে ভুলে যান।

শরৎচন্দ্র বিশুদ্ধ ছোট গল্প সংখ্যায় বেশী লেখেননি। 'দেবদাস,' 'চন্দ্রনাথ', 'বামুনের মেয়ে', 'পল্লীসমাজ', সবই তাঁর ছোট উপন্যাস। তবে 'বিন্দুর ছেলে', 'রামের সুমতি' গল্প, যেমন 'মহেশ', 'আঁধারে আলো', 'ছবি' এবং 'সতী'ও গল্প। এর মধ্যে মহেশ গল্পই তাঁর সব চেয়ে জীবন্ত ও যুগচিন্তা-সম্মত। নিরন্ন চাষী-জীবনের বেদনা এবং সমৃদ্ধ উঁচু সমাজের জুলুম গল্পটির মধ্যে যেন মূর্তি ধরেছে। একটি মূক গরুকে তিনি এই গল্পে গড়েছেন মানুষের দোসর করে। বিন্দুর ছেলের বিন্দু এবং রামের সুমতির নারায়ণী শরৎ-সাহিত্যের সুপরিচিত মাতৃভাবাপন্ন নারীর প্রতীক হলেও এবং আয়তনে একটু দীর্ঘ হলেও, এ গল্প দুটিও সুন্দর। বিশেষত রামের সুমতি। সতী গল্পটিও জোরাল এবং তার ভেতর একটি বলিষ্ঠ প্রশ্ন তুলে ধরেছেন শরৎচন্দ্র। তথাকথিত সতীত্ব পূর্ণ নারীত্বের চেয়ে বড় কিনা?

কিন্তু আঙ্গিকের দিক থেকে নিখুঁত ছোট গল্প, যা ছোটও হবে এবং কোন উপন্যাসের খণ্ডবিশেষও হবে না, শরৎচন্দ্র কমই লিখেছেন। তিনি আসলে ঔপন্যাসিক।

প্রমথ চৌধুরী

শরৎচন্দ্রের পাশাপাশি গল্পলেখক-রূপে উল্লেখযোগ্য প্রমথ চৌধুরীর নাম। বাংলা দেশের ও বাঙালী সমাজের অন্তরঙ্গ পরিচয় তাঁর বেশী জানা ছিল না। ঘটনা ও চরিত্র-সৃষ্টির মধ্যে তাঁর রবীন্দ্রনাথের মতো কাব্যকলা বা শরৎচন্দ্রের মতো জীবনবোধও নেই। তবু তাঁর কোন কোন গল্পে যে অসাধারণত্বের চমক দেখা যায়, তা প্রথম দু-জনের লেখায় মেলে না।

প্রমথ চৌধুরীই বাংলার একমাত্র লেখক, যাঁর রচনায় স্যাঁৎসেঁতে ভাবালুতা নেই, আবার কাতুকুতু-দেওয়া খেলো ভাঁড়ামিও নেই। অথচ জীবনের ব্যথা-বেদনাকেও তিনি যেমন রূপ দিয়েছেন, তেমনি তার ন্যাকামিকেও ঘা দিয়েছেন। 'চার ইয়ারী কথা', 'নীল-লোহিতের আদি প্রেম', 'ঘোষালের ত্রি-কথা', যে-কোন গল্পসংগ্রহ হাতে নিলেই তাঁর এই বৈশিষ্ট্য ধরা পড়বে।

অবশ্য প্রমথ চৌধুরীর অনেক গল্প আছে, যা গল্পাকারে আলোচনা মাত্র। কতক আছে নিছক খোসগল্প বা বৈঠকী গল্প। এগুলো শুধু তাঁর লিপি-চাতুর্যেই উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। হয়ত নিষ্ঠা-সহকারে গল্প লিখলে, বাংলা সাহিত্যকে তিনি প্রচুর সম্পদ দিয়ে যেতে পারতেন। 'আহুতি', 'ট্র্যাজেডীর সূত্রপাত', 'সহযাত্রী', 'বীণাবাঈ' যাঁর লেখনী-নিঃসৃত, তিনি যে নিঃসংশয়ে রবীন্দ্র-শরৎ-পর্যায়ের কথাসাহিত্যিক, এতে আর সন্দেহ নেই।

রবীন্দ্র-শরৎ-পরিমণ্ডল

রবীন্দ্রনাথের কাব্যরস, শরৎচন্দ্রের জীবনবোধ ও প্রমথ চৌধুরীর বাগ্‌ভঙ্গি, এই তিন একযোগে পরবর্তী কালের গল্প সাহিত্যে নূতন দিগন্ত উন্মুক্ত করে দিল। সব চেয়ে বেশীসংখ্যক লেখকই এর পর থেকে অবহিত হলেন গল্প-লেখায় এবং ভালো-মন্দ-মাঝারিতে এই সময় বাংলা গল্পের পুঁজি যা সৃষ্টি হল, তার মূল্য নিতান্ত অল্প নয়।

শরৎচন্দ্র যখন 'যমুনায়' নূতন নূতন গল্প-উপন্যাস লিখছেন, 'ভারতী'তে তখন চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী,

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায় প্রমুখ লেখকও গল্প লেখায় অবহিত হন। এক মণিলাল ছাড়া এঁরা আর সকলেই অধিকতর মনোযোগ দিয়েছেন উপন্যাস লেখায়। কিছু ভালো গল্প কিন্তু কিছু আছে সকলেরই। আছে সরোজনাথ ঘোষ, মাণিক ভট্টাচার্য প্রভৃতিরও। একটি সংকলন-গ্রন্থে এঁদের রচনা-নিদর্শন গ্রথিত করা হলে, তা অনুপভোগ্য হবে না।

'কল্লোল' ও 'কালি-কলম'-দল

কিন্তু এর পরের ধাপেই এল প্রকৃত গল্প সাহিত্যের জোয়ার এবং 'কল্লোল' ও 'কালি-কলম' থেকে যাঁরা নূতন গল্পলেখক রূপে দেখা দিলেন, আজ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের তাঁরাই শ্রেষ্ঠ গল্পকার। জগদীশ গুপ্ত, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রবোধকুমার সান্যাল, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ লেখক এলেন এই সময়। তখনকার দিনে এঁদের নাম ছিল 'তরুণ' এবং তরুণ কথাটার ব্যবহার হত নিন্দার্থে।

নিন্দার কারণ, এঁরা প্রচলিত ঐতিহ্য অনুসরণ না করে নূতন দৃষ্টিভঙ্গি ও মতবাদ-অনুযায়ী সাহিত্য-রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। এক দিকে সমাজের যারা ধিকৃত, নিগৃহীত, উপেক্ষিত, সেই সমস্ত চোর, ডাকাত, ভিক্ষুক, পতিতা এবং কুলি, মজুর, বাগদী, ডোম, সাপুড়ে, তাদের জীবন নিয়ে গল্প লেখা সুরু করেন তাঁরা। অন্য দিকে জীবন ও সমাজের যেগুলো স্বীকৃত মূল্যমান, প্রেম, মনুষ্যত্ব, সতীত্ব, তার দর যাচাই সুরু করেন তাঁরা বাস্তবের কষ্টিপাথরে। এই দুই কারণেই রক্ষণশীল সমাজের চিত্ত বিচলিত হয়েছিল। যদিও তাঁদের শক্তি নজর এড়ায় নি কারুর।

অবশ্য নূতন আদর্শ-প্রবর্তনের তাগিদে এঁরা সেদিন আতিশয্য করেছিলেন অনেক ক্ষেত্রে। তাছাড়া যে মার্ক্সবাদ-প্রভাবে সমাজ-বিপ্লব ও ফ্রয়েডবাদ-প্রভাবে চিন্তা-বিপ্লব আনতে চেয়েছিলেন তাঁরা, তার সম্বন্ধে সম্যক অভিজ্ঞতাও ছিল না তাঁদের। তাই নূতনের নেশা যত বড় হয়েছিল, নূতন সৃষ্টি তত বড় হয়নি। তবে সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন অনেকেই এবং সার্থক সৃষ্টি করে যশস্বীও হয়েছেন। জগদীশ গুপ্তের 'বিনোদিনী', 'তৃষিত সৃক্কণী', তারাশংকরের 'জলসা ঘর', 'বেদেনী', শৈলজানন্দের 'কয়লাকুঠি', 'বধূবরণ', প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পুতুল ও প্রতিমা', 'মৃত্তিকা', প্রবোধকুমারের 'নিশিপদ্ম',

অচিন্ত্যকুমারের ‘ছাড়ি-মুচি-ডোম’, ‘কাঠ-খড়-কেরোসিন’, গল্প-সংগ্রহ হিসাবে বাংলা সাহিত্যের স্মরণীয় গ্রন্থ।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল), সরোজকুমার রায়চৌধুরী, প্রমথনাথ বিশী, মনোজ বসু, রামপদ মুখোপাধ্যায়, পরিমল গোস্বামী, গজেন্দ্রকুমার মিত্র প্রমুখ আরো বহু কৃতী গল্পলেখক উঠেছেন এই সময়ে। উঠেছেন বয়সে প্রবীণ হলেও পরশুরাম (রাজশেখর বসু), যাঁর ‘কজ্জলী’, ‘গড্ডালিকা’, ‘হনুমানের স্বপ্ন’ বাংলা সাহিত্যে একটি নূতন দিকের দরজা খুলে দিয়েছে। ব্যঙ্গ-দর্শনের বিদ্যুৎ-ঝলকে উদ্ঘাটিত করেছেন তিনি সমাজ ও মানুষের নানা অচেনা দিক।

বর্তমান অধ্যায়

‘কল্লোল’, ‘কালি-কলমে’র সামান্য পরে দেখা দেন মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়। উপন্যাসে অধিকতর খ্যাতিমান হলেও, গল্পলেখক হিসাবেও তাঁর বৈশিষ্ট্য কম নয়। ‘তরুণ’ সাহিত্যের ঐতিহ্যই তিনি বলিষ্ঠতর পৌরুষে অনুসরণ করেছেন এবং ঘৃণ্য, কুৎসিত ও বর্জনীয় মুল্লুক থেকেও সৃষ্টির উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। ‘প্রাগৈতিহাসিক’ তাঁর সর্বোত্তম গল্পগ্রন্থ। শেষের দিকে তাঁর লেখায় রাজনৈতিক মতবাদের প্রাধান্য এসেছিল, এসেছিল কিছুটা ক্লেদাসক্তিও। তা সত্ত্বেও তাঁর প্রতিভার অনন্যসাধারণ নিজস্বতা অম্লান ছিল।

সুবোধ ঘোষ, জ্যোতির্ময় রায়, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, বিমল মিত্র, আশিস গুপ্ত, আশাপূর্ণা দেবী, জ্যোতির্মালা দেবী প্রভৃতিও গল্প সাহিত্যে যথেষ্ট নূতন সম্পদ দিয়েছেন। সুবোধ ঘোষের ‘ফসিল’, ‘পরশুরামের কুঠার’, জ্যোতির্ময় রায়ের ‘পদ্মনাভ’, আশিস গুপ্তের ‘বন্দিনী সুভদ্রা’ এবং আশাপূর্ণা দেবীর ‘জল আর আগুন’ ইদানীন্তন গল্পসংগ্রহগুলির মধ্যে শীর্ষ স্থান নিতে পারে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, সন্তোষ ঘোষ, সুশীল জানা, বাণী রায়, রমাপদ চৌধুরী, সমরেশ বসু, সুলেখা সান্যাল, ননী ভৌমিক, প্রফুল্ল রায় প্রভৃতি আসেন এঁদের পরে এবং এঁরাই এখনো পর্যন্ত বাংলার আধুনিকতম গল্পলেখক। এঁদের মধ্যে নারায়ণের ‘বীতংস’ ও নরেন্দ্রের ‘চড়াই-উৎরাই’ বিশেষ উল্লেখযোগ্য বই। উভয়েই, বিশেষত নারায়ণ প্রকৃত শক্তিশালী লেখক এবং তাঁর কাছে কারো প্রত্যাশা ফুরায়নি।

অষ্টম অধ্যায়

শিশু-সাহিত্য

শিশুদের জন্যে পৃথক করে সাহিত্য-রচনার প্রয়োজন বাঙালী লেখকরা বিগত শতাব্দীতে অনুভব করেন নি। তখন ছেলেমেয়েদের জন্যে শুধু পাঠ্য-পুস্তকই লেখা হত। বিদ্যাসাগর, অক্ষয় দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, মদনমোহন তর্কালংকার, মনোমোহন বসু, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, সকলেই সে কাজ করেছেন। শিশুদের আনন্দ ও কৌতুকের ভেতর দিয়ে শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন প্রথম অনুভব করেন রবীন্দ্র-যুগের লেখকরা। এঁদের মধ্যে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, কার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রভৃতি হলেন পথপ্রদর্শক।

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও শিশুদের জন্যে বিভিন্ন সময়ে কলম ধরেছেন। শিশু-সাহিত্য-রচনা রবীন্দ্র-প্রতিভার ক্ষেত্রে একটা গৌণ দিক সন্দেহ নেই, কিন্তু এই একটি দিকেও তাঁর অসাধারণতা সামান্য নয়।

আজকের বিশিষ্ট লেখক যাঁরা, তাঁরা সকলেই কিছু-না-কিছু লিখেছেন ছোটদের জন্যে। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ 'প্রাগাধুনিক' লেখকরাই হন, আর শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ আধুনিক লেখকরাই হন, বালক-বালিকা ও কিশোর-কিশোরীদের জন্যে কিছু কিছু গল্প, কবিতা লিখেছেন সকলেই। আধুনিক লেখকদের মধ্যে গল্পে শিবরাম চক্রবর্তী এবং কবিতায় সুনির্মল বসুর বিশেষ একটু খ্যাতি আছে।

আজকের শিশু-সাহিত্যে একদিকে যেমন কবিতা, গল্প ও উপন্যাসের প্রাচুর্য হয়েছে, অন্যদিকে তেমনই দেশ-বিদেশের ইতিহাস, সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের চিত্তাকর্ষক তথ্য পরিবেষণ করা হচ্ছে এবং সে কাজও করছেন কৃতী লেখকরা। শিশু-সাহিত্য রচনা করেই বিশ্বসাহিত্যে বরণীয় হয়েছেন যে সব লেখক, তাঁদের সমকক্ষ প্রতিভাধরদের আজও অবশ্য আবির্ভাব হয়নি বাংলা সাহিত্যে। তবে ভবিষ্যতে হবে না, কে বলতে পারেন?

রবীন্দ্র-যুগের আগে বাংলাদেশে ছোটদের জন্যে পাঠ্যপুস্তক ছাড়া অন্য কোন রকম বই ছিল না। বিদ্যাসাগরের 'কথামালা,' 'বোধোদয়,' 'আখ্যানমঞ্জরী', অক্ষয় দত্তের 'চারুপাঠ', মদনমোহন তর্কালংকারের 'শিশুশিক্ষা,' রামসুন্দর বসাকের 'বাল্যশিক্ষা,' মনোমোহন বসুর 'পদ্যমালা' ইত্যাদি বই এ দেশে সবাই পড়েছেন ছেলেবেলায়। একটু ওপরের দিকে উঠে তাঁরা পেয়েছেন বিদ্যাসাগরের 'সীতার বনবাস', তারাশংকরের 'কাদম্বরী'ও শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের 'রামের রাজ্যাভিষেক।' আরও ওপরে উঠে পড়েছেন মাইকেল, দীনবন্ধু ও বঙ্কিম-চন্দ্রের রচনাবলী। পাঠ্যপুস্তকের এলাকার বাইরে মানুষের ক্রমবর্ধনশীল বয়স ও বুদ্ধিকে সাহিত্যের মাধ্যমে চালিত করার কথা সেদিন ভাবাই হয়নি।

'বীবরের বাসস্থান,' 'মিথ্যাকথা বলার পরিণাম,' 'উইলিয়ম রস্কোর অধ্য-বসায়' বা এই ধরনের গুরু-গম্ভীর রচনার ভারে দেশের ছেলে-মেয়েরা যেদিন হাঁপিয়ে উঠেছিল, সেদিন রবীন্দ্রনাথের 'শিশু', অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রাজ-কাহিনী,' দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদারের 'ঠাকুরমার ঝুলি', যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'হাসিখুসি', 'বনে জঙ্গলে', উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর 'টুনটুনির বই', নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের 'টুকটুকে রামায়ণ' দেশের ছেলে-মেয়েদের সামনে সত্যিই একটা নূতন রাজ্যের দরজা খুলে দিয়েছিল। ছড়া, কাহিনী, রূপকথা, গল্প একদিকে করেছিল তাদের বয়সোচিত ক্ষুধার তৃপ্তি সাধন, অন্যদিকে জাগিয়ে দিয়েছিল তাদের অনুভূতি ও কল্পনাকে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এ এক স্মরণীয় ঘটনা।

রবীন্দ্রনাথ

'শিশু' ও 'শিশু ভোলানাথে' রবীন্দ্রনাথের যে সব কবিতা স্থান পেয়েছে, তার মধ্যে 'তালগাছ,' 'কাগজের নৌকা', 'খোকার বনবাস' প্রভৃতি বিশুদ্ধ শিশু কবিতা অনেকগুলি পাওয়া যাবে। কিন্তু অধিকাংশ কবিতার বিষয় শিশু হলেও, শিশু সব সময় তার পাঠক নয়। বিশুদ্ধ শিশুসাহিত্য রবীন্দ্রনাথ লেখেন শেষ জীবনে। 'খাপছাড়া,' 'ছড়ার ছবি', 'সে', 'গল্পসল্প', এই কটি হল তাঁর এই রাজ্যে অতুলনীয় দান। নিজের বাল্যকাহিনী নিয়ে লেখা 'ছেলেবেলা'ও উল্লিখিত হতে পারে এই সঙ্গে। রঙে, রসে ও সুরে গদ্য-পদ্য এই বইগুলি রবীন্দ্রনাথের সর্বোত্তম রচনাবলীর সঙ্গে একাসন পেতে পারে। বানান ও বাক্যরচনা শেখানোর জন্যে লেখা 'সহজ পাঠ'ও তাঁর অসাধারণ বই।

সেই,

কুমোরপাড়ার গোরুর গাড়ী
বোঝাই করা কলসী-হাঁড়ি,
গাড়ী চালায় বংশীবদন,
সঙ্গে চলে ভাগনে মদন···

কিংবা,

আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে,
বৈশাখ মাসে তার হাঁটুজল থাকে···

শুধু ছোটদের কেন, বড়দেরও মুখস্থ করে রাখা উচিত।

অবনীন্দ্রনাথ

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিল্পিজনোচিত রঙিন ভাষা, কথা দিয়ে ছবিব পর ছবি এঁকে গল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, একদিকে প্রতিটি কথায় কাব্যের সুষমা বৃষ্টি ক'বে চলা, অন্যদিকে এক-একটি কলমের টানে মাটির পৃথিবীকে অপরূপ কবে ফোটান বাস্তবিকই অতুলনীয় কারুকর্মেব নিদর্শন। 'ক্ষীরের পুতুল', 'নালক', সর্বোপরি 'রাজকাহিনী' না পড়লে বাংলা গদ্যের এই কাব্যময় অনুপম রূপটির সঙ্গে পরিচয় হয না। 'রাজকাহিনী' সত্যিই এক অসাধারণ বই।

দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদারের ভাষাও চমৎকার। রূপকথা বলার যে নিজস্ব ঢঙটি এদেশে ঠাকুরমা-দিদিমার মুখে মুখে চলিত ছিল, দক্ষিণারঞ্জন তাকেই সাহিত্যে স্থাপনা করেছেন। বিশুদ্ধ বাংলা-রচনাশৈলীর জোর এবং জৌলুস কতটা, তার স্বাক্ষর আছে 'ঠাকুরমাব ঝুলিতে'। যোগীন সরকারের জীব-জন্তুদের গল্প, তাদের অদ্ভুত বুদ্ধি ও অদ্ভুততর কার্য-কলাপের কাহিনী সুন্দর বটে, কিন্তু সবচেয়ে সুন্দর তাঁর 'হাসিখুসি'র ছড়া। সেই 'হারাধনের দশটি ছেলে' এবং সেই 'দাদখানি চাল মুসুরির ডাল' প্রভৃতি ছড়া আজকের চল্লিশোর্ধ্ব সব বাঙালীর কণ্ঠস্থ আছে। এ দুটিই অবশ্য বিদেশী ছড়ার রূপান্তরণ। কিন্তু রূপ যেখান থেকেই আহৃত হক, তা অপরূপ হয়েছে কবির নিজস্ব ভাব-কল্পনা ও শিল্পকর্মে।

শিশু-পত্রিকা

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীও বাংলাদেশের শিশু-সাহিত্যে একজন অগ্রনায়ক। নিজে তিনি গদ্যে ও পদ্যে অনেক কিছু লিখেছেন যা মূল্যবান। কিন্তু সব চেয়ে বড় দান তাঁর 'সন্দেশ' নামে শিশু-পত্রিকা। 'সন্দেশে'র আগেও ছেলে-মেয়েদের জন্যে মাসিকপত্র হয়েছে বাংলা দেশে। প্রমদাচরণ সেনের 'সখা' এবং ভুবনমোহন রায়ের 'সাথী', পরে দুইয়ে মিলে 'সখা ও সাথী' তার মধ্যে অগ্রগণ্য কাগজ। 'মুকুল' নামে চলত আরও একখানা শিশু-পত্রিকা। কিন্তু 'সখা ও সাথী' হক আর 'মুকুল' হক, 'সন্দেশে'র পাশে কোনোটাই মুড়ির মোয়ার অধিক নয়। এমন ছবি, এমন ছাপা, এমন ঝলমল-করা গল্প-কবিতা বাংলা দেশের শিশুরা আগে কোনদিন দেখেনি।

সুকুমার রায়

'সন্দেশ' থেকেই বাংলাদেশে সুকুমার রায়ের আবির্ভাব। তাঁর 'আবোল-তাবোল' ও 'হ-য-ব-র-ল' বাংলা ভাষার দুটি অদ্বিতীয় পুস্তক। এর মধ্যে 'আবোল-তাবোলে'র তুল্য ছড়ার বই যে-কোন ভাষাতেই খুব কম লেখা হয়েছে। এর প্রত্যেকটি কবিতাতেই একদিকে যেমন অপূর্ব কথার কেরামতি, অন্যদিকে তেমনই আপাত-পাগলামির ভিতর দিয়ে জীবনের গভীর দিককে থেকে থেকে নাড়া দেবার কৌশল, কোন অসাবধান পাঠকেরও নজর এড়ায় না। 'রামগরুড়ের ছানা, হাসতে তাদের মানা', 'শুনতে পেলুম পোস্তা গিয়ে, তোমার না কি মেয়ের বিয়ে', 'ও হরিদাস আয় ত দেখি' প্রভৃতি ছড়া শুধু কৌতুক-কবিতা নয়, সমাজ ও পারিপার্শ্বিকের ওপর তির্যক রেখায় যে আলোকপাত করা হয়েছে কবিতাগুলির ভিতর দিয়ে, তার গভীরতর অর্থও বুঝতে দেরি হয় না। সুকুমার রায়ের প্রভাব যে বাংলা সাহিত্যে খুব ব্যাপক, তা বোঝা যায় আমাদের শিশু-সাহিত্যের ছড়া-বিভাগে তাঁর অনুকরণের প্রাচুর্য দেখলে।

সুকুমার রায় উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর পুত্র। এই পরিবারের কুলদারঞ্জন রায়, সুবিনয় রায়, সুখলতা রাও এবং লীলা মজুমদারও শিশু-সাহিত্যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। অকালে লোকান্তরিত হয়েছেন সুকুমার রায়।

অন্যান্য লেখক

সুকুমার রায়চৌধুরীর পাশাপাশি মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সত্যচরণ চক্রবর্তী, হেমেন্দ্রলাল রায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায় প্রমুখ লেখকও অজস্র শিশু-কাহিনী লিখেছেন। মণিলালের 'খোট্টাই সরবৎ' এবং সৌরীন্দ্রমোহনের 'চালিয়াৎ চন্দর' বেশ উপভোগ্য রচনা। হেমেন্দ্রকুমাব রায় এঁদের মধ্যে সব চেয়ে অধিক প্রসিদ্ধ এবং সাহিত্যের এই বিভাগে তিনি লিখেছেনও সব চেয়ে বেশী।

হেমেন্দ্রকুমারের 'যকের ধন', 'আবার যকের ধন', 'হিমালয়ের ভয়ংকর' দুঃসাহসিক রোমাঞ্চ-কাহিনী হিসাবে অতুলনীয়। আখ্যানবস্তু উদ্ভাবন এবং গল্পের রহস্যজাল শেষ পর্যন্ত সুকৌশলে টেনে নিয়ে চলা, দু-বিষয়েই তাঁর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। শরৎচন্দ্রের 'ছেলেবেলার গল্প' সংগ্রহটির এবং গুরুসদয় দত্তের ছড়া ও খোস-গল্পের বই 'ভজার বাঁশী'ব নামও এই সঙ্গে করা যেতে পারে।

আধুনিক লেখকরা

আধুনিক কালের বিশিষ্ট সাহিত্যিক যাঁরা, অনেকেই তাঁরা শিশু-সাহিত্যে কিছু কিছু সম্পদ দিয়েছেন। শৈলজানন্দের 'ভুতুড়ে বই', প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পিঁপড়ে পুরাণ', অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তেব 'ওভার-কোট', শিবরাম চক্রবর্তীর 'হাতীর সঙ্গে হাতাহাতি', 'বাজার করার হাজার ঠ্যালা', 'বাড়ী থেকে পালিয়ে', বুদ্ধদেব বসুর 'শনিবারেব বিকেল' সত্যিকার ভালো লেখা।

সুনির্মল বসু, ফটিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণদয়াল বসু ছোটদের জন্যে অনেক মনোবম কবিতা লিখেছেন। সুনির্মল বসু ও অখিল নিয়োগী লিখেছেন অনেক নাটক ও নাটিকা এবং গল্পে রবীন্দ্রলাল রায়, সুকুমার দে সরকার, নীহাররঞ্জন গুপ্ত, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রলাল ধর খ্যাতিমান হয়েছেন। সুকুমার দে সরকার জীব-জন্তুর গল্পে, নীহাররঞ্জন গোয়েন্দা-গল্পে এবং ধীরেন্দ্রলাল যুদ্ধের গল্পে কুশলী কলমের পরিচয় দিয়েছেন। রবীন্দ্রলাল, নারায়ণ, দু-জনেই ছোটদের উপযোগী হাসির গল্প লিখেছেন প্রচুর।

জ্ঞান-বিজ্ঞান

আজকের শিশু-সাহিত্যে গল্প-কবিতা ছাড়াও বহু প্রয়োজনীয় জিনিস এসেছে। তার মধ্যে প্রধান হল দেশ-বিদেশের বিশিষ্ট ও অগ্রগণ্য বইগুলি

ছোটদের মতো করে পুনর্লিখন এবং দর্শন, ইতিহাস, সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের জ্ঞাতব্য তথ্যগুলি সরল সহজবোধ্য ভাষায় প্রচার। এই দু-দিকেই আমাদের শিশু-সাহিত্য বিশেষ সমৃদ্ধ হয়েছে। 'ইলিয়াড', 'ওডেসী', 'রামায়ণ', 'মহাভারত', 'কথা-সরিৎ-সাগর', 'রাজতরঙ্গিনী', 'শাহনামা' প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থের, অথবা সেক্সপীয়ার, কারভান্তিস, মলেয়ার, গ্যেটে, ভিক্তর হুগো, ডিকেন্স, গোগল, টলস্টয় প্রমুখ ইউরোপীয় সাহিত্যরথীদের রচনাবলীর শিশু ও কিশোর পাঠ্য সংস্করণগুলি সত্যকার প্রশংসনীয় জিনিস হয়েছে। এছাড়া 'পৃথিবীর ইতিহাস', 'জ্ঞান-বিজ্ঞানের কি ও কেন', 'পৃথিবীর সেরা সাহিত্য', 'দেশ-বিদেশের শিল্প ও শিল্পী', অজস্র বই বেরিয়েছে এবং ভালো বইয়েরও অভাব নেই তার মধ্যে।

একটু আগেকার হলেও, রজনীকান্ত গুপ্তের 'আর্যকীর্তি', 'বীরমহিমা' প্রভৃতি ঐতিহাসিক কাহিনীগুলি, অথবা রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও জগদানন্দ রায়ের বৈজ্ঞানিক নিবন্ধগুলি, বিশেষ করে দ্বিতীয়ের 'গাছ-পালা', 'পোকা-মাকড', 'গ্রহ-নক্ষত্র' সত্যিকার মূল্যবান বই। পিঁপড়েদের সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বৈজ্ঞানিক কাহিনী গিরীন্দ্রশেখর বসুর 'লাল-কালো' এবং যামিনীকান্ত সোমের অনুপম জীবনী 'ছেলেদের রবীন্দ্রনাথে'র কথাও নিশ্চয় অনেকের মনে পড়বে।

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত ছোটদের বিশ্বকোষ 'শিশু-ভারতী'র এবং বঙ্গীয় বিজ্ঞান-পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত মাসিকপত্র 'জ্ঞান-বিজ্ঞান' কিংবা সুধীরচন্দ্র সরকার সম্পাদিত 'মৌচাক' এবং 'শিশু-সাথী', 'রামধনু', 'শুকতারা', 'পাঠশালা' প্রভৃতি শিশু-পত্রিকার সঙ্গে ত পরিচয় আছে ছোট-বড সকলেরই। বিভিন্ন সংবাদপত্রের সঙ্গে সংযুক্ত সাপ্তাহিক শিশু-বিভাগগুলিও নিয়মিত সাহিত্য পরিবেষণ করছে।

শ্রীরামমোহন রায়

শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

শ্রী মাইকেল মধুসূদন দত্ত

শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শ্রী গিরিশচন্দ্র ঘোষ

শ্রী দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দীনেশচন্দ্র সেন

প্রমথ চৌধুরী

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সুহৃদ্বরেষু—

আপনার প্রেরিত [illegible] পত্র ও
[illegible] খানি পাইয়াছি ও পত্র
খানি পাইয়াছি। শরীর অসুস্থ এত
দিন পুস্তকপ্রাপ্তির সংবাদ ও পত্রের
উত্তর লিখিতে পারি নাই। অপরাধ
মার্জনা করিবেন।

কমলাকান্তের দ্বিতীয় সংস্করণ
এক খণ্ড আপনার নিকট পাঠাইবার
জন্য [illegible] আমার কার্য্যকারককে
লিখিয়াছি।

ভরসা করি আপনার শারীরিক মঙ্গল।
ইতি ২ অগ্রহায়ণ

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[বঙ্কিমচন্দ্রের হস্তলিপির প্রতিলিপি]

HOUSE BOAT
"PADMA"

কল্যাণীয়েষু

সর্ব্বদাই মনের মধ্যে কাজ বাকি আছে এখনো যে ভালো কবিতা লিখতে পারব এটা বড় জোর বিশ্বাস হয় না। তাই তোমার সেদিনের একটি দুটি কবিতা যখন পড়লুম তখন আমার মনের মধ্যে ঘনীভূত হচ্ছে যে তুমি কবি। তুমিও যে ভাষায় সাধুরীতি সকলের কিন্তু দোষ যায় না। যদিও তুমি যে রকম বিশ্লেষণের হাত চালাও তাতেই ভয় ছিল সংশ্লেষণ হয়তো তোমার হাতে সরবে না, দেখছি দুটোই তোমার বেশ চলবে। তোমাদের ওই হাত যন্ত্রণায় ভয় হয় পাছে ভালো চলতে না পারি, — তাকে যাকে দুঃখ দিই তার বেদনা নিজেকে অত্যন্ত বাজে। এই কারণেই তাকে সত্য কথাকে বেশ এত দূর চলে যাবার ফিরতি করেছি। তোমার কবিতা আমার সেন্টিমেন্টালিটিকেও ভালো লেগেছে — কেবল আমার গদ্য কবিতা এখনো তাদের হাতে পৌঁছোয় না। ঐ বিভাগে আমি এখনো ইশারাতে কবুল — মানুষের মিতাক্ষরের বিরোধ ঘুচিয়ে আছি।

তোমার মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা কী রকম? — মুখামুখি কী উৎসুক কাটিয়েছি! যদি না ভুললেই ভালো ছিল — শরীরের সঙ্গে মনের মতবিরোধ ঘোচে ওঠে। ইতি ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[রবীন্দ্রনাথের হস্তলিপির প্রতিলিপি]

তোমার চিঠি

পেলাম। আমার দেশের বাড়ীতে হঠাৎ অসুখ হওয়াতে ডাক্তারদের সঙ্গে দেখা করাই আমার এবার কলকাতায় আসার হেতু ছিল। তুমি দু-চার লাইন লেখা চাও, সে কাজ কঠিন হোতো না যদি আমি কবি হতাম। দু-চার লাইনের একটা কবিতা লিখে পাঠিয়ে দিতে পারতাম। কিন্তু যারা গদ্য সাহিত্যশিল্প কারবার করে তাদের এ সুবিধাটুকু নেই। হয়, একেবারেই না লেখা, নাহ'লে এমন কিছু লিখে দেওয়া যা দু-চার ছত্রে কোন মতেই পর্যাপ্ত হয় না। লেখবার প্রতিশ্রুতি যদি দিয়েও থাকি বর্তমান অবস্থায় তা প্রত্যাহার করলাম। তবু মনের সাধটা ইচ্ছে রইল যদি লেখবার কথা এই বিষয়ের দিনেও কিছু মনে আসে। যদি না পারি কিছু মনে কোরো না। লেখার ব্যাপারটা এমনই মর্জির অধীন যে কথা দেওয়ার কোন অর্থই থাকে না যদি মন না লিখতে চায়।

ইতি ২৬শে শ্রাবণ ১৩৪৪

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[শরৎ চন্দ্র হস্তলিপির প্রতি লিপি]

সময়ানুক্রম

খৃঃ অঃ ১৭৫৭—পলাশীর যুদ্ধ। সিরাজউদ্দৌল্লার পরাজয় এবং ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির জয়লাভ।

১৭৭৩—রেগুলেটিং এক্ট এবং কোম্পানি কর্তৃক বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ।

১৭৭৪—কলিকাতায় সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠা।

১৭৮১—কলিকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা।

১৭৮৪—কলিকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা।

১৭৯৩—চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও নূতন জমিদার শ্রেণীর পত্তন।

১৮০০—কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ। অধ্যক্ষ উইলিয়াম কেরী। প্রথম বাংলা গদ্য রচনা। রামরাম বসু ও মৃত্যুঞ্জয়।

১৮০০—শ্রীরামপুরে প্রথম বাংলা ছাপাখানা এবং পঞ্চানন কর্মকার কর্তৃক বাইবেল মুদ্রণ।

১৮১৭—হিন্দু কলেজ স্থাপন।

১৮১৮—প্রথম বাংলা সংবাদপত্র : সমাচার দর্পণ।

১৮২৩—লর্ড আমহার্স্টকে লিখিত রামমোহন রায়ের শিক্ষাসংস্কার-সম্বন্ধীয় পত্র এবং আধুনিক শিক্ষা প্রবর্তন। নানা স্থানে কলেজ স্থাপন।

১৮৩০—ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা। সনাতনী ও ব্রাহ্মদের বিবাদ। সতীদাহ-নিরোধ আইন।

১৮৩৫—কলিকাতা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা। উচ্চ শিক্ষার মাধ্যম ও সরকারী ভাষারূপে ইংরাজী প্রবর্তন।

১৮৩৯—আদি ব্রাহ্মসমাজ। দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয় দত্ত। বিজ্ঞান ও ধর্মশাস্ত্র-বিচার। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

১৮৪৯—বেথুন কলেজ ও বাংলাদেশে নারীশিক্ষা।

১৮৫০—ওহাবী বিদ্রোহ। তিতু মীর।

১৮৫৩—ভারতে রেলপথ প্রবর্তন।

১৮৫৬—বিধবা-বিবাহ আইন প্রবর্তন। বিদ্যাসাগর।

খৃঃ অঃ ১৮৫৭—সিপাহী বিদ্রোহ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। ডাকব্যবস্থা প্রবর্তন।

১৮৫৮—কোম্পানির হাত থেকে সরাসরি বৃটিশ সম্রাজ্ঞীর হাতে ভারত-শাসন ভার গ্রহণ।

১৮৬০—নীল বিদ্রোহ। হরিশ মুখার্জী ও হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকা।

১৮৬৮—হিন্দুমেলা। জাতীয়তাব প্রতিষ্ঠা।

১৮৭২—অসবর্ণ বিবাহ আইন প্রবর্তন।

১৮৭৬—ভারতীয় বিজ্ঞান পরিষদ স্থাপন। ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার।

১৮৮৩—ইলবার্ট বিল আন্দোলন।

১৮৮৫—জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা। আনন্দমোহন ও সুরেন্দ্রনাথ।

১৮৯৪—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ। রামকৃষ্ণ আন্দোলন। বিবেকানন্দ ও অভেদানন্দ।

১৯০২—ডন সোসাইটি ও সতীশ মুখোপাধ্যায়।

১৯০৫—বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন। বিদেশী পণ্য বর্জন।

১৯০৭—বাংলায় বিপ্লববাদ। অনুশীলন ও যুগান্তর দল। অরবিন্দ ও বিপিনচন্দ্র।

১৯১১—কলিকাতা থেকে দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তর। বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের পৃথক পৃথক প্রদেশরূপে জন্ম। এই তিনের সঙ্গে বাংলার অনেকাংশ সংযোগ।

১৯১৩—রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার লাভ।

১৯১৪—প্রথম মহাযুদ্ধ এবং জাতীয় জাগরণের নূতন অধ্যায়।

১৯২২—অহিংস অসহযোগ এবং গান্ধী ও চিত্তরঞ্জন।

১৯৩০—চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন। মেদিনীপুরে সন্ত্রাসবাদ।

১৯৩৫—ভারত শাসন আইন। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা। বাংলায় লীগ মন্ত্রিসভা ও সাম্প্রদায়িকতা।

১৯৪২—আগস্ট বিদ্রোহ। পঞ্চাশের মন্বন্তর।

১৯৪৭—ভারত বিভাগ এবং ইংরেজ শাসনাবসান।

১৯৫০—দুই বাংলা ও পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্বাস্তু আগমন।

১৯৫৭—সীমানা কমিশনের রায়ে পুরুলিয়ার পশ্চিমবঙ্গে প্রত্যাবর্তন। সরকারী ভাষা কমিশন ও রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন।

সাময়িক পত্র

খৃঃ অঃ ১৮১৮ : মার্শম্যান : দিগ্‌দর্শন
১৮২১ : রামমোহন রায় : সম্বাদ কৌমুদী
১৮৩১ : ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত : সংবাদ প্রভাকর
১৮৪৩ : অক্ষয়কুমার দত্ত : তত্ত্ববোধিনী
১৮৫১ : রাজেন্দ্রলাল মিত্র : বিবিধার্থ সংগ্রহ
১৮৫৪ : প্যারীচাঁদ মিত্র : মাসিক পত্র
১৮৭২ : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : বঙ্গদর্শন
১৮৭৬ : দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর : ভারতী
১৯০১ : রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় : প্রবাসী
১৯১৪ : প্রমথ চৌধুরী : সবুজ পত্র
১৯২৪ : দীনেশরঞ্জন দাশ : কল্লোল
১৯২৬ : তারানাথ রায় : আত্মশক্তি

সংবাদপত্র

১৮১৮ : মার্শম্যান : সমাচারদর্পণ
১৮৫৮ : যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ : সোমপ্রকাশ
১৮৮১ : যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু : বঙ্গবাসী
১৮৮২ : কৃষ্ণকুমার মিত্র : সঞ্জীবনী
১৮৯০ : কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ : হিতবাদী
১৮৯৬ : কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য : বসুমতী
১৯০৪ : ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় : সন্ধ্যা
১৯০৬ : ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত : যুগান্তর
১৯২৪ : গোপাল সান্যাল : বঙ্গবাণী

প্রথম প্রকাশ

১৮০১ : রামরাম বসু : প্রতাপাদিত্য-চরিত্র
১৮০৮ : মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার : রাজাবলি
১৮১৫ : রামমোহন রায় : বেদান্তসার
১৮৪৮ : বিদ্যাসাগর : বাঙ্গালার ইতিহাস

খৃঃ অঃ ১৮৫১	:	অক্ষয়কুমার দত্ত : বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার
১৮৫৪	:	রামনারায়ণ তর্করত্ন : কুলীন-কুলসর্বস্ব
১৮৫৮	:	টেকচাঁদ : আলালের ঘরের দুলাল
১৮৬০	:	দীনবন্ধু মিত্র : নীলদর্পণ
১৮৬১	:	মাইকেল মধুসূদন : মেঘনাদবধ কাব্য
১৮৬২	:	কালীপ্রসন্ন সিংহ : হুতোম প্যাঁচার নক্সা
১৮৬৫	:	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : দুর্গেশনন্দিনী
১৮৭২	:	তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় : স্বর্ণলতা
১৮৭৫	:	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর : স্বপ্নপ্রয়াণ
১৮৭৫-৭৭	:	হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : বৃত্রসংহার
১৮৭৬	:	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : কৃষ্ণকান্তের উইল
১৮৭৯	:	বিহারীলাল চক্রবর্তী : সারদামঙ্গল
১৮৮২	:	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : আনন্দমঠ
১৮৮৭	:	নবীনচন্দ্র সেন : রৈবতক
১৮৯১	:	গিরিশচন্দ্র ঘোষ : প্রফুল্ল
১৮৯৩	:	নবীনচন্দ্র সেন : কুরুক্ষেত্র
১৮৯৬	:	নবীনচন্দ্র সেন : প্রভাস
১৯০৯	:	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গোরা
১৯১০	:	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গীতাঞ্জলি
১৯১১	:	অমৃতলাল বসু : খাস দখল
১৯১২	:	দ্বিজেন্দ্রলাল রায় : সাজাহান
১৯২৬	:	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বলাকা
১৯২৬	:	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : পথের দাবী
১৯২৬	:	নজরুল ইসলাম : অগ্নিবীণা
১৯২৯	:	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শেষের কবিতা
১৯৩১	:	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রাশিয়ার চিঠি
১৯৩৮	:	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : প্রান্তিক

গ্রন্থঋণ

রাজনারায়ণ বসু : বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা

রামগতি ন্যায়রত্ন : বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব

রমেশচন্দ্র দত্ত : Literature of Bengal

দীনেশচন্দ্র সেন : বঙ্গভাষা ও সাহিত্য

সুশীলকুমার দে : History of Bengali Vaisnavism

মণীন্দ্রমোহন বসু : Post-Chaitanya Sahajiya Cult

শশিভূষণ দাশগুপ্ত : Obscure Religious Cults

আশুতোষ ভট্টাচার্য : বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস

প্রমথনাথ তর্কভূষণ : বাংলার বৈষ্ণব ধর্ম

রাধাগোবিন্দ নাথ : গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস
বাঙ্গালা সাময়িক পত্রের ইতিহাস

হরিমোহন মুখোপাধ্যায় : বঙ্গভাষার লেখক

অনাথকৃষ্ণ দেব : বঙ্গের কবিতা

হারাণচন্দ্র রক্ষিত : ভিক্টোরিয়া যুগের বাঙ্গালা সাহিত্য

নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় : রামমোহন রায়ের জীবনচরিত

বিহারীলাল সরকার : বিদ্যাসাগর

নগেন্দ্রনাথ সোম : : মধুস্মৃতি

যোগীন্দ্রনাথ বসু : মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত

শশাঙ্কমোহন সেন : মধুসূদন

শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : বঙ্কিম-জীবনী

অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত : বঙ্কিম-প্রসঙ্গ

সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত : বঙ্কিমচন্দ্র

সুশীলকুমার দে : দীনবন্ধু মিত্র

মন্মথনাথ ঘোষ : কবি হেমচন্দ্র
রঙ্গলাল
কালীপ্রসন্ন সিংহ

হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত : গিরিশ-প্রতিভা
দেবকুমার রায়চৌধুরী : দ্বিজেন্দ্রলাল
নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত : কান্তকবি রজনীকান্ত
প্রিয়লাল দাশ : এযার কবি
E J. Thompson : Rabindranath Tagore, The Poet & Dramatist
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায : রবীন্দ্র-জীবনী
বিনয়কুমার সরকার : রবীন্দ্র-সাহিত্যে ভারতের বাণী
সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত : রবি-দীপিতা
নীহাররঞ্জন রায় : রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা
সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত : শরৎচন্দ্র
মাখনলাল রায়চৌধুরী : শরৎসাহিত্যে পতিতা
যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত : বঙ্গের মহিলা কবি
প্রিয়রঞ্জন সেন : Western Influence in Bengali Literature
সুশীলকুমার দে : Bengali Literature in the Nineteenth Century.
শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বাঙ্গালা সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা
হরপ্রসাদ মিত্র : সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা ও কাব্যরূপ
শশিভূষণ দাশগুপ্ত : কবি যতীন্দ্রনাথ
রথীন্দ্রনাথ রায : বাংলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী
আব্দুল ওদুদ : নজরুল-প্রতিভা
রমেশচন্দ্র মজুমদার : বাংলার ইতিহাস
নীহাররঞ্জন রায় : বাঙালীর ইতিহাস
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : The Origin & Development of Bengali Language
সুকুমার সেন : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস
উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : বাংলার বাউল ও বাউল গান
ত্রিপুরাশঙ্কর সেন : ষোড়শ শতকের বাংলা সাহিত্য

শব্দসূচী

[পুস্তকমধ্যে উল্লিখিত ঘটনা, বিষয়, ব্যক্তি ও পুস্তকের নাম ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য শব্দসমূহের পৃষ্ঠাসংখ্যাসহ বর্ণানুক্রমিক তালিকা]

খ

ধ

ন